सत्यमेव जयते

ভারতের সংবিধান

প্রস্তাবনা

“আমরা, ভারতের জনগণ, ভারতকে সার্বভৌম, সমাজতান্ত্রিক, ধর্মনিরপেক্ষ, গণতান্ত্রিক, সাধারণতন্ত্ররূপে গড়ে তুলতে এবং তার সকল নাগরিকই যাতে সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক, ন্যায়বিচার, চিন্তা, মতপ্রকাশ, বিশ্বাস, ধর্ম এবং উপাসনার স্বাধীনতা, সামাজিক প্রতিষ্ঠা অর্জন ও সুযোগের সমতা প্রতিষ্ঠা এবং তাদের সকলের মধ্যে ব্যক্তির মর্যাদা এবং জাতীয় ঐক্য ও সংহতি সুনিশ্চিতকরণের মাধ্যমে তাদের মধ্যে যাতে ভ্রাতৃত্বের ভাব গড়ে ওঠে তার জন্য সত্যনিষ্ঠার সঙ্গে শপথ গ্রহণ করে, আমাদের গণপরিষদে আজ ১৯৪৯ সালের ২৬ নভেম্বর, এতদ্দ্বারা এই সংবিধান গ্রহণ, বিধিবদ্ধ এবং নিজেদের অর্পণ করছি।”

Constitution of India

Part IV A (Article 51 A)

Fundamental Duties

It shall be the duty of every citizen of India —

(a) to abide by the Constitution and respect its ideals and institutions, the National Flag and the National Anthem;

(b) to cherish and follow the noble ideals which inspired our national struggle for freedom;

(c) to uphold and protect the sovereignty, unity and integrity of India;

(d) to defend the country and render national service when called upon to do so;

(e) to promote harmony and the spirit of common brotherhood amongst all the people of India transcending religious, linguistic and regional or sectional diversities; to renounce practices derogatory to the dignity of women;

(f) to value and preserve the rich heritage of our composite culture;

(g) to protect and improve the natural environment including forests, lakes, rivers, wildlife and to have compassion for living creatures;

(h) to develop the scientific temper, humanism and the spirit of inquiry and reform;

(i) to safeguard public property and to abjure violence;

(j) to strive towards excellence in all spheres of individual and collective activity so that the nation constantly rises to higher levels of endeavour and achievement;

* (k) who is a parent or guardian, to provide opportunities for education to his child or, as the case may be, ward between the age of six and fourteen years.

Note: The Article 51A containing Fundamental Duties was inserted by the Constitution (42nd Amendment) Act, 1976 (with effect from 3 January 1977).

**(k) was inserted by the Constitution (86th Amendment) Act, 2002 (with effect from 1 April 2010).Constitution of India.*

ভারতের ইতিহাস

ভাগ-1

দ্বাদশ শ্রেণির ইতিহাসেরপাঠ্যবই

প্রস্তুতকরণ

জাতীয় শিক্ষা গবেষণা ও প্রশিক্ষণ পর্ষদ, নতুন দিল্লি।
অনুবাদ ও অভিযোজন
রাজ্য শিক্ষা গবেষণা ও প্রশিক্ষণ পর্ষদ, ত্রিপুরা সরকার।

এন সি ই আর টি
অনুমোদিত
বাংলা সংস্করণ

প্রথম প্রকাশ :
মার্চ, ২০২০

© এন সি ই আর টি কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত
ভারতের ইতিহাস
দ্বাদশ শ্রেণির পাঠ্যবই
(এন সি ই আর টি-র Themes in Indian History (Part I) পাঠ্যবইয়ের ২০১৭ সালের অনূদিত সংস্করণ)

প্রকাশক : অধিকর্তা,
রাজ্য শিক্ষা গবেষণা
ও প্রশিক্ষণ পর্ষদ
ত্রিপুরা

মূল্য : ৯০ টাকা মাত্র

প্রচ্ছদ ও অক্ষর বিন্যাস
লক্ষ্মণ দেবনাথ

মুদ্রণ : সত্যযুগ এমপ্লয়িজ কো-অপারেটিভ
ইন্ডাস্ট্রিয়াল সোসাইটি লিমিটেড
১৩ প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা-৭২

ভূমিকা

২০০৬ সাল থেকে রাজ্য শিক্ষা গবেষণা ও প্রশিক্ষণ পর্ষদ প্রথম থেকে অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত প্রাথমিক ও উচ্চপ্রাথমিক স্তরের পাঠ্যপুস্তকের মুদ্রণ ও প্রকাশের দায়িত্ব পালন করে আসছে।

রাজ্যের বিদ্যালয়স্তরে উন্নত ও সমৃদ্ধতর পাঠ্যক্রম চালু করার লক্ষ্যে ত্রিপুরা রাজ্য শিক্ষা দপ্তরের প্রচেষ্টায় প্রথম থেকে অষ্টম, নবম ও একাদশ শ্রেণির জন্য ২০১৯ শিক্ষাবর্ষ থেকে জাতীয় শিক্ষা গবেষণা ও প্রশিক্ষণ পর্ষদের (এন সি ই আর টি) পাঠ্যপুস্তকসমূহ গ্রহণ করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।

বাংলা বিষয় ছাড়া অন্যান্য বিষয়গুলোর জন্য জাতীয় শিক্ষা গবেষণা ও প্রশিক্ষণ পর্ষদের প্রকাশিত পুস্তকগুলোর অনূদিত ও অভিযোজিত সংস্করণ ২০১৯ সালে প্রথম প্রকাশ করা হয় এবং এ বছর ওইসব পুস্তকগুলোর পুনর্মুদ্রণ করা হল। পাশাপাশি দশম ও দ্বাদশ শ্রেণির বাংলা বিষয় ছাড়া অন্যান্য বিষয়গুলোর জন্য জাতীয় শিক্ষা গবেষণা ও প্রশিক্ষণ পর্ষদের প্রকাশিত পুস্তকগুলোর অনূদিত ও অভিযোজিত সংস্করণ ২০২০ শিক্ষাবর্ষে প্রথম প্রকাশ করা হয়। এখানে উল্লেখ্য যে, বাংলা বিষয়ে পাঠ্যপুস্তক রচনা ও প্রকাশনার দায়িত্বও রাজ্য শিক্ষা গবেষণা ও প্রশিক্ষণ পর্ষদ পালন করে আসছে।

বিশাল এই কর্মকাণ্ডে যেসব শিক্ষক-শিক্ষিকা, অধ্যাপক-অধ্যাপিকা, শিক্ষাবিদ, অনুবাদক, অনুলেখক, মুদ্রণকর্মী ও শিল্পীরা আমাদের সঙ্গে থেকে নিরলসভাবে অক্লান্ত পরিশ্রমে এই উদ্যোগ বাস্তবায়িত করেছেন তাদের সবাইকে সকৃতজ্ঞ ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

প্রকাশিত এই পাঠ্যপুস্তকটির উৎকর্ষ ও সৌন্দর্য বৃদ্ধির জন্য শিক্ষানুরাগী ও গুণীজনের মতামত ও পরামর্শ বিবেচিত হবে।

আগরতলা
মার্চ, ২০২০

উত্তম কুমার চাকমা
অধিকর্তা
রাজ্য শিক্ষা গবেষণা ও প্রশিক্ষণ পর্ষদ
ত্রিপুরা

উপদেষ্টা

ড. অর্ণব সেন, সহঅধ্যাপক, এন ই আর আই ই, শিলং

ড. অরূপ কুমার সাহা, সহঅধ্যাপক, আর আই ই, ভুবনেশ্বর

পাঠ্যপুস্তকটি যাঁরা অনুবাদ করেছেন :

শ্রী সুকান্ত চক্রবর্তী, শিক্ষক

শ্রী দেবাশিস চৌধুরী, শিক্ষক

শ্রীমতী সুজাতা পাল, শিক্ষিকা

শ্রীমতী বিপাশা ব্যানার্জী, শিক্ষিকা

শ্রী সঞ্জীব দেব, শিক্ষক

শ্রী অম্লান দেব, শিক্ষক

শ্রী দীপঙ্কর দাশগুপ্ত, শিক্ষক

শ্রী শিবু চন্দ্র দাস, শিক্ষক

ভাষা-পরিমার্জনায়

শ্রী সুপ্রিয় চক্রবর্তী

শ্রী গৌতম বুদ্র পাল

শ্রীমতী এমেলী নাগ

DEFINING THE FOCUS OF STUDY

What defines the focus of this book? What does it seek to do? How is it linked to what has been studied in earlier classes?

In Classes VI to VIII we looked at Indian history from early beginnings to modern times, with a focus on one chronological period in each year. Then in the books for Classes IX and X, the frame of reference changed. We looked at a shorter period of time, focusing specifically on a close study of the contemporary world. We moved beyond territorial boundaries, beyond the limits of nation states, to see how different people in different places have played their part in the making of the modern world. The history of India became connected to a wider inter-linked history. Subsequently in Class XI we studied *Themes in World History*, expanding our chronological focus, looking at the vast span of years from the beginning of human life to the present, but selecting only a set of themes for serious exploration. This year we will study *Themes in Indian History*.

The book begins with Harappa and ends with the framing of the Indian constitution. What it offers is not a general survey of five millennia, but a close study of select themes. The history books in earlier years have already acquainted you with Indian history. It is time we explore some themes in greater detail.

In choosing the themes we have tried to ensure that we learn about developments in different spheres – economic, cultural, social, political, and religious – even as we attempt to break the boundaries between them. Some themes in the book will introduce you to the politics of the time and the nature of authority and power; others explore the way societies are organised, and the way they function and change; still others tell us about religious life and ritual practices, about the working of economies, and the changes within rural and urban societies.

Each of these themes will also allow you to have a closer look at the historians' craft. To retrieve the past, historians have to find sources that makes the past accessible. But sources do not just reveal the past; historians have to grapple with sources, interpret them, and make them speak. This is what makes history exciting. The same sources can tell us new things if we ask new questions, and engage with them in new ways. So we need to see how historians read sources, and how they discover new things in old sources.

But historians do not only re-examine old records. They discover new ones. Sometimes these could be chance discoveries. Archaeologists may unexpectedly come across seals and mounds that provide clues to the existence of a site of an ancient civilisation. Rummaging through the dusty records of a district collectorate a historian may trip over a bundle of records that contain legal cases of local disputes, and these may open up a new world of village life several centuries back. Yet are such discoveries only accidents? You may bump into a bundle of old records in an archive, open it up and see it, without discovering the significance of the source. The

source may mean nothing to you unless you have relevant questions in mind. You have to track the source, read the text, follow the clues, and make the inter-connections before you can reconstruct the past. The physical discovery of a record does not simply open up the past. When Alexander Cunningham first saw a Harappan seal, he could make no sense of it. Only much later was the significance of the seals discovered.

In fact when historians begin to ask new questions, explore new themes, they have to often search for new types of sources. If we wish to know about revolutionaries and rebels, official sources can reveal only a partial picture, one that will be shaped by official censure and prejudice. We need to look for other sources – diaries of rebels, their personal letters, their writings and pronouncements. And these are not always easy to come by. If we have to understand experiences of people who suffered the trauma of partition, then oral sources might reveal more than written sources.

As the vision of history broadens, historians begin tracking new sources, searching for new clues to understand the past. And when that happens, the conception of what constitutes a source itself changes. There was a time when only written records were acknowledged as authentic. What was written could be verified, cited, and cross checked. Oral evidence was never considered a valid source: who was to guarantee its authenticity and verifiability? This mistrust of oral sources has not yet disappeared, but oral evidence has been innovatively used to uncover experiences that no other record could reveal.

Through the book this year, you will enter the world of historians, accompany them in their search for new clues, and see how they carry on their dialogues with the past. You will witness the way they tease out meaning out of records, read inscriptions, excavate archaeological sites, make sense of beads and bones, interpret the epics, look at the stupas and buildings, examine paintings and photographs, interpret police reports and revenue records, and listen to the voices of the past. Each theme will explore the peculiarities and possibilities of one particular type of source. It will discuss what a source can tell and what it cannot.

This is Part I of *Themes in Indian History,* Parts II and III will follow.

NEELADRI BHATTACHARYA
Chief Advisor, History

TEXTBOOK DEVELOPMENT COMMITTEE

Chairperson, Advisory Committee

Hari Vasudevan, *Professor,* Department of History, University of Calcutta, Kolkata

Chief Advisor

Neeladri Bhattacharya, *Professor,* Centre for Historical Studies, Jawaharlal Nehru University, New Delhi (Theme 10)

Advisors

Kumkum Roy, *Associate Professor,* Centre for Historical Studies, Jawaharlal Nehru University, New Delhi (Theme 2)

Monica Juneja, *Guest Professor,* Institut Furgeschichte, Viennna, Austria

Team Members

Beeba Sobti, *P.G.T. History,* Modern School, Barakhamba Road, New Delhi

C.N. Subramaniam, Eklavya, Kothi Bazar, Hoshangabad (Theme 7)

Farhat Hassan, *Reader,* Department of History, Aligarh Muslim University, Aligarh, UP (Theme 5)

Jaya Menon, *Reader,* Department of History, Aligarh Muslim University, Aligarh, UP (Theme 1)

Kunal Chakrabarti, *Professor,* Centre for Historical Studies, Jawaharlal Nehru University, New Delhi (Theme 3)

Meenakshi Khanna, *Reader* in History, Indraprastha College, University of Delhi, Delhi (Theme 6)

Muzaffar Alam, *Professor of South Asian History,* University of Chicago, Chicago, USA

Najaf Haider, *Associate Professor,* Centre for Historical Studies, Jawaharlal Nehru University, New Delhi (Theme 9)

Partho Dutta, *Reader,* Department of History, Zakir Hussain College (Evening Classes), University of Delhi, Delhi (Theme 12)

Prabha Singh, *P.G.T. History,* Kendriya Vidyalaya, Old Cantt., Telliarganj, Allahabad, UP

Rajat Datta, *Professor,* Centre for Historical Studies, Jawaharlal Nehru University, New Delhi (Theme 8)

Ramachandra Guha, *freelance writer, anthropologist* and *historian,* Bangalore (Theme 13)

Rashmi Paliwal, Eklavya, Kothi Bazar, Hoshangabad

Rudrangshu Mukherjee, *Executive Editor, The Telegraph*, Kolkata (Theme 11)

Smita Sahay Bhattacharya, *P.G.T. History,* Blue Bells School, Kailash Colony, New Delhi

Sumit Sarkar, *Formerly Professor of History,* University of Delhi, Delhi (Theme 15)

Uma Chakravarti, Formerly *Reader* in History, Miranda House, University of Delhi, Delhi (Theme 4)

Vijaya Ramaswamy, *Professor,* Centre for Historical Studies, Jawaharlal Nehru University, New Delhi (Theme 7)

Member-coordinators

Anil Sethi, *Professor,* DESSH, NCERT, New Delhi (Theme 14)

Seema S. Ojha, *Lecturer,* DESSH, NCERT, New Delhi

ACKNOWLEDGEMENTS

Themes in Indian History, Part I emerged out of several discussions within the team amongst subject experts/ authors from universities, school teachers and professionals from NCERT. We would like to thank all those who participated enthusiastically and pooled together their intellectual resources and experience to produce this book.

Several people commented extensively on draft chapters, helping us improve on the text and clarify issues. We are particularly grateful to our young readers, Meera and Sandhya Visvanathan whose suggestions and comments helped us sharpen the presentation, and to Baisakh Chakrabarti for his encouragement. The suggestions of the members of the Monitoring Committee, Prof. J. S. Grewal and Ms Shobha Bajpai, were very useful.

Prof. B.D. Chattopadhyaya made time for the project inspite of several pressing personal problems, and offered critical advice. Others who offered valuable suggestions include Prof. Ranabir Chakravarti, Prof. Upinder Singh and Dr Supriya Varma. We are also grateful to Dr Naseem Akhtar, Mr Virendra Bangroo and Dr Suresh Mishra for advice on specific visuals and texts. Ms Samira Verma provided unfailingly prompt support for visual and textual research.

We would like to thank all the institutions and individuals who provided the visual resources for the book: the American Institute of Indian Studies, Gurgaon, the Archaeological Survey of India, the Centre for Cultural Resources and Training, the Indira Gandhi National Centre for the Arts, the National Manuscript Mission, and the National Museum. We are particularly grateful to Prof. Gregory L. Possehl for visual material used in Theme One, and to Mr. R.R.S. Chauhan and Mr. J.C. Grover, National Museum, as also to Mr. R.C. Das, CIET, NCERT for photographs from the National Museum. Mr. K. Varghese, Jawaharlal Nehru University, provided the maps.

Ms Shyama Warner copyedited and proof read the book while Ms Ritu Topa and Mr. Animesh Roy of Arrt Creations, New Delhi, designed it. We would like to thank them all for the patience, care, and passion they brought to the task.

We would also like to thank Mr. Albinus Tirkey and Mr. Manoj Haldar for technical support and assistance.

Finally, we look forward to feedback from the users of the book, which will help us improve it in subsequent editions.

সূচিপত্র

ভাগ I

বিষয়বস্তু এক 1
ইট, পুঁতি ও অস্থিসমূহ
হরপ্পা সভ্যতা

বিষয়বস্তু দুই 28
রাজা, কৃষক এবং শহর
প্রারম্ভিক রাজ্য এবং অর্থনীতি
(600 খ্রিস্ট পূর্বাব্দ থেকে 600 খ্রিস্টাব্দ)

বিষয়বস্তু তিন 53
সম্পর্ক, বর্ণ এবং শ্রেণি
প্রারম্ভিক সমাজ
(আনুমানিক 600 খ্রি. পূ. থেকে 600 খ্রীষ্টাব্দে)

বিষয়বস্তু চার 82
চিন্তাবিদ, বিশ্বাস এবং ইমারতসমূহ
সাংস্কৃতিক বিকাশ
(আনুমানিক 600 খ্রিস্ট পূর্বাব্দ
থেকে 600 খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত)

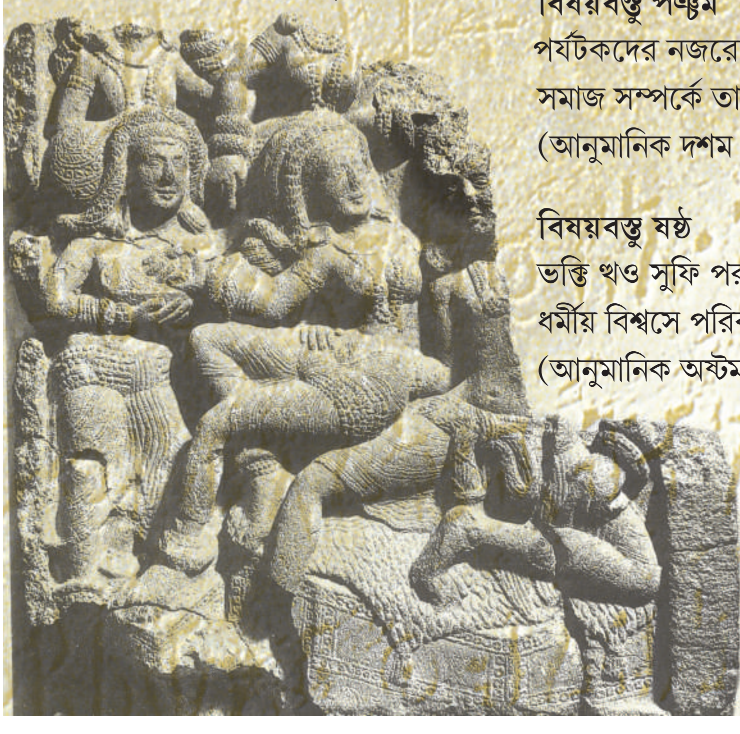

ভাগ II*

বিষয়বস্তু পঞ্চম
পর্যটকদের নজরে
সমাজ সম্পর্কে তাদের উপলব্ধি
(আনুমানিক দশম থেকে সপ্তদশ শতাব্দী পর্যন্ত)

বিষয়বস্তু ষষ্ঠ
ভক্তি খণ্ড সুফি পরম্পরা
ধর্মীয় বিশ্বসে পরিবর্তন এবং ভক্তিমূলক গ্রন্থ
(আনুমানিক অষ্টম শতাব্দী থেকে অষ্টাদশ শতাব্দী পর্যন্ত)

বিষয়বস্তু সপ্তম
একটি সাম্রাজের রাজধানী বিজয়নগর
(চতুর্দশ শতাব্দী থেকে ষোড়শ শতাব্দী)

বিষয়বস্তু অষ্টম
কৃষক, জমিদার এবং রাষ্ট্র
কৃষি ভিত্তিক সমাজ এবং মোঘল সাম্রাজ্য
(আনুমানিক ষোড়শ এবং সপ্তদশ শতাব্দী)

বিষয়বস্তু নবম
সম্রাট এবং তাঁদের ইতিহাস
মোগল দরবার
(ষোড়শ - সপ্তদশ শতাব্দী)

ভাগ III*

বিষয়বস্তু দশম
ঔপনিবেশবাদ এবং গ্রামাঞ্চল
সরকারি নথিপত্রের অনুসন্ধান তথা বিশ্লেষণ

বিষয়বস্তু একাদশ
ব্রিটিশ রাজত্ব এবং বিদ্রোহীরা
1857 -এর মহাবিদ্রোহ এবং এর বিবরণ

বিষয়বস্তু দ্বাদশ
ঔপনিবেশিক নগরগুলো
নগরায়ণ, পরিকল্পনা এবং স্থাপত্য

বিষয়বস্তু ত্রয়োদশ
মহাত্মা গান্ধি এবং জাতীয়তাবাদী আন্দোলন
আইন অমান্য এবং তার পরবর্তী ঘটনা

বিষয়বস্তু চতুর্দশ
বোঝাপড়ার মাধ্যমে দেশবিভাগ
রাজনৈতিক, স্মৃতিশক্তি, অভিজ্ঞতা

বিষয়বস্তু পঞ্চদশ
সংবিধান প্রণয়ন
এক নতুন যুগের সূচনা

HOW TO USE THIS BOOK

This is Part I of *Themes in Indian History*, Parts II and III will follow.

- ☑ Each chapter is divided into numbered sections and subsections to facilitate learning.
- ☑ You will also find other material enclosed in boxes.

These contain:

Short meanings

Additional Information

More elaborate definitions

These are meant to assist and enrich the learning process, but are ***not intended for evaluation.***

- ☑ Each chapter ends with a set of ***timelines***. This is to be treated as background information, and ***not for evaluation***.
- ☑ There are ***figures, maps*** and ***sources*** numbered sequentially through each chapter.

(a) **Figures** include illustrations of artefacts such as tools, pottery, seals, coins, ornaments etc. as well as of inscriptions, sculpture, paintings, buildings, archaeological sites, plans and photographs of people and places; visual material that historians use as sources.

(b) Each chapter has **maps**.

Sources

(c) **Sources** are enclosed within separate boxes: these contain excerpts from a wide variety of texts and inscriptions. Both visual and textual sources will help you acquire a feel for the clues that historians use. You will also see how historians analyse these clues. **The final examination can include excerpts from and/or illustrations of identical/similar material, providing you with an opportunity to handle these.**

☑ There are *two* categories of ***intext questions:***

(a) those within a yellow box, which may be used for practice for ***evaluation***.

(b) those with the caption ➲ Discuss… which are ***not for evaluation***

☑ There are ***four types*** of assignments at the end of each chapter:
These include:

short questions

short essays

map work

projects

Hope you enjoy using this book.

বিষয়বস্তু
এক

ইট, পুঁতি ও অস্থিসমূহ
হরপ্পা সভ্যতা

হরপ্পা সিলমোহর (চিত্র 1.1) সম্ভবত হরপ্পা বা সিন্ধু সভ্যতার সর্বাধিক স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যযুক্ত শিল্পকলা, স্টিয়াটাইট নামক পাথর দিয়ে তৈরি এই সিলমোহর এর উপর সাধারণত পশুর চিত্র এবং এমন এক লিপির চিহ্ন উৎকীর্ণ রয়েছে যার পাঠোদ্ধার এখনো সম্ভব হয়নি। তবুও আমরা ঐ স্থানে নির্দিষ্ট সময়ে বসবাসকারী মানুষের পরিত্যক্ত জিনিস যেমন-তাদের বাড়িঘর, ব্যবহৃত পাত্র, অলংকার, বিভিন্ন যন্ত্রপাতি এবং সিলমোহর — অন্যভাবে বলা যায় প্রত্নতাত্ত্বিক প্রমাণাদি থেকে তাদের জীবন সম্পর্কে জানতে পারি। চলো দেখি, আমরা হরপ্পা সভ্যতা সম্পর্কে কী জানি এবং কীভাবে জানি। প্রত্নতাত্ত্বিক উপাদান কীভাবে ব্যাখ্যা করা হয় এবং কীভাবে এই ব্যাখ্যা কখনো কখনো পরিবর্তিত হয় — তা আমরা অনুসন্ধান করব। অবশ্য এই সভ্যতার কিছু দিক রয়েছে যা এখনো অজানা এবং হয়তো অজানাই থাকবে।

চিত্র 1.1
একটি হরপ্পা সিলমোহর

পরিভাষা, স্থান এবং সময়

সিন্ধু সভ্যতা হরপ্পা সভ্যতা নামেও পরিচিত ছিল। প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌গণ 'সংস্কৃতি' শব্দটি ব্যবহার করেছেন একই শ্রেণিভুক্ত বস্তুর জন্য, স্বতন্ত্রশৈলীর জন্য যা সাধারণত একটি নির্দিষ্ট ভৌগোলিক অঞ্চলে একসাথে পাওয়া যায় বা একই নির্দিষ্ট সময়ে পাওয়া যায়। হরপ্পা সংস্কৃতির ক্ষেত্রে এই বিশিষ্ট বস্তুর মধ্যে সিলমোহর, পুঁতি, ওজনমাপক, পাথরের ফলক (চিত্র 1.2) এবং পোড়া ইট অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। এইসব বস্তু দূরদূরান্তের এলাকা যেমন আফগানিস্তান, জম্মু, বেলুচিস্তান (পাকিস্তান) এবং গুজরাটে (ম্যাপ-1) পাওয়া গেছে।

প্রথম হরপ্পা নামক স্থানে এই অসাধারণ সংস্কৃতি আবিষ্কৃত হয় বলে এর নাম রাখা হয় হরপ্পা সংস্কৃতি (পৃ. 6)। এর সময়কাল ছিল খ্রি. পূ 2600 থেকে খ্রি.পূ. 1900 অব্দ। এর আগে এবং পরেও সংস্কৃতির অস্তিত্ব ছিল যাদের আদি হরপ্পা এবং পরবর্তী হরপ্পা সংস্কৃতি বলা হয়। এই সংস্কৃতিগুলো থেকে হরপ্পা সভ্যতাকে আলাদা করার জন্য কখনো কখনো একে বিকশিত হরপ্পা সংস্কৃতিও বলা হয়।

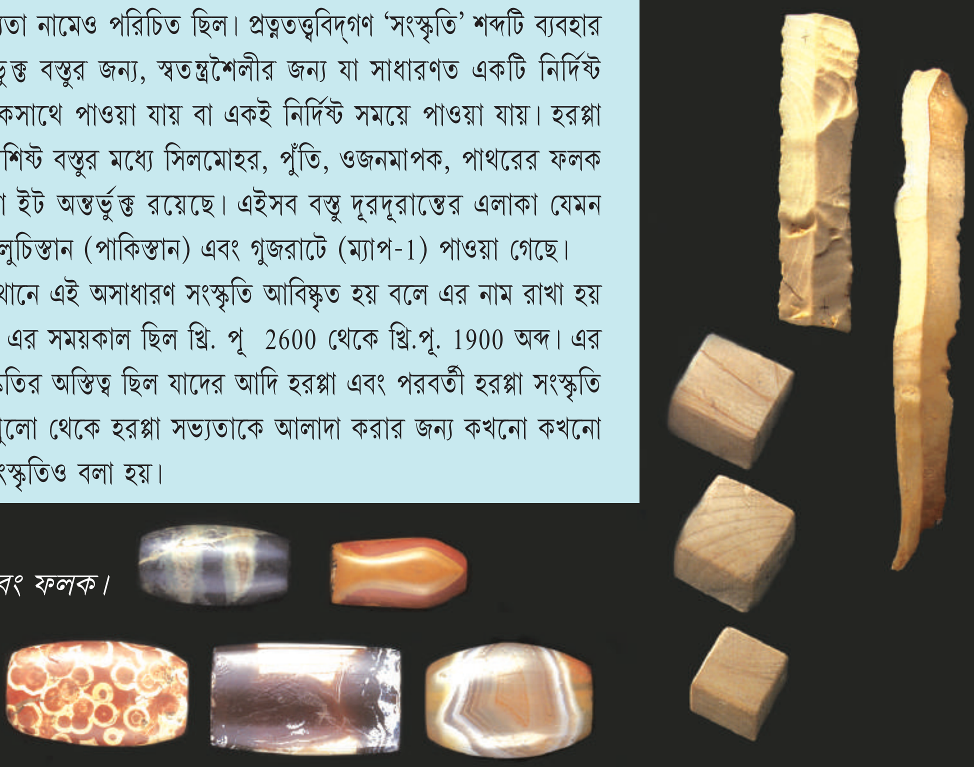

চিত্র 1.2
পুঁতি, ওজনমাপক এবং ফলক।

তোমরা এই বইটিতে তারিখ সম্পর্কিত কিছু সংক্ষিপ্ত বিবরণ পাবে।

বিপি — বর্তমানের পূর্বের সময়

বিসিই — খ্রিস্ট পূর্ব

সিই — খ্রিস্টাব্দ

সি — শব্দটি ল্যাটিন শব্দ সিরকা থেকে এসেছে যার অর্থ হল আনুমানিক।

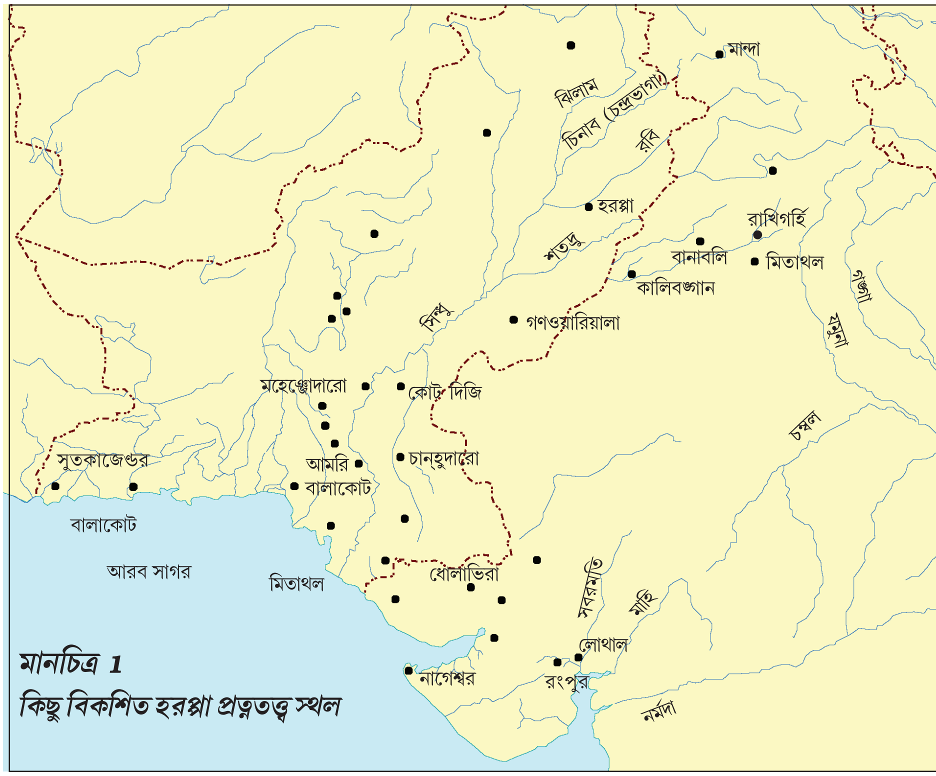

মানচিত্র 1
কিছু বিকশিত হরপ্পা প্রত্নতত্ত্ব স্থল

পূর্ব ও পরিণত হরপ্পা সংস্কৃতিসমূহ

নিম্নে উল্লেখিত পরিসংখ্যানটি দেখো, যেখানে সিন্ধু ও চোলিস্তানে বসতির সংখ্যা দেওয়া হয়েছে।

সর্বমোট	সিন্ধু	চোলিস্তান
বসতির সংখ্যা	106	239
পূর্ব হরপ্পা স্থানসমূহ	52	37
পরবর্তী হরপ্পা স্থানসমূহ	65	136
নতুন স্থানে পরিণত হরপ্পা বসতি	43	132
পূর্ব হরপ্পার পরিত্যক্ত স্থানসমূহ	29	33

1. প্রারম্ভ

পরিণত হরপ্পা সংস্কৃতির পূর্বে এই অঞ্চলে বেশ কয়েকটি পুরাতাত্ত্বিক সংস্কৃতি ছিল। এই সংস্কৃতিসমূহের সাথে বৈচিত্র্যময় নানা মৃৎপাত্র, কৃষিকাজ ও পশুপালন হস্তকলার নিদর্শনও সংপৃক্ত আছে। জনবসতিসমূহ সাধারণত ক্ষুদ্র ছিল। কোনো বৃহৎ ইমারতের অস্তিত্ব পাওয়া যায় নি। বিশাল বিশাল অঞ্চলের ব্যাপকহারে দগ্ধ ও ভস্মীভূত, পাশাপাশি পরিত্যক্ত জনবসতি থেকে সুস্পষ্ট ধারণা করা যায় যে, পূর্ব হরপ্পা মূল হরপ্পা থেকে পৃথক ছিল।

2. জীবিকা নির্বাহের কৌশল

তোমরা যদি 1 নং এবং 2 নং মানচিত্র লক্ষ কর তাহলে দেখবে ‘পরিণত হরপ্পা সংস্কৃতি’ পূর্ব হরপ্পা সংস্কৃতির অধিকৃত কিছু অঞ্চলসমূহে বিকশিত হয়। এই সংস্কৃতিগুলোর মধ্যে জীবিকা নির্বাহের কৌশলের মতো আরও কিছু বিষয়ে সাদৃশ্য ছিল। হরপ্পাবাসী নানা ধরনের লতাগুল্ম জাতীয় উদ্ভিদ ও মাছসহ বিবিধ প্রাণীজ আহার গ্রহণ করত। ওই স্থানসমূহ হতে পোড়া শস্য ও বীজ বিশ্লেষণ করে প্রত্নতত্ত্ববিদরা এদের খাদ্যাভ্যাস পুনর্গঠন করতে সক্ষম হয়েছেন। সাধারণত: এই সকল পরীক্ষা করেন প্রত্ন উদ্ভিদতত্ত্ববিদ্ পণ্ডিতগণ, যারা প্রাচীন উদ্ভিদের অবশিষ্টাংশ বিশ্লেষণ করার ব্যাপারে বিশেষজ্ঞ। যে

সকল শস্য হরপ্পার বিভিন্ন স্থান হতে পাওয়া গেছে, সেগুলোর মধ্যে গম, যব, মটরকলাই, মসুর ও তিল উল্লেখযোগ্য। গুজরাটে জোয়ার, বাজরা (Millets) ব্যবহারের নিদর্শন পাওয়া গেছে। চালের প্রচলন তুলনামূলকভাবে কম ছিল।

হরপ্পার বিভিন্ন অঞ্চলে মেষ, ছাগল, মহিষ, শূকর ও গবাদি পশুর অস্থি পাওয়া গেছে। প্রত্ন প্রাণীবিদ্‌দের অধ্যয়ন থেকে জানা যায় এই সকল প্রাণীরা গৃহপালিত ছিল। বন্যপ্রাণী যেমন- শূকর, হরিণ এবং ঘড়িয়ালের অস্থিও পাওয়া গেছে। আমরা জানিনা হরপ্পাবাসীরা নিজেরাই এসকল প্রাণী শিকার করেছিল নাকি শিকারি সম্প্রদায়ের কাছ থেকে এইসব মাংস জোগাড় করেছিল। মাছ ও পাখির অস্থিও পাওয়া গেছে।

মানচিত্র 2
আদি হরপ্পা সংস্কৃতির স্থানসমূহ
Sketch map not to scale

2.1 কৃষি প্রযুক্তি

শস্যদানার উপস্থিতি কৃষির প্রচলনকে নির্দেশ করলেও অপেক্ষাকৃত কঠিন কাজ হল প্রাপ্তসূত্রের উপর ভিত্তি করে সেই সময়ের কৃষি পদ্ধতি সম্পর্কে জানা। শস্যের বীজ কি লাঙল দিয়ে কর্ষণ করা জমিতে ছড়িয়ে দেওয়া হত? সিলমোহর ও টেরাকোটা স্থাপত্যে প্রাপ্ত চিত্র প্রমাণ করে মানুষ ষাঁড় সম্পর্কে অবহিত ছিল এবং পুরাতত্ত্ববিদ্‌রা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে, জমি চাষের জন্য ষাঁড়ের ব্যবহার হত। চোলিস্তান ও বানাওয়ালীতে (হরিয়ানা) লাঙলের পোড়ামাটির তৈরি প্রতিরূপও পাওয়া গেছে। পুরাতত্ত্ববিদ্‌গণ কর্ষিত জমির নির্দর্শনও পেয়েছেন কালিবঙ্গানে (রাজস্থানে), যেটি সম্ভবত পূর্ববর্তী হরপ্পা পর্যায়ের (ছবি-20 দেখ) সাথে যুক্ত। জমিতে লাঙল দ্বারা পৃথকীকৃত জমির অংশগুলো পরস্পরের সমকোণে অবস্থিত যা ইঙ্গিত করে যে দুটি ভিন্ন জাতের শস্য একই স্থানে উৎপন্ন করা হত।

চিত্র 1.3
টেরাকোটা ষাঁড়

পুরাতত্ত্ববিদ্‌গণ ফসল তোলার জন্য ব্যবহৃত যন্ত্রসমূহ চিহ্নিত করার চেষ্টা করেছেন, হরপ্পার অধিবাসীরা কি কাঠের বাঁট বা হাতলে বসানো প্রস্তরফলক ব্যবহার করত নাকি ধাতুনির্মিত যন্ত্র ব্যবহার করত?

হরপ্পা সংস্কৃতির অধিকাংশ অঞ্চল প্রায় শুষ্ক জমিতে অবস্থিত, যেখানে কৃষিকার্যের জন্য সম্ভবত জলসেচের প্রয়োজন হতো। আফগানিস্থানের হরপ্পা সংস্কৃতির স্থান শোরতুখাই-এ খালের কিছু নিদর্শন পাওয়া গেলেও পাঞ্জাব ও সিন্ধুতে পাওয়া যায়নি। সম্ভবত প্রাচীন খালগুলো অনেক আগেই পলি দ্বারা ভরাট হয়ে গিয়েছিল, অথবা হয়তো কূপের জল কৃষিক্ষেত্রে জলসেচের

➲ আলোচনা করো...

1 নং এবং 2 নং মানচিত্রে যে সকল বসতিসমূহ দেখানো হয়েছে তাদের মধ্যে কোনো সাদৃশ্য বা বৈসাদৃশ্য আছে কি?

চিত্র 1.4
তামার যন্ত্র

➲ তোমার কি মনে হয় এই যন্ত্রসমূহ ফসল কাটার জন্য ব্যবহার করা হত ?

চিত্র 1.5
ধোলাভিরার জলাধার-এর স্থাপত্যকর্ম লক্ষ করো।

➲ **আলোচনা করো...**

কোন্ প্রমাণাদির সাহায্যে পুরাতত্ত্ববিদ্‌গণ প্রচলিত খাদ্যাভ্যাস সম্পর্কিত তথ্য জানতে পারেন ?

কাজে ব্যবহার হত। এছাড়াও গুজরাটের ধোলাভিরায় আবিষ্কৃত জলাধারের সঞ্চিত জলও হয়তো কৃষিকাজে ব্যবহৃত হত।

সূত্র 1

হস্তনির্মিত নিদর্শন কীভাবে শনাক্ত করা যায়

খাদ্য প্রক্রিয়ার জন্য চূর্ণ করার যন্ত্রের পাশাপাশি মিশ্রণও রন্ধনের জন্যও কিছু পাত্রের প্রয়োজন ছিল। এই সকল পাত্র প্রস্তর, ধাতু ও টেরাকোটার দ্বারা নির্মিত হত। হরপ্পা সংস্কৃতির বিখ্যাত স্থান মহেঞ্জোদারোর খনন কার্য সম্পর্কিত প্রারম্ভিক বিবরণের অংশবিশেষ উদ্ধৃত করা হল।

প্রচুর সংখ্যায় জাঁতাকল আবিষ্কৃত হয়েছে এবং সম্ভবত এটি একমাত্র মাধ্যম ছিল যার দ্বারা খাদ্যশস্য চূর্ণ করা হত। সাধারণত জাঁতাকলগুলো অমসৃণভাবে শক্ত কঙ্করযুক্ত বালুকাময় আগ্নেয়শিলা বা বালিপাথর দ্বারা নির্মিত হয় এবং অধিকাংশই অতিরিক্ত ব্যবহারের চিহ্ন বহন করে। এদের ভিত সাধারণত উত্তল সম্ভবত এই কারণে যে, তাদের দোলন রোধ করার জন্য তাদের অবশ্যই ভূমি বা কাদার উপর স্থাপন করা হত। আবিষ্কৃত জাঁতাকলগুলো দুধরনের : এক ধরনের ছিল যেগুলোর উপর আরও একটি ক্ষুদ্র প্রস্তরখণ্ড চাপানো হত এবং এটিকে দিয়ে দ্বিতীয় পাথরকে নোড়া হিসেবে ব্যবহার করা হয়। যার ফলে ক্রমে নিম্নতর পাথরটিতে একটি বড়ো গর্তের সৃষ্টি হয়। প্রথম ধরনের জাঁতাকলগুলো সম্ভবত শুধুমাত্র খাদ্যশস্য চূর্ণ করার জন্য ব্যবহার করা হত। দ্বিতীয় ধরনটি সম্ভবত শুধুমাত্র রান্নার জন্য মশলাপাতি, ভেষজ চূর্ণ করার কাজে ব্যবহার হত। শেষোক্ত প্রস্তর খণ্ডগুলোর নামকরণ করেছিল 'ব্যঞ্জন পাথর' (curry stones)। আমাদের পাচক জাদুঘর হতে ওই জাতীয় একটি প্রস্তরখণ্ড পাকশালায় ব্যবহার করার জন্য ধার হিসেবে চেয়েছিল।

আর্নেস্ট ম্যাকে এর *Further Excavations at Mohenjodaro*, 1937 হতে গৃহীত।

চিত্র 1.6
জাঁতাকল

➲ পুরাতত্ত্ববিদ্‌রা প্রাচীন হস্তকলা কী উদ্দেশ্যে ব্যবহার হয় সেটি হৃদয়ঙ্গম করার উদ্দেশ্যে বর্তমান সময়ে ব্যবহৃত সামগ্রীর সাদৃশ্য বা মিলের সাহায্য নেন। আর্নেস্টম্যাকে বর্তমানকালের জাঁতাকলের সাথে তার আবিষ্কৃত সামগ্রীর তুলনা করেছেন। এটা কি কার্যকরী পদ্ধতি ?

3. মহেঞ্জোদারো — একটি পরিকল্পিত শহর :

হরপ্পা সভ্যতার সবচাইতে অসাধারণ বৈশিষ্ট্য হল নগরকেন্দ্রের বিকাশ সাধন। এসো আমরা এরকমই একটি কেন্দ্র মহেঞ্জোদারোকে আরো নিবিড়ভাবে লক্ষ করি। যদিও মহেঞ্জোদারোই সর্বাপেক্ষা সুপরিচিত খনন স্থল, কিন্তু প্রথম যে পুরাকীর্তি স্থলটি আবিষ্কৃত হয় তা ছিল হরপ্পা।

বসতি দুইভাবে বিভক্ত ছিল। একটি ছোটো কিন্তু উঁচুস্থানে ছিল অন্যটি বড়ো তবে নিম্নস্থানে তৈরি করা হয়। পুরাতত্ত্ববিদগণ এদের যথাক্রমে দুর্গ ও

চিত্র 1.7
মহেঞ্জোদারোর নক্‌শা

➲ দুর্গ ও নিম্নতর শহরের মধ্যে পার্থক্য কী?

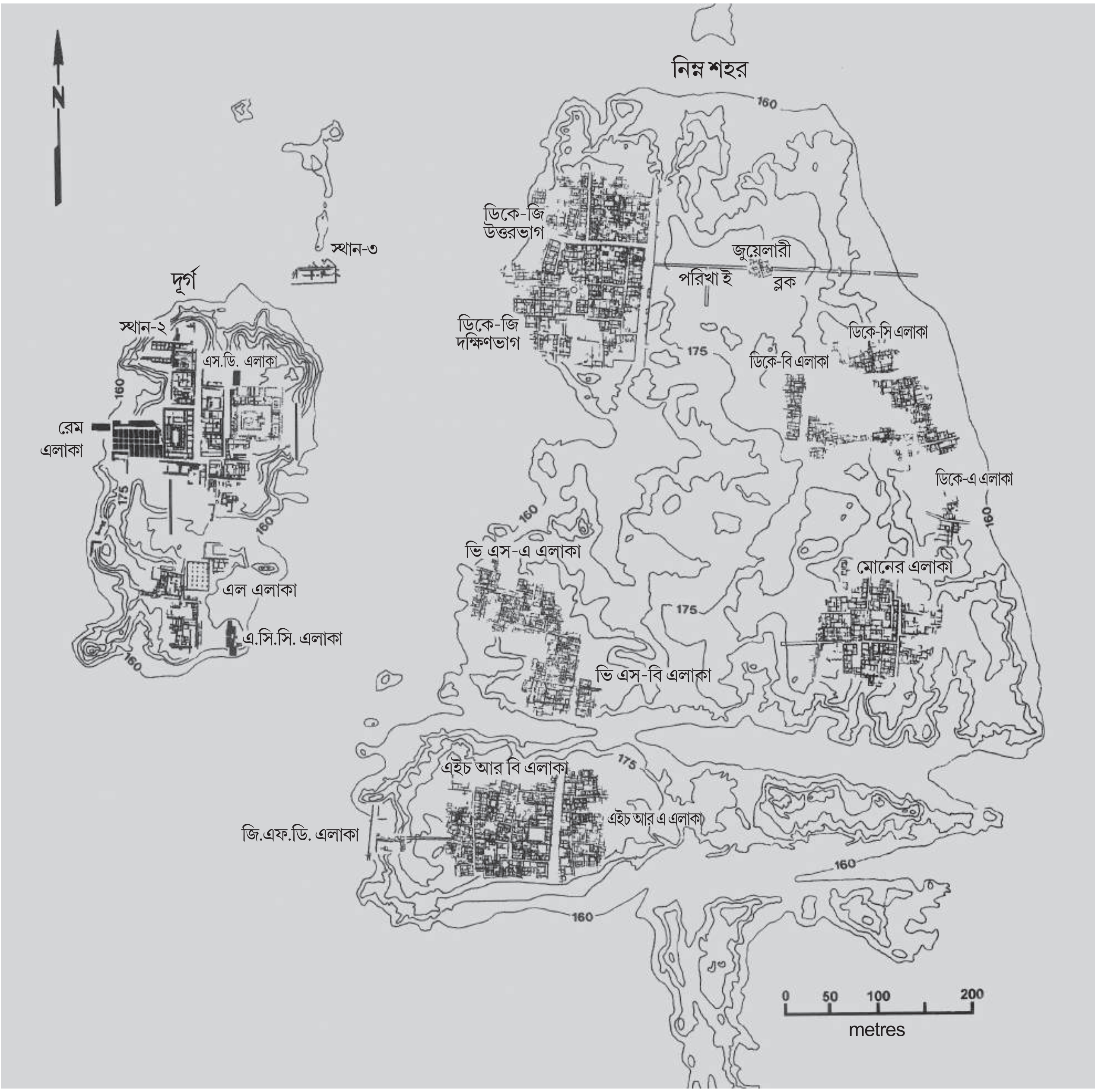

হরপ্পার দুর্দশা

যদিও হরপ্পাই প্রথম আবিষ্কৃত স্থান ছিল, কিন্তু এটি ইটচোরদের দ্বারা মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। 1875 সালে আলেকজান্ডার ক্যানিংহাম যিনি, ভারতীয় আর্কেওলজিক্যাল সার্ভের প্রথম অধিকর্তা, যাকে ভারতীয় পুরাতত্ত্বের পিতা এই অভিধায় ও কখনো কখনো ভূষিত করা হত। তিনি উল্লেখ করেন, যে বিপুল পরিমাণ ইট এই প্রাচীন খননস্থল থেকে সরিয়ে নেওয়া হয়েছিল তা দিয়ে লাহোর ও মূলতানের মধ্যে 100 মাইল দীর্ঘ রেলপথ নির্মাণ করা যেত। সুতরাং, খননস্থলে বহু প্রাচীন কাঠামো ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। সেই তুলনায় মহেঞ্জোদারো অনেক বেশি সুরক্ষিত ছিল।

নিম্ন শহর হিসেবে নামাঙ্কিত করেন। দুর্গের উচ্চতার কারণ অট্টালিকাসমূহ কাদা বা ইটের তৈরি ভিত্তি ভূমির উপর নির্মিত হয়েছিল। দুর্গটি ছিল প্রাচীর ঘেরা, যার অর্থ দাঁড়ায় যে, এটি নিম্ন শহর হতে পৃথক ছিল।

নিম্ন শহরও প্রাচীর বেষ্টিত ছিল। অনেকগুলো ইমারত উচ্চভিত্তি ভূমির উপর নির্মিত হয়েছিল যা বুনিয়াদ হিসেবে ব্যবহৃত হয়। হিসেব অনুযায়ী ভিত্তি ভূমিটি সঠিক স্থানে স্থাপিত করার লক্ষ্যে যদি একজন শ্রমিক এক কিউবিক মিটার মাটি প্রতিদিন সরায় তাহলে এটি নির্মাণ করতে চার লক্ষ শ্রম দিবসের প্রয়োজন হয়েছিল। অন্যভাবে বলতে গেলে বিপুল সংখ্যায় শ্রমিক নিয়োজিত করতে হয়েছিল। অন্য একটা দিক বিচার করো। একবার ভিত্তিভূমি নির্দিষ্ট স্থানে স্থাপিত হলে নগরের মধ্যে সমস্ত ইমারত নির্মাণ কাজ সেই ভিত্তিভূমিকে কেন্দ্র করে সীমাবদ্ধ হয়ে পড়ত। সুতরাং সম্ভবত পরিকল্পনা করে বসতি স্থাপন করা হত। পরিকল্পনার অন্য আর একটি লক্ষণ হল ব্যবহৃত ইট, যা রোদে শুকানো বা আগুনে পোড়ানো হোক না কেন তার একটি নির্দিষ্ট অনুপাত ছিল। যেখানে দৈর্ঘ্য ও প্রস্থ যথাক্রমে উচ্চতার চারগুণ ও দ্বিগুণ ছিল। এই ধরনের ইট সকল হরপ্পা বসতিতে ব্যবহৃত হত।

3.1 নর্দমা নির্মাণ

হরপ্পা নগর সমূহের অন্যতম স্বাতন্ত্র্য বৈশিষ্ট্য ছিল তার সযত্নে পরিকল্পিত পয়ঃপ্রণালী। তোমরা যদি নিম্ন শহর সমূহের নক্শা দেখো তাহলে লক্ষ্য করবে সড়ক এবং গলিগুলো মোটামুটি গ্রিড নক্শা ও রীতি বরাবর সমকোণে ছেদ করে। সম্ভবত পথঘাট এর সাথে নর্দমা প্রথম পরিকল্পনা অনুসারে প্রস্তুত করার পর তার পার্শ্বে গৃহাদি নির্মাণ করা হত। বাড়িঘরের নোংরা জল গলির নর্দমায় প্রবাহিত করার জন্য প্রতিটি গৃহের অন্ততঃ একটি দেওয়াল গলির সাথে যুক্ত হওয়ার প্রয়োজন ছিল।

চিত্র *1.8*
মহেঞ্জোদারোর একটি নর্দমা। এর বিশাল প্রবেশদ্বার লক্ষ কর।

দুর্গসমূহ

যদিও প্রায় সকল হরপ্পা বসতিতে একটি সামান্য উচ্চতাবিশিষ্ট পশ্চিম প্রান্ত এবং বৃহত্তর কিছু নীচু পূর্ব অংশ ছিল, এখানে বিভিন্নতাও ছিল। বিভিন্ন স্থান যেমন-ধোলাভিরা এবং গুজরাটের লোথালে সমগ্র বসতি অঞ্চল সুরক্ষিত ছিল এবং শহরের মধ্যবর্তী ভাগগুলো প্রাচীর দ্বারা পৃথকীকৃত ছিল। লোথালের দুর্গটি প্রাচীর দ্বারা বিছিন্ন ছিল না কিন্তু এটি বেশ উচ্চভূমিতে নির্মিত ছিল।

3.2 গৃহের স্থাপত্য

মহেঞ্জোদারোর নিম্ন শহরে বাসগৃহের নিদর্শন পাওয়া যায়। বহুগৃহ উঠান মাঝখানে রেখে চারদিকে নির্মিত হত। সম্ভবত উঠানটি বিবিধ কর্মকাণ্ডের কেন্দ্রবিন্দু ছিল বিশেষত শুষ্ক আবহাওয়ায় রান্না ও বয়নের কাজের। আরো একটি কৌতূহলোদ্দীপক বিষয় ছিল গোপনীয়তার জন্য স্পষ্ট উদ্বেগ। ভূমি সংলগ্ন প্রথম তলার দেওয়ালে কোনো জানালা ছিল না। তাছাড়াও প্রবেশদ্বার হতে সরাসরি অন্দরমহল দেখা যেত না।

প্রতিটি গৃহের নিজস্ব ইট বাঁধানো স্নানঘর ছিল, যার নালা প্রাচীরের মধ্য দিয়ে পথের নর্দমার সাথে যুক্ত থাকতো। কিছু সংখ্যক গৃহে দ্বিতল অথবা ছাদে পৌঁছানোর সিঁড়ির অবশিষ্টাংশও দেখতে পাওয়া যায়। বহুগৃহে কূপ ছিল, যা অধিকাংশ এমন কোঠার ভেতরে তৈরি করা হত যেখানে বাইরে থেকে প্রবেশ করা সম্ভব ছিল এবং যা পথচারীরা ব্যবহার করত। পণ্ডিতদের হিসাব অনুযায়ী মহেঞ্জোদারোতে প্রায় 700 কূপ ছিল।

Source 2

এ পর্যন্ত আবিষ্কৃত প্রাচীনতম ব্যবস্থা

পয়ঃপ্রণালী সম্পর্কে ম্যাকে লিখেছেন এ পর্যন্ত আবিষ্কৃত ব্যবস্থার মধ্যে নিশ্চিতভাবে এটি সর্বপেক্ষা পরিপূর্ণ একটি প্রাচীন ব্যবস্থা। প্রতিটি গৃহ রাস্তার পয়ঃপ্রণালীর সাথে সংযুক্ত ছিল। মূল খালগুলো কংক্রিটের ইটের গাঁথনি দিয়ে নির্মিত এবং আল্‌গা ইটে আচ্ছাদিত, যা পরিষ্কার করার জন্য সরানো যেত। কোনো কোনো ক্ষেত্রে ঢাকনা হিসেবে চুনাপাথর ব্যবহার করা হত। গৃহের পয়ঃ প্রণালী সমূহ প্রথমে একটি নিষ্কাশন কূপ বা আচ্ছাদিত গর্তে ফেলা হত, সেখানে বর্জ্য পদার্থ থিতিয়ে যেত এবং বর্জ্যজল রাস্তার নালীতে প্রবাহিত হয়ে যেত। সুদীর্ঘ পয়ঃপ্রণালীতে কিছু স্থান অন্তর অন্তর পরিষ্কার করার জন্য নিষ্কাশন কূপও ছিল। এটি পুরাকীর্তির একটি আশ্চর্য নিদর্শন যেখানে পয়ঃপ্রণালীর পাশে পাশে ছোটো ছোটো পদার্থের স্তূপ ছিল যার বেশিরভাগই বালুকাময়, যেটি প্রমাণ করে যখন পরিষ্কার করা হত আবর্জনার স্তূপ তখনই অপসারণ করা হত না।

আর্নেস্ট ম্যাকে, Early Indus Civilisation, 1948.

পয়ঃপ্রণালী শুধুমাত্র বৃহৎ নগরেই সীমাবদ্ধ ছিল না, ছোটো ছোটো বসতিতেও ছিল। উদাহরণ স্বরূপ লোথালে গৃহাদি কাঁচা ইটে নির্মিত হলেও পয়ঃপ্রণালী ছিল পোড়ামাটির ইটের।

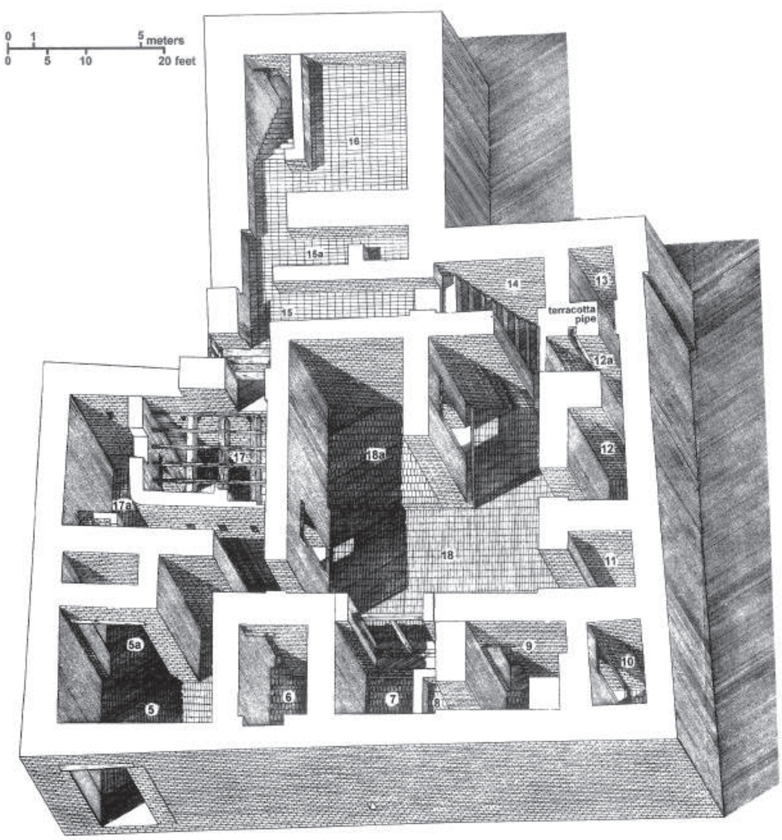

চিত্র 1.9
এটি মহেঞ্জোদারোর একটি বৃহৎগৃহের সমমান বিশিষ্ট নক্‌শা। গৃহটির 6 নং কোঠায় একটি কূপ ছিল।

➲ এখানে উঠান কোথায়? দুটি সিঁড়িইবা কোথায়? গৃহের প্রবেশদ্বারটি কীরূপ ?

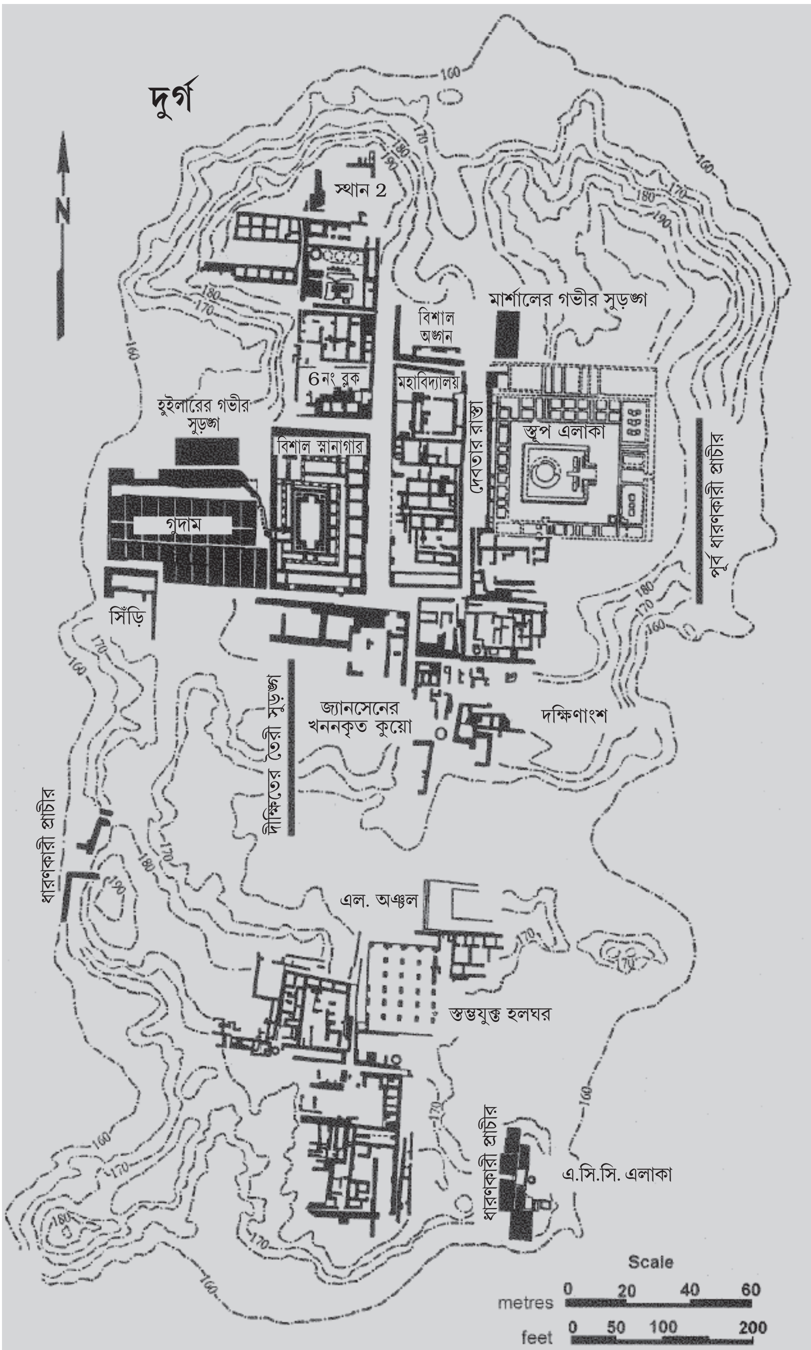

চিত্র *1.10*
দুর্গের নক্‌শা

3.3 দুর্গ

দুর্গের মধ্যে আমরা এমন কিছু গঠন প্রণালীর নিদর্শন দেখি যা সম্ভবত বিশেষ সর্বজনীন স্বার্থে ব্যবহার হত। এগুলির মধ্যে আছে গুদামঘরের বিশাল কাঠামো যার ইট নির্মিত নীচের অংশ রয়ে গেছে। কিন্তু উপরিভাগ যা সম্ভবত কাষ্ঠ নির্মিত ছিল তা বহু পূর্বেই ক্ষয়প্রাপ্ত হয়েছে। এছাড়া রয়েছে বিখ্যাত স্নানাগার। বিশাল স্নানাগারটি ছিল চারপাশে বারান্দা দ্বারা বেষ্টিত উঠানে তৈরি একটি বিশাল আয়তক্ষেত্রাকার জলাশয়। জলাশয়ে যাওয়ার জন্য উত্তর ও দক্ষিণে দুটি সিঁড়ি জলাধার পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। জলাধারের কিনারায় ইট বসিয়ে এবং জিপসাম নামক খনিজ পদার্থের মিশ্রিত মশলা দ্বারা একে জলরোধক করা হয়েছে। জলাধারের তিন দিকেই ঘর রয়েছে যার একটির মধ্যে বিশাল স্তূপ রয়েছে। জলাশয় হতে জল একটি বিশাল নর্দমায় প্রবাহিত হয়ে যেত।

রাস্তার অপর পারে উত্তরদিকে একটি ছোটো অট্টালিকায় আটটি স্নানাগার রয়েছে। সংযোগ পথের দুই পার্শ্বে চারটি করে স্নানাগার রয়েছে, প্রত্যেকটি স্নানঘর পয়ঃপ্রণালীর সঙ্গে যুক্ত, যেগুলো সংযোগপথ বরাবর আর একটি নর্দমার সাথে যুক্ত ছিল। কাঠামোর স্বতন্ত্ররূপ এবং দুর্গ এলাকায় প্রাপ্ত বিশিষ্ট অট্টালিকাসমূহ পণ্ডিতদের অনুভাবন করায় যে, এগুলো কোনো বিশেষ রীতি অনুযায়ী আনুষ্ঠানিক স্নানের জন্য ব্যবহার করা হত।

➲ আলোচনা করো...

মহেঞ্জোদারোর কোন্ স্থাপত্য বৈশিষ্ট্য পরিকল্পনার ইঙ্গিত দেয়?

➲ দুর্গের মধ্যে গুদামঘর এবং স্নানাগার ছাড়া আর কোনো কাঠামো আছে কি?

4. সামাজিক ব্যবধানের অনুসন্ধান (TRACKING SOCIAL DIFFERENCES)

4.1 সমাধিস্থলসমূহ (Burials)

পুরাতত্ত্ববিদগণ কোনো একটি নির্দিষ্ট সংস্কৃতির লোকদের মধ্যে কোনো সামাজিক বা আর্থিক ব্যবধান আছে কিনা তা জানার জন্য সাধারণত কয়েকটি কৌশল ব্যবহার করেন। এর মধ্যে একটি হল সমাধির বিষয়ে অধ্যয়ন করা। তোমরা সম্ভবত মিশরের বিশাল পিরামিডের সম্পর্কে জানো এদের মধ্যে কিছু হরপ্পা সভ্যতার সমকালীন। এইসকল পিরামিডের মধ্যে বহু রাজকীয় সমাধিও ছিল, যেখানে বিপুল পরিমাণে সম্পদ পুতে রাখা (buried) হত।

হরপ্পার খননস্থলে সমাধির যে নির্দেশন পাওয়া যায় তাতে দেখা যায় মৃতদেহ মাটির গহ্বরে শায়িত করা হত। কোনো কোনো সময়ে সমাধি গহ্বরটি নির্মাণ পদ্ধতিতে কিছু পার্থক্য দেখা যায় — কোনো কোনো ক্ষেত্রে গর্তের ভিতরভাগ ইট দ্বারা গাথা হত। এই পার্থক্যগুলো কি সামাজিক ব্যবধানের পরিচায়ক হতে পারে? আমরা নিশ্চিত নই।

কোনো কোনো সমাধিস্থলে রক্ষিত থাকত মৃৎপাত্র এবং অলঙ্কারাদি, সম্ভবত পরকালে (afterlife) ব্যবহার করা যাবে এই বিশ্বাস থেকেই এই প্রথার উদ্ভব। নারী পুরুষ উভয়ের সমাধিতেই গয়না পাওয়া গেছে। বস্তুত 1980 সালে হরপ্পার সমাধিক্ষেত্রে যে খননকার্য করা হয় সেই সময় খননস্থলে একজন পুরুষের মাথার খুলির নিকট হতে একটি অলংকার পাওয়া গেছে, অলংকারটি তিনটি ঝিনুকের বলয় জেপ্সার পুঁতি (এক ধরনের কম দামি পাথর) এবং শত শত সংখ্যায় ছোটো পুঁতি খচিত ছিল। কিছু কিছু ক্ষেত্রে মৃতদেহকে তাম্র নির্মিত দর্পণের সাথেও সমাধিস্থ করা হত। সামগ্রিকভাবে এটি প্রতিভাত হয় যে, হরপ্পাবাসীরা মৃতদেহের সাথে মূল্যবান সামগ্রী সমাধিস্থ করায় বিশ্বাস করত না।

চিত্র 1.11
একটি তামার আয়না

4.2 বিলাসিতার অনুসন্ধান :

সামাজিক ব্যবধান চিহ্নিত করার অপর একটি কৌশল হল হস্তকলা শিল্পের অধ্যয়ন। পুরাতত্ত্ববিদগণ যেগুলোকে মোটামুটিভাবে প্রয়োজনীয় ও বিলাসিতার সামগ্রী — এইভাবে শ্রেণি বিভক্ত করেন। প্রথম শ্রেণিতে রয়েছে দৈনন্দিন জীবনে ব্যবহৃত হয় এমন সব সামগ্রী যা সাধারণ উপাদান যেমন-পাথর বা কাদা দিয়ে অতি সহজেই তৈরি করা যেত, এগুলোর মধ্যে আছে জাঁতা মৃৎপাত্র, সূচ চামড়া ঘর্ষণকারী বস্তু ইত্যাদি। এইসকল বস্তু সাধারণত সব বসতি অঞ্চলেই পাওয়া যায়। প্রত্নতত্ত্ববিদ্রা সে সকল সামগ্রীকে বিলাসবহুল উপকরণ মনে করেন যেগুলো দুষ্প্রাপ্য অথবা মহার্ঘ্য ছিল এবং যেগুলো আঞ্চলিকভাবে পাওয়া যেত না এবং জটিল কারিগরি প্রযুক্তিতে তৈরি হত। সুতরাং চিনা মাটির ক্ষুদ্র পাত্রকে (এক জাতীয় পদার্থ যা বালু অথবা সিলিকার সাথে রং ও

চিত্র 1.12
একটি পালিশ করা চিনেমাটির পাত্র

সঞ্চিত ভান্ডার এর অর্থ হল যেস্থানে বস্তুসামগ্রী মানুষ সযত্নে রাখে যেমন- মৃৎপাত্র। এই সঞ্চিত ভান্ডারগুলো অলঙ্কারাদির বা ধাতব সামগ্রীর, যা ধাতু শিল্পীদের দ্বারা পুনর্ব্যবহারের জন্য সঞ্চিত করা হত। কোনো কারণে এর প্রকৃত মালিক এগুলো পুনরুদ্ধার না করলে এগুলো সেখানেই থেকে যেত যতদিন না পুরাতত্ত্ববিদ এগুলো আবিষ্কার করছে।

➲ আলোচনা করো...

মৃতদেহ সৎকারের বর্তমানে প্রচলিত প্রথা কী কী? এর দ্বারা কীরূপে সামাজিক ব্যবধান নির্ণয় করা সম্ভব?

গঁদ মিশ্রিত করে আগুনের উত্তাপে নির্মাণ করা হত) মহার্ঘ্য মনে করা হত কেননা এসবের নির্মাণ পদ্ধতি জটিল ছিল।

পরিস্থিতি জটিল হয় যখন আমরা দেখি যে বস্তুটি দৈনন্দিন জীবনে ব্যবহার্য যেমন সুতাকাটার টাকু সেটিও চীনামাটির মতো দুষ্প্রাপ্য পদার্থ দ্বারা নির্মিত। আমরা কি এদের প্রয়োজনীয় বা বিলাস উপকরণ হিসাবে শ্রেণিবিভক্ত করব?

যদি আমরা এই ধরনের হস্তকলার প্রচলনের ধরন লক্ষ করি তাহলে দেখি যে বৃহৎ বসতিযুক্ত অঞ্চলের বিশেষ করে মহেঞ্জোদারো এবং হরপ্পাতে এইসব মূল্যবান পদার্থ দিয়ে তৈরি দুর্লভ বস্তুর প্রচলন সাধারণত কেন্দ্রীভূত ছিল, অন্যান্য ছোটো বসতিযুক্ত অঞ্চলে এর চল বিশেষ দেখতে পাওয়া যায় না। উদাহরণস্বরূপ চিনামাটির ক্ষুদ্র মৃৎপাত্র, যা সম্ভবত সুগন্ধি দ্রব্যের পাত্র হিসেবে ব্যবহৃত হত সেগুলো হরপ্পা ও মহেঞ্জোদারোতে পাওয়া গেলেও কালিবঙ্গানে পাওয়া যেত না। স্বর্ণের ব্যবহারও সচরাচর ছিল না এবং বর্তমান কালের মতোই সম্ভবত অত্যন্ত মূল্যবান ছিল— হরপ্পার খননস্থল হতে উদ্ধারীকৃত স্বর্ণ অলংকারাদি সঞ্চিত ভাণ্ডার হতে পাওয়া গেছে।

5. শিল্প উৎপাদন বিষয়ে অনুসন্ধান :

মানচিত্র 1-এ চান্হুদারো চিহ্নিত করো। এটি মহেঞ্জোদারোর (125 হেক্টর) তুলনায় একটি অতি ক্ষুদ্র বসতি (7 হেক্টরের কম) ছিল, যা সম্পূর্ণভাবে কারিগরি শিল্প উৎপাদন যেমন-পুঁতি তৈরি, ঝিনুক কাটা ধাতব শিল্প, সিলমোহর, ওজনের যন্ত্রাদি তৈরি ইত্যাদিতে নিয়োজিত ছিল।

পুঁতি তৈরিতে বিভিন্ন উপাদানের ব্যবহার ছিল উল্লেখযোগ্য, বিভিন্ন পাথর যেমন- কার্নেলিয়া (সুন্দর রক্তবর্ণের) জেসপার, স্ফটিক, স্টিয়েটাইট, বিভিন্ন ধাতু যেমন- স্বর্ণ, পিতল, ব্রোঞ্জ ও তামা এবং ঝিনুক, চীনামাটি পোড়ামাটির ব্যাপক ব্যবহার হত। কোনো কোনো পুঁতি দুই বা তার বেশি পাথর একসঙ্গে যুক্ত করে তৈরি করা হত আর কিছু পাথরের উপরিভাগে স্বর্ণযুক্তও হত। এদের আকৃতিও ছিল বিভিন্ন রকমের যেমন- চাকতির গড়ন, চোঙাকৃতি বিশিষ্ট,

চিত্র 1.13
একটি যন্ত্র ও পুঁতির মালা

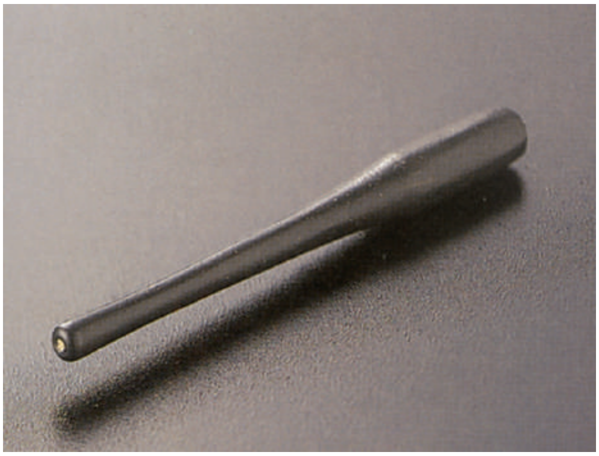

গোলাকার, পিপা সদৃশ এবং খণ্ডিত। কিছু খোদাই করে বা অঙ্কন করে সাজানো হত এবং কোনো কোনোটির উপর নক্‌শা খোদিত হত। উপাদান অনুযায়ী মালার নির্মাণ কৌশলও পরিবর্তিত হয়। স্টিয়াটাইট্ একটি অত্যন্ত কোমল পাথর, যার উপর সহজেই কাজ করা সম্ভব ছিল। কিছু কিছু পুঁতি স্টিয়াটাইট্ চূর্ণের কাদাটে মিশ্রণ হতেও তৈরি করা হত। এর ফলে কঠিনতম প্রস্তর হতে তৈরি শুধুমাত্র জ্যামিতিক আকার ছাড়াও বিভিন্ন ধরনের আকার তৈরি সহজ ছিল। প্রাচীন শিল্প প্রযুক্তি নিয়ে অধ্যয়নরত পুরাতত্ত্ববিদ্‌গণের নিকট স্টিয়াটাইট দ্বারা নির্মিত অতি ক্ষুদ্র পুঁতি আজও এক প্রহেলিকা।

প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌দের পরীক্ষানিরীক্ষায় প্রকাশিত হয়েছে যে, কার্ণিলিয়ানের লাল রংটি উৎপাদনের বিভিন্ন পর্যায়ে হলুদাভ কাঁচামাল এবং পুঁতি আগুনে গলিয়ে পাওয়া গেছে। পিণ্ডগুলোকে প্রথম পাতলা টুকরো করে রুক্ষ আকার দেওয়া হয় এবং পরে সূক্ষ্মভাবে চূড়ান্ত আকারে নিয়ে যাওয়া হয়। প্রেষণা, ঘষামাজা এবং ছিদ্র করার পর সমগ্র প্রক্রিয়াটি সম্পূর্ণ হত। বিশেষ ধরনের ছিদ্রকরণ যন্ত্র চানহুদারো, লোথাল এবং সম্প্রতি ঢোলাভিরাতে পাওয়া গেছে।

তোমরা যদি মানচিত্র 1-এ নাগেশ্বর ও বালাকোটের অবস্থান নির্দেশ করো তাহলে লক্ষ করবে উভয় বসতি সমুদ্র উপকূলে অবস্থিত ছিল। এই স্থানগুলো ঝিনুক দ্বারা তৈরি বিভিন্ন বস্তু যেমন- চুড়ি, হাতা, রত্ন খচিত করা জিনিস ইত্যাদির বিশেষ বিশেষ কেন্দ্র, যেখান হতে তা অন্য বসতিযুক্ত অঞ্চলে নিয়ে যাওয়া হত। একইভাবে সম্ভবত চানহুদারো এবং লোথাল থেকে তৈরি পণ্যগুলো বড়ো শহুরে কেন্দ্র যেমন- মহেঞ্জোদারো এবং হরপ্পায় নিয়ে যাওয়া হত।

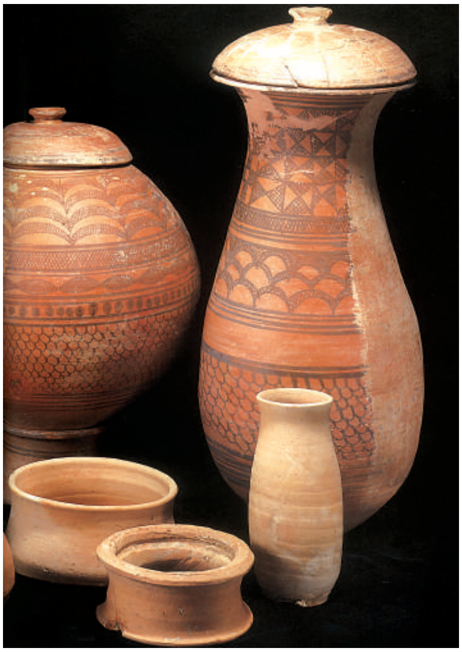

চিত্র 1.14
মৃৎপাত্র —
এদের কিছুদিনের জাতীয় সংগ্রহশালার অথবা লোথালের খননস্থলের সংগ্রহশালায় দেখতে পাওয়া যায়।

চিত্র 1.15
একটি টেরাকোটার ক্ষুদ্র মূর্তি

5.1 উৎপাদন কেন্দ্রসমূহ চিহ্নিতকরণ

হস্তশিল্প উৎপাদন কেন্দ্রগুলো চিহ্নিত করার জন্য পুরাতত্ত্ববিদ্ সাধারণত নিম্নলিখিত বিষয়ের অনুসন্ধান করেন: প্রস্তরপিণ্ড, আস্ত ঝিনুক, তাম্র যন্ত্রাদি, যন্ত্রাদির অসমাপ্ত সামগ্রী, পরিত্যক্ত বস্তু এবং বর্জ্য পদার্থের। বস্তুত বর্জ্য হস্তশিল্পের একটি অন্যতম সূচক, উদাহরণ স্বরূপ বলা যেতে পারে যদি কোনো সামগ্রী তৈরির জন্য ঝিনুক অথবা পাথর কাটা হয় তবে ওই সকল বস্তুর কাটা অংশগুলো বর্জ্য হিসেবে

➲ আলোচনা করো...

যে প্রস্তর নির্মিত হস্তশিল্প এই অধ্যায়ে চিত্রিত করা হয়েছে সেগুলো কি প্রয়োজনীয় বা বিলাসিতার সামগ্রী? এখানে কি এমন বস্তুসমূহ আছে যা উভয় শ্রেণিতেই অন্তর্ভুক্ত করা যায়?

চিত্র 1.16
তাম্র এবং ব্রোঞ্জের পাত্র

উৎপাদন কেন্দ্রের পাশে পরিত্যক্ত থাকবে।

কখনো বড়ো পরিত্যক্ত অংশগুলো ছোটো ছোটো বস্তু নির্মাণের জন্য ব্যবহৃত হত। কিন্তু উৎপাদনস্থলে অতি ক্ষুদ্র টুকরোগুলো পড়ে থাকত। এই চিহ্নগুলো নির্দেশ করে যে ক্ষুদ্র ও বিশেষ ধরনের কেন্দ্র ছাড়াও হস্তশিল্পের উৎপাদন বৃহৎ নগরসমূহ যেমন- মহেঞ্জোদারো এবং হরপ্পাতেও হত।

6. বস্তু সংগ্রহের কৌশল (Strategies for Procuring Materials)

এটা স্পষ্ট যে, হস্তশিল্প উৎপাদনে নানা ধরনের উপাদান ব্যবহৃত হত। কিছু সামগ্রী যেমন- কাদা স্থানীয়ভাবে উপলব্ধ হলেও বহু উপাদান যেমন পাথর, কাঠ এবং ধাতু, পলিগঠিত সমভূমির বাইরে থেকে সংগ্রহ করতে হত। টেরাকোটা বা পোড়া মাটির নির্মিত গোরুর গাড়ির খেলনার প্রতিকৃতি নির্দেশ করে যে এটি লোকজন এবং পণ্যদ্রব্য সড়কপথে পরিবহণের একটি গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম ছিল। সম্ভবত সিন্ধু ও উপনদীগুলোর পাশাপাশি নদী তীরবর্তী রাস্তা এবং উপকূলীয় রাস্তাগুলো ব্যবহৃত হত।

6.1 উপমাদেশ এবং তার বাইরে থেকে প্রাপ্ত উপকরণ

হস্তশিল্প উৎপাদনের উপাদান হরপ্পাবাসীরা নানারূপে সংগ্রহ করত। উদাহরণ হিসাবে বলা যেতে পারে এরা নাগেশ্বর এবং বালাকোটে বসতি স্থাপন করে, যেখানে ঝিনুক সহজলভ্য ছিল। আরো অন্যান্য এরূপ স্থান হল সুদূর আফগানিস্থানের শোরতুখাই, যেটি লাপিস্ লাজুলী নামে অতি মূল্যবান নীল পাথরের উৎসস্থল এবং লোথাল যেটি কার্নেলিয়ানের উৎসের নিকট (গুজরাটের বারুচ) স্টিয়াটাইট (দক্ষিণ রাজস্থান) এবং উত্তর গুজরাট এবং ধাতু (রাজস্থান)র প্রাপ্তস্থানের নিকটে ছিল।

কাঁচামাল সংগ্রহের ব্যাপারে আরও একটি সম্ভবপর কৌশল হল রাজস্থানের খেতরি (তামার জন্য) এবং দক্ষিণ ভারত (স্বর্ণের জন্য) অভিযান চালানো। এই অভিযানগুলোর ফলে স্থানীয় সম্প্রদায়ের সাথে যোগাযোগ স্থাপিত হয়। এই অঞ্চলগুলোতে মাঝে মাঝে খুঁজে পাওয়া স্টিয়াটাইট এর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পুঁতির মতো হরপ্পার হস্তশিল্প — এই ধরনের সম্পর্কের ইঙ্গিত দেয়। খেতরি অঞ্চলে কিছু প্রমাণ আছে যে কারণে পুরাতত্ত্ববিদরা একে গণেশ্বর-যোধপুরা সংস্কৃতি বলত। কেননা এই সংস্কৃতি স্বাতন্ত্র্য বৈশিষ্ট্যযুক্ত মৃৎপাত্র হরপ্পার মৃৎপাত্র থেকে আলাদা ছিল এবং সেখানে তামার সামগ্রীর অসাধারণ ভাণ্ডার পাওয়া যায়। সম্ভবত এই অঞ্চলের অধিবাসীরা হরপ্পাবাসীদের তামা সরবরাহ করত।

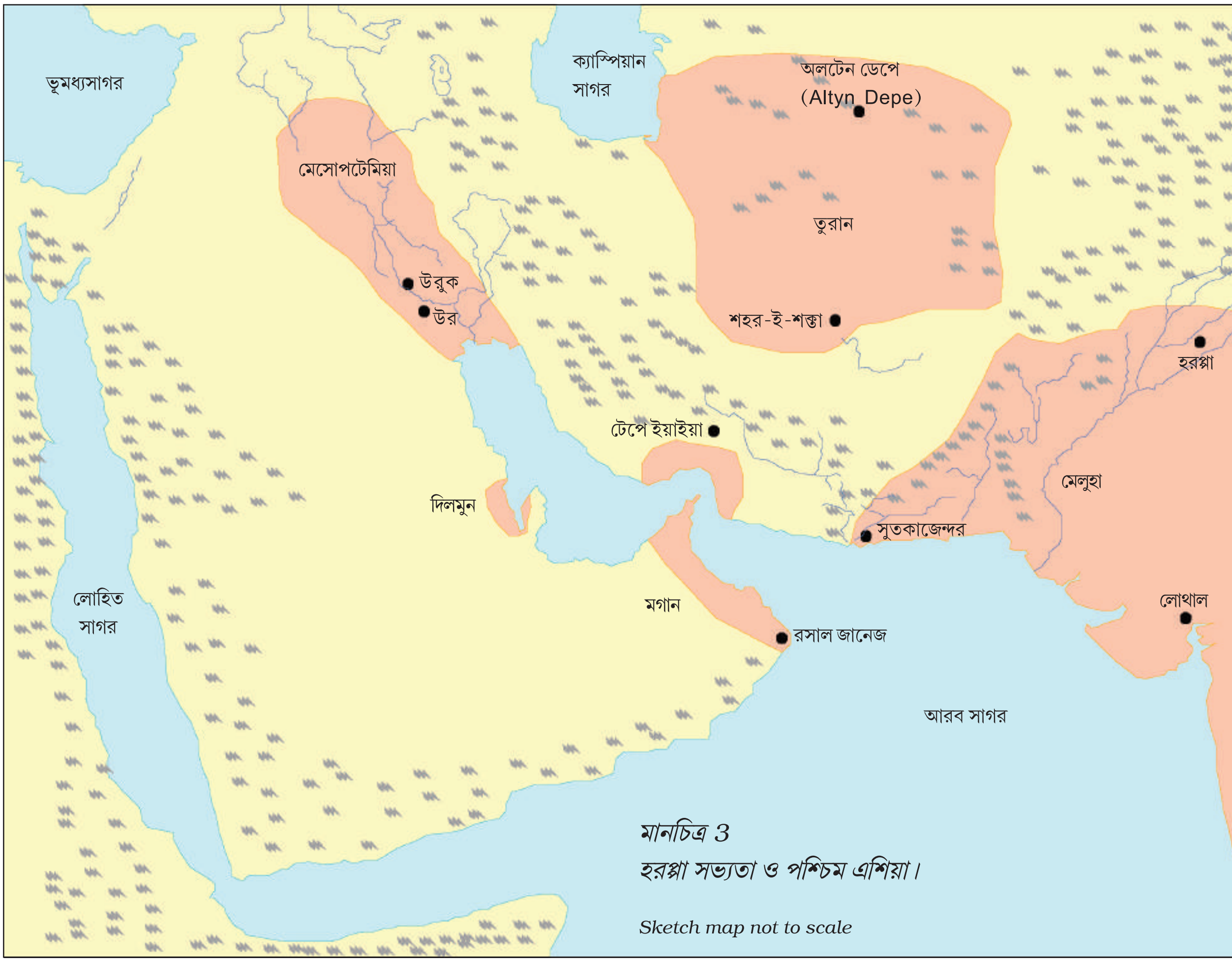

মানচিত্র 3
হরপ্পা সভ্যতা ও পশ্চিম এশিয়া।

6.2 দূরবর্তী এলাকার সাথে যোগাযোগ

সাম্প্রতিক কালের পুরাকীর্তি সংক্রান্ত আবিষ্কার ইঙ্গিত করে যে সম্ভবত আরব উপদ্বীপের দক্ষিণ পূর্ব প্রান্ত ওমান হতেও তামা সংগ্রহ করা হত। রাসায়নিক বিশ্লেষণ প্রমাণ করে যেহেতু ওমানের তামা এবং হরপ্পার হস্তশিল্প উভয়তেই দস্তার চিহ্ন আছে, উভয়ের উৎসও একই। তাছাড়া সম্পর্কের অন্যান্য প্রমাণও আছে। ওমানের খনন স্থলে ঘন স্তরযুক্ত কালো মাটির লেপযুক্ত বড়ো একটি বিশেষ ধরনের হরপ্পার পাত্র পাওয়া গেছে। এই ধরনের ঘন প্রলেব তরল পদার্থের চুঁইয়ে পড়া (percolation) রোধ করে। আমরা জানি না এ ধরনের পাত্রে কী বহন করা হত, তবে সম্ভবত ওমানের তামার জন্য হরপ্পাবাসীরা এই পাত্রগুলো বিনিময় করত।

খ্রিস্টপূর্ব তৃতীয় সহস্রাব্দে মেসোপটেমিয় গ্রন্থগুলো থেকে জানা যায়, তামা আনা হত মগান নামে একটি অঞ্চল থেকে, যা সম্ভবত ওমানের একটি

চিত্র 1.17
ওমানে প্রাপ্ত হরপ্পার ভাণ্ড।

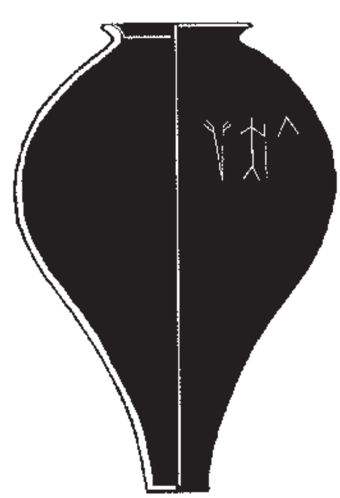

নাম এবং এটা সত্যিই চমকপ্রদ ছিল যে, মেসোপটেমিয়ায় প্রাপ্ত তামার ও দস্তার অংশ ছিল। অন্যান্য পুরাতাত্ত্বিক আবিষ্কার যা দূরবর্তী অঞ্চলের সাথে যোগাযোগ নির্দেশ করে তার মধ্যে হরপ্পার সিলমোহর, ওজনমাপক, পাশা এবং পুঁতি ছিল। এই পরিপ্রেক্ষিতে এটা বিশেষভাবে লক্ষণীয় মেসোপটেমিয়ার গ্রন্থে দিলমুন (সম্ভবত বাহরিন দ্বীপ) মগান এবং মেলুহা (যা সম্ভবত হরপ্পার অঞ্চল হিসেবে পরিচিত) অঞ্চলের সাথে মেসোপটেমিয়ার যোগাযোগের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। এতে মেলুহায় উৎপাদিত পণ্যের মধ্যে কার্নেলিয়ান, লাপিস লাজুলী, তামা, সোনা এবং বিভিন্ন প্রকারের কাঠ উল্লেখযোগ্য ছিল। মেলুহা সম্পর্কে মেসোপটেমিয়ায় একটি শ্রুতি রয়েছে -

চিত্র 1.18
এটি একটি নলাকার সিলমোহর যা মেসোপটেমিয়ার প্রতীক কিন্তু এর উপর কুঁজ বিশিষ্ট ষাঁড়ের অলঙ্করণটি বোধ হয় সিন্ধু অঞ্চল হতে নেওয়া।

তোমার পাখি হাজা পাখি হোক, এর কণ্ঠস্বর রাজার মহলে ধ্বনিত হোক কোনো কোনো পুরাতত্ত্ববিদের মতে, হাজা পাখি হল ময়ূর। পাখিটির নাম কি তার ডাক অনুযায়ী দেওয়া হয়েছিল? সম্ভবত ওমান, বাহরিন অথবা মেসোপটেমিয়ার গ্রন্থে মেলুহাকে নাবিকদের দেশ বলে অভিহিত করা হয়। পাশাপাশি আমরা সিলমোহরে নৌকা এবং জাহাজের চিত্রও পাই।

চিত্র 1.19
গোলাকার পার্সিয়ান উপসাগরীয় সিলমোহর যা বাহরাইন এ পাওয়া যায় এগুলো কখনো কখনো হরপ্পার নিদর্শন বহন করে। লক্ষণীয় ঘটনা এই যে, স্থানীয় দিলমুন ওজনমাপক হরপ্পার আদর্শমান অনুসরণ করত।

চিত্র 1.20
একটি নৌকা চিত্রিত সিলমোহর।

➲ আলোচনা করো...
হরপ্পা অঞ্চল থেকে দিলমুন, মেসোপটেমিয়া, ওমানের সম্ভাব্য রাস্তাগুলো কী ছিল?

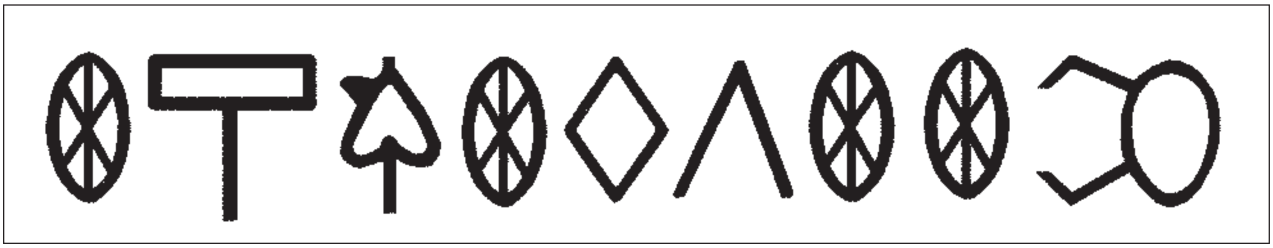

চিত্র 1.21
একটি প্রাচীন সাইনবোর্ডে দেওয়া অক্ষর।

7. সিলমোহর, লিপি এবং ওজনমাপক

7.1 সিলমোহর ও মুদ্রাঙ্কন

দূরবর্তী স্থানের বা দেশের সাথে যোগাযোগের ক্ষেত্রে সিলমোহর ও মুদ্রাঙ্কন ব্যবহৃত হত। কল্পনা করো এক থলে ভর্তি বস্তু একস্থান থেকে অন্য স্থানে পাঠানো হচ্ছে। এর মুখ দড়ি দিয়ে বাঁধা হয়, গাঁটটি সিক্ত কাদামাটি দ্বারা যুক্ত পাতে এক বা একাধিক সিলমোহর চাপানো হয়েছে, যার ফলে মাটিতে সিলমোহরের ছাপ পড়েছে, বস্তুটি যদি সিলমোহর অঙ্কিত ছাপ সহ গন্তব্যস্থলে পৌঁছাত সেক্ষেত্রে ধরে নেওয়া হত এতে কোনো অবৈধ হস্তক্ষেপ করা হয়নি। মুখবন্ধনটি প্রেরকের পরিচিতি বহন করত।

চিত্র 1.22
রোপার থেকে প্রাপ্ত একটি মুদ্রাঙ্কন।

➲ এই মাটির খন্ডটিতে কতগুলো সিলমোহরের ছাপ রয়েছে?

7.2 এক রহস্যময় লিপি

সাধারণত হরপ্পা সিলমোহরে একটি পংক্তিতে লেখা হত যা সম্ভবত মালিকের নাম ও পদবি বহন করতো। পণ্ডিতরা এ বিষয়ে ইঙ্গিত করেন যে, অলঙ্করণ (সাধারণত কোনো পশু) নিরক্ষর ব্যক্তিবর্গের কাছে একটা পথ বহন করত।

অধিকাংশ উৎকীর্ণ লিপিই সংক্ষিপ্ত ছিল। সবচেয়ে বড়ো লিপিতে প্রায় 26টি চিহ্ন ছিল। যদিও অদ্যাবধি লিপিগুলোর অর্থ উদ্ধার করা সম্ভব হয়নি। এটি স্পষ্টতই বর্ণমালা জাতীয় নয় (যেখানে প্রত্যেকটি প্রতীক ক্ষেত্রে স্বরবর্ণ বা ব্যঞ্জনবর্ণকে চিহ্নিত করে) কেননা এটি প্রচুর প্রায় 375 থেকে 400 চিহ্ন ছিল। এটা সুস্পষ্ট যে লিপিটি ডানদিক থেকে বাঁদিকে লেখা হত, ফলে ডানদিকে পরিসর বেশি থাকত আর বাঁদিক সংকুচিত থাকত। ফলে মনে হয় খোদাইকারী ডানদিক হতে লেখা শুরু করে বাঁদিকে যেতে যেতে স্থান সংকুলান হত না।

এবার দেখা যাক, কত ধরনের বস্তুর উপর লেখা আবিষ্কৃত হয়েছে — সিলমোহর, তামার পাত্র, বৈয়ামের বেড়, টেরাকোটা ও তাম্রফলক, অলঙ্কার, অস্থিদণ্ড এমনকি প্রাচীন প্রাচীরপত্রও এর অন্তর্ভুক্ত ছিল। স্মরণে রাখা দরকার নষ্টপ্রায় বা বিনাশলীল বস্তুর উপরেও লিপি উৎকীর্ণ হত এর মানে কি এই ছিল যে, স্বাক্ষরতার হার ব্যাপক ছিল?

7.3 ওজনমাপক :

চার্ট নামক ঘনকাকৃতি কোনো চিহ্নহীন প্রস্তরে নির্মিত ওজনের একটি পরিশুদ্ধ বিধি ব্যবস্থা দ্বারা বিনিময় ব্যবস্থাকে নিয়ন্ত্রণ করা হত (চিত্র1.2), স্বল্প

➲ আলোচনা করো...

বর্তমান কালে দূরদূরান্তে কোন্ কোন্ পদ্ধতিতে পণ্য বিনিময় করা হয়? এর সুবিধা ও সমস্যাগুলো কী?

পরিমাণের ওজন ছিল দ্বিচল বিশিষ্ট (binary) (1, 2, 4, 8, 16, 32, ইত্যাদি প্রায় 12,800 পর্যন্ত), যেখানে উচ্চ পরিমাপগুলো সম্ভবত দশমিক প্রথাকে অনুসরণ করত। ছোটো মাপের ওজনগুলো সম্ভবত অলঙ্কার বা পুঁতির ওজন মাপার জন্য ব্যবহৃত হত। ধাতব তুলাদণ্ডও পাওয়া গেছে।

৪. প্রাচীন শাসক

হরপ্পা সমাজে জটিল সিদ্ধান্ত গ্রহণ এবং কার্যকরী করার ইঙ্গিত পাওয়া গেছে, উদাহরণস্বরূপ বিভিন্ন মৃৎপাত্র, (চিত্র 1.14), সিলমোহর, ওজনমাপক এবং ইট দ্বারা নির্মিত হরপ্পার হস্তশিল্পে এক অত্যাশ্চর্য সমরূপবিশিষ্টতা দেখতে পাওয়া যায়। বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য, ইট যা কোনো একটিমাত্র অঞ্চলে নির্মিত হত কিন্তু জম্মু থেকে গুজরাট পর্যন্ত সমগ্র অঞ্চলে তা সমান অনুপাত ছিল। আমরা আরো লক্ষ করেছি বসতিগুলো নির্দিষ্ট অঞ্চলে সুকৌশলে বিভিন্ন কারণে স্থাপন করা হয়। পাশাপাশি ইট তৈরি, বিশাল প্রাচীর এবং ভিত্তিভূমি (platform) তৈরি করার জন্য শ্রমিক জোগাড় করা হত। কারা এই কাজগুলো সংগঠিত করতো?

চিত্র 1.23
একজন "পুরোহিত রাজা"

8.1 প্রাসাদ ও নৃপতিগণ

যদি আমরা শক্তির কেন্দ্রের দিকে দৃষ্টিপাত করি বা ক্ষমতাশালী ব্যক্তিবর্গকে বর্ণনার প্রয়াস করি, তাহলে পুরাতাত্ত্বিক তথ্যপঞ্জি আমাদের তাৎক্ষণিক উত্তর প্রদান করে না। মহেঞ্জোদারোর একটি সুবিশাল ইমারতকে পুরাতত্ত্ববিদ্‌রা প্রাসাদ বলে আখ্যায়িত করলেও এর সাথে যুক্ত দৃষ্টি আকর্ষক কোনো কিছু খুঁজে পাওয়া যায় না। একটি প্রস্তরমূর্তিকে 'পুরোহিত রাজা' (priest-king) বলে আখ্যায়িত করা হয় এবং আজও সেটি পুরোহিত রাজা হিসেবে পরিচিত। এর কারণ হল পুরাতত্ত্ববিদ্‌রা মেসোপটেমিয়ার ইতিহাস এবং এর পুরোহিত রাজাদের সাথে পরিচিত ছিল আর তারা সিন্ধু সভ্যতায়ও এর সাদৃশ্য খুঁজে পান। আমরা দেখতে পাব যে, সকল রীতিনীতি হরপ্পা সভ্যতায় প্রচলিত ছিল, তা অদ্যাবধি সম্পূর্ণভাবে বোঝা যায়নি, এগুলো জানার কোনো উপায় নেই কারণ এগুলো যারা সম্পাদন করত তারা রাজনৈতিক ক্ষমতারও অধিকারী ছিল।

কিছু পুরাতত্ত্ববিদ এই অভিমত পোষণ করেন যে হরপ্পা সমাজে কোনো শাসক ছিল না এবং প্রত্যেকের সমান মর্যাদা ছিল। অন্যরা মনে করেন সেখানে কোনো একজন নয়, কিন্তু এদের বেশি শাসক ছিল, যেমন- মহেঞ্জোদারো ও হরপ্পাতে পৃথক পৃথক শাসক ছিল। অন্য আরো কিছু সংখ্যক পুরাতত্ত্ববিদ হস্ত শিল্পের সাদৃশ্য, পরিকল্পিত বসতি, ইটের আয়তনের নির্ধারিত মান অনুযায়ী তার অনুপাত এবং কাঁচামালের উৎসের নিকট বসতি স্থাপন ইত্যাদি প্রমাণের উপর ভিত্তি করে এই যুক্তি উপস্থাপন করেন যে, সেখানে একটি রাষ্ট্র ছিল।

➲ **আলোচনা করো...**
হরপ্পা সমাজে সকলের কি সমান মর্যাদা ছিল?

এযাবৎ শেষ অনুমানটি আপাতদৃষ্টিতে সর্বাপেক্ষা যুক্তিসঙ্গাত মনে হয় যেহেতু এটি সম্ভব নয় যে, সমগ্র জনসম্প্রদায় একত্রে মিলিতভাবে এই জটিল সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে এবং কার্যকর করেছে।

৯. সভ্যতার পরিসমাপ্তি

এই তথ্যের প্রমাণ আছে যে, আনুমানিক 1800 খ্রিঃ পূঃ পর্যন্ত চোলিস্তান-এর মতো অঞ্চলের অধিকাংশ পরবর্তী হরপ্পা বসতি পরিত্যক্ত হয়। পাশাপাশি গুজরাট, হরিয়ানা এবং পশ্চিম উত্তরপ্রদেশের নুতন বসতিগুলোতে জনসংখ্যা বৃদ্ধি পেতে থাকে।

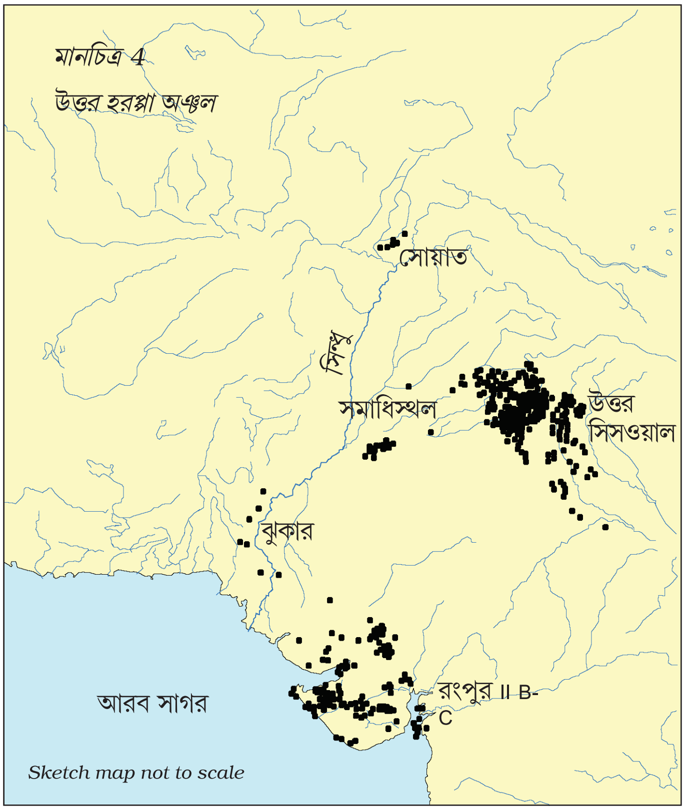

যে স্বল্প কয়েকটি হরপ্পা সভ্যতার স্থলের 1900 খ্রিঃ পূঃ কালের পরেও অস্তিত্ব বজায় ছিল সেসকল স্থানে বস্তুগত সংস্কৃতির পরিবর্তন সাধিত হয়, সভ্যতাটির স্বাতন্ত্র্যসূচক হস্তশিল্প যেমন- ওজনমাপক, সিলমোহর, বিশেষ ধরনের পুঁতি, লেখনি, দূরদূরান্তের বাণিজ্য এবং কারিগরি বিশেষজ্ঞতা অপসৃত হয়। সাধারণত খুব অল্প পরিমাণ জিনিস তৈরিতে খুব কম উপকরণ ব্যবহার হতে থাকে। গৃহনির্মাণ পদ্ধতির মান নিম্নগামী হতে লাগলো এবং বৃহৎমাপের সার্বজনিক ইমারত নির্মাণ স্তব্ধ হয়ে যেতে লাগল। সামগ্রিকভাবে হস্তশিল্প এবং বসতি একটি গ্রামীণ জীবনের ইঙ্গিত বহন করে যাকে বিলম্বিত (উত্তর) হরপ্পা বা উত্তরসূরি সংস্কৃতি বলা হয়। কীভাবে এই পরিবর্তন সাধিত হয়? এর অনেক ব্যাখ্যা উপস্থাপিত করা হয়েছে। এর মধ্যে জলবায়ু পরিবর্তন, অরণ্যের বিনাশ, বারবার বন্যা, নদীসমূহের গতিপথ পরিবর্তন অথবা শুষ্ক হয়ে যাওয়া, ভূমির অতিরিক্ত ব্যবহার ইত্যাদি অন্তর্ভুক্ত ছিল। এগুলোর মধ্যে কিছু কারণ কিছু কিছু বসতির ক্ষেত্রে সঠিক হলেও এর কোনোটাই সম্পূর্ণ সভ্যতা ধ্বংস হয়ে যাওয়ার কারণ হিসেবে যথেষ্ট নয়।

এটি প্রতিপন্ন হয় যে, সম্ভবত হরপ্পা রাজ্যের শক্তিশালী ঐক্যবদ্ধ মেলবন্ধনের উপাদানগুলো দুর্বল হতে থাকে এবং এটি ধ্বংসের দিকে ধাবিত হয়। এর প্রমাণ হল সিলমোহর, লিপি, স্বাতন্ত্র্য বৈশিষ্ট্যযুক্ত পুঁতি ও মৃৎপাত্রাদির অপসৃত হওয়া, একটি নির্ধারিত মান অনুসারে ওজন ব্যবস্থা থেকে আঞ্চলিক ওজন ব্যবস্থায় পরিবর্তিত হওয়া এবং নগরসমূহের পতন ও পরিত্যক্ত হওয়া। উপমহাদেশটিকে সম্পূর্ণ নূতন অঞ্চলে নূতন নগরসমূহে পত্তনের জন্য হয়তো এক সহস্রাব্দ অপেক্ষা করতে হয়েছে।

উৎস 3

আগ্রাসনের প্রমাণ

মৃতমানবের গলিপথ বা ডেড্‌ম্যানস্ লেন হচ্ছে একটি সংকীর্ণ পথ যা 3 হতে 6 ফুট চওড়া, যেখানে পথটি পশ্চিমপ্রান্তে ঘুরে গেছে সেখানে 4 ফুট 2 ইঞ্চি গভীরে করোটির অংশ, বক্ষের অস্থিসমূহ এবং একটি প্রাপ্তবয়স্ক মানুষের ঊর্ধ্ববাহুর অংশ অত্যন্ত ভঙ্গুর অবস্থায় আবিষ্কৃত হয়েছে। মৃতদেহটি চিৎ হয়ে আড়াআড়িভাবে পথটিতে শায়িত ছিল। এর পনেরো ইঞ্চি দূরত্বে ছোট্ট করোটির অংশবিশেষ ছিল। এই দেহাবশেষগুলোর জন্যই এই পথটির ঐ নামাকরণ করা হয়েছে।

1931 জন মার্শালের মহেঞ্জোদারো এবং সিন্ধু সভ্যতা পুস্তক হতে গৃহীত।

1925 সালে ওই একই স্থান হতে অলঙ্কার পরিহিত অবস্থায় 16টি নরকঙ্কাল আবিষ্কৃত হয়।

অনেক পরে এ.এস.আই.-এর সর্বাধ্যক্ষ আর.ই.এম. হুইলার এই পুরাতাত্ত্বিক নিদর্শনগুলোর সাথে উপমহাদেশের সর্বপ্রাচীন গ্রন্থ ঋগবেদের সম্পর্ক স্থাপনের প্রয়াস করেন। তিনি লিখেছেন - ঋগ্বেদে পুরু কথাটির উল্লেখ রয়েছে যার অর্থ কেল্লা,দুর্গ অথবা দুর্ভেদ্য স্থান। আর্যদের যুদ্ধদেবতা ইন্দ্রকে বলা হয়েছে পুরন্দর অর্থাৎ দুর্গ ধ্বংসকারী। কোথায় আছে ... কোথায় ছিল এই দুর্গসমূহ? অতীতে মনে করা হতো এগুলো কোনো পৌরাণিক কাহিনি, কিন্তু সম্প্রতি হরপ্পার খননকার্য সমস্ত চিত্রটি পাল্টে দিয়েছে। এখানে আমরা একটি উন্নত মানের অনার্য ধরনের সভ্যতার সন্ধান পাই যেটি বিশাল দুর্গ নির্মাণ করতো, এই সুদৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত সভ্যতাটি কীভাবে ধ্বংসপ্রাপ্ত হলো? জলবায়ু, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক অবক্ষয় একে দুর্বল করতে পারে, তবে এর চূড়ান্ত বিলুপ্তি সম্ভবত সুচিন্তিত এবং বৃহৎ আকারে ধ্বংসের মাধ্যমে সম্পন্ন হয়েছে। নিছক এটা মনে করার কোনো সম্ভাবনা নেই যে মহেঞ্জোদারোর শেষ পর্যায়ে পুরুষ, মহিলা এবং শিশুদের নির্বিচারে হত্যা করা হয়। আনুষঙ্গিক প্রমাণাদিতে ইন্দ্রকেই অভিযুক্ত মানা হয়। আর.ই.এম হুইলার এর 'হরপ্পা 1946 ' প্রাচীন ভারত 1947 হতে গৃহীত।

1960 সালে জর্জ ডালেস্ নামে এক পুরাতত্ত্ববিদ মহেঞ্জোদারোর নির্বিচার হত্যাকাণ্ডের প্রমাণ নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন, তিনি দেখিয়েছেন, যে নরকঙ্কালগুলো পাওয়া গেছে সেগুলো একই সময়ের নয়।

যদিও এদের মধ্যে কিছু নিশ্চয়ই হত্যার ইঙ্গিত বহন করে ... অধিকাংশ অস্থির স্তূপ যার উল্লেখ করা হচ্ছে তা অনুভাবিত করে যে, সমাধিস্থলগুলো অত্যন্ত যত্নহীন এবং শ্রদ্ধাহীনতার সাথে তৈরি করা হয়েছে। নগরগুলোর অন্তিম সময়ের সঙ্গে সম্পর্কিত বিনাশের কোনো চিহ্ন পাওয়া যায় নি, বিস্তৃত ভস্মীকরণেরও কোনো চিহ্ন পাওয়া যায়নি, বর্ম পরিহিত এবং চতুষ্পার্শ্বে অস্ত্রশস্ত্র পরিবৃত কোনো যোদ্ধার শবদেহও পাওয়া যায়নি। দুর্গ, যেটি নগরের সর্বাপেক্ষা দুর্ভেদ্য অংশ, সেটিও শেষ প্রতিরোধের কোনো চিহ্ন বহন করে না।

জি.এফ. ডেইলস্-এর "The Mythical Massacre at Mohenjodaro", 1964 থেকে গৃহীত।

➲ আলোচনা করো...

মানচিত্র 1, 2 ও 4-এর মধ্যে কী কী সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্য আছে?

তোমরা দেখতে পাচ্ছ, তথ্যের সযত্ন পুনঃ পরীক্ষা নিরীক্ষা কখনো কখনো পূর্ববর্তী ব্যাখ্যাকে পাল্টে দিতে পারে।

10. হরপ্পা সভ্যতার আবিষ্কার (Discovering the Harappan Civilisation)

এখন অবধি আমরা হরপ্পা সভ্যতার দিকগুলো পরীক্ষা করে দেখেছি যে, কীভাবে পুরাতত্ত্ববিদগণ বস্তুর অবশিষ্টাংশ হতে প্রমাণ জোগাড় করে একটি চিত্তাকর্ষক ইতিহাসের ভিন্ন ভিন্ন অংশকে একত্রিত করেছেন। যাই হোক, এর আরো একটি কাহিনিও আছে — কীভাবে পুরাতত্ত্ববিদ্গণ সভ্যতাটিকে "আবিষ্কার" করেন।

হরপ্পার নগরসমূহ যখন ধ্বংসপ্রাপ্ত হয় মানুষ ধীরে ধীরে সে সম্বন্ধে পুরোপুরি বিস্মৃত হয়ে পড়ে। কয়েক সহস্রাব্দ পরে মানুষ যখন আবার এইস্থানে বসবাস করতে শুরু করে তারা বুঝে উঠতে পারে না যে, হঠাৎ মাটির তলদেশ থেকে উঠে আসা এই সকল আশ্চর্য হস্তশিল্প নিয়ে কী করবে যা বন্যার জলে ভেসে এসেছে অথবা ভূমিক্ষয়ের ফলে অনাবৃত হয়েছে অথবা জমি কর্ষণের সময় বা ধনরাশির সন্ধানে ভূমি খনন করার সময় দৃষ্টিগোচর হয়েছে।

10.1 ক্যানিংহাম এর বিভ্রান্তি

এ.এস.আই.এর প্রথম মুখ্য অধিকর্তা ক্যানিংহাম ঊনিশ শতকের মধ্যভাগে যখন প্রত্নতাত্ত্বিক খনন শুরু করেন, তখন প্রত্নতত্ত্ববিদ্রা অনুসন্ধান কার্যের পথ প্রদর্শক হিসেবে লিখিত সূত্রকে (সাহিত্য ও অভিলিখন) অধিক প্রাধান্য দেয়। বস্তুত ক্যানিংহামের মূল আকর্ষণ ছিল প্রাচীন ঐতিহাসিক (আনুমানিক খ্রি: পূ: ষষ্ঠ শতক -খ্রিস্টিয় চতুর্থ শতাব্দী) এবং পরবর্তী যুগের প্রতি। তিনি চিনা বৌদ্ধ তীর্থযাত্রীদের, যারা এই উপমহাদেশে চতুর্থ এবং সপ্তম শতাব্দীতে পর্যটন করতে এসেছিলেন, তাদের রেখে যাওয়া বিবরণ হতে প্রারম্ভিক বসতিগুলোকে চিহ্নিত করার চেষ্টা করেন। ক্যানিংহাম তার সমীক্ষার সময় পাওয়া নথিভুক্ত ও অনুবাদকৃত শিলালিপিও সংগ্রহ করেছিলেন। যখন তিনি পুরাতাত্ত্বিক স্থান খনন করেন তখন তিনি সেই সকল হস্তশিল্প পুনরুদ্ধার করার চেষ্টা করেন যেগুলোর সংস্কৃতির মূল্য রয়েছে বলে তিনি মনে করেন।

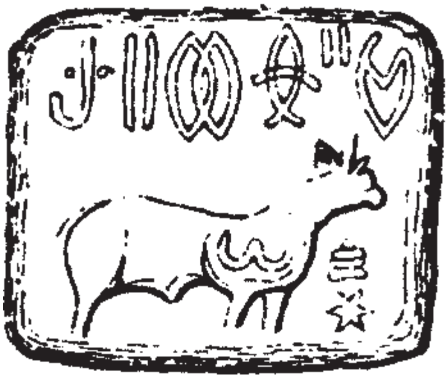

চিত্র 1.24
ক্যানিংহাম-এর আঁকা হরপ্পার প্রথম সিলমোহর

হরপ্পার মতো একটি খননস্থল, যেটি চিনা পর্যটকদের ভ্রমন সূচির অংশ ছিল না এবং প্রাচীন ঐতিহাসিক শহর হিসেবেও পরিচিত ছিল না সেটি তার অনুসন্ধান প্রণালীর সাথে পরিষ্কারভাবে খাপ খায় নি। যদিও ঊনিশ শতকে কখনো কখনো হরপ্পার প্রত্নবস্তু পাওয়া যেত এবং এর কিছু কিছু ক্যানিংহামের কাছেও পৌঁছাত, কিন্তু তবুও তিনি বুঝতে পারতেন না এইসব প্রত্নবস্তু কতটা প্রাচীন ছিল।

ক্যানিংহামকে একজন ব্রিটিশ লোক একটি হরপ্পার সিলমোহর দেয়। ক্যানিংহাম বস্তুটি লক্ষ্য করেন কিন্তু তাঁর পরিচিত সময়সূচির সাথে এটিকে সংযুক্ত করার অসফল চেষ্টা করেন। এটা হয়েছিল কেননা অন্যদের মতো

তিনিও বিশ্বাস করতেন যে, ভারতীয় ইতিহাস গাঙ্গোয় উপত্যকার নগরসমূহের সাথেই প্রথম শুরু হয় (অধ্যায় ২ দেখো)। তার এই বিশেষ অবধারণার কারণেই, তার পক্ষে হরপ্পার তাৎপর্য বুঝতে বিফল হওয়া আশ্চর্যের ছিল না।

10.2 একটি নব্য প্রাচীন সভ্যতা

পরবর্তীকালে বিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে দয়ারাম সাহানীর মতো প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌দের দ্বারা হরপ্পার সিলমোহর আবিষ্কৃত হয়, যা নিশ্চিতভাবে প্রারম্ভিক ঐতিহাসিক স্তরের তুলনায় অনেক পুরানো ছিল। তখনই তাদের তাৎপর্য উপলব্ধি করা শুরু হয়। অন্য একজন প্রত্নতত্ত্ববিদ রাখাল দাস ব্যানার্জি একই ধরনের সিলমেহার মহেঞ্জোদারোতে আবিষ্কার করেন, যার দ্বারা এটা অনুমান করা যায় যে, এই স্থানগুলো একই প্রত্নতাত্ত্বিক সংস্কৃতির অঙ্গ। এই সকল তথ্য প্রমাণের উপর নির্ভর করে 1924 সালে এ.এস.আই. এর ডিরেক্টর জেনারেল জন মার্শাল বিশ্বের কাছে সিন্ধু উপত্যকায় এক নতুন সভ্যতার আবিষ্কারের কথা ঘোষণা করেন। '*The Story of Indian Archaeology*'তে এস.এন. রায় লেখেন — মার্শাল ভারতকে যেভাবে পেয়েছেন তার থেকেও তিনি হাজার বছর প্রাচীন হিসেবে রেখে যান। এর কারণ হল তখন পর্যন্ত একই প্রকার অসনাক্ত সিলমোহর মেসোপটেমিয়ার খননস্থলেও পাওয়া যায়। এর ফলে সমগ্র বিশ্ব শুধুমাত্র একটি নতুন সভ্যতার কথাই নয়, জানতে পারে মেসোপটেমিয়ার সমকালীন এক নতুন সভ্যতার কথা।

বস্তুত এ.এস.আই. এর মুখ্য অধিকর্তা হিসেবে জন মার্শাল এর কার্যকাল ভারতীয় পুরাতত্ত্বে এক বিশাল পরিবর্তন সাধন করে। তিনি ছিলেন ভারতে কর্মরত প্রথম পেশাদার পুরাতত্ত্ববিদ, তিনি ক্রিট ও গ্রিস এর কর্ম অভিজ্ঞতাকেও এক্ষেত্রে কাজে লাগান। আরো গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার ছিল যদিও ক্যানিংহামের ন্যায় তিনিও অত্যাশ্চর্য আবিষ্কারের প্রতি আগ্রহী ছিলেন, সমানভাবে দৈনন্দিন জীবনশৈলির প্রতিও আগ্রহী ছিলেন।

মার্শাল খননস্থলের স্তরবিন্যাসকে সম্পূর্ণরূপে আগ্রহ্য করে ঢিবির সর্বত্র সমপরিমাণ স্বাভাবিক অনুভূমিক একক এর পাশাপাশি খননকার্য করতে প্রয়াসী হন। এর অর্থ হল একই স্থান থেকে উদ্ধারকৃত সমস্ত নিদর্শনগুলো পৃথক

প্রত্নস্থল, ঢিবি, স্তরসমূহ

প্রত্নতাত্ত্বিক স্থলসমূহ বস্তু ও কাঠামোর উৎপাদন, ব্যবহার ও বর্জনের ফলে গঠিত হয়। যখন মানুষ একইস্থানে ক্রমান্বয়ে থাকতে শুরু করে এবং যখন ভূ-খণ্ডটির ক্রমাগত ব্যবহার ও পুনর্ব্যবহারের ফলে ব্যবহারকারীদের দ্বারা আবর্জনার সৃষ্টি হয় তাকে ঢিবি বলে। স্বল্প বা স্থায়ীভাবে পরিত্যাগ করার ফলে বাতাস, জলের ক্রিয়াকলাপ এবং ভূমিক্ষয়ের ফলে ভূ-খণ্ডের পরিবর্তন সাধিত হয়। বিভিন্ন স্তরে প্রাপ্ত প্রাচীন উপাদানগুলো থেকে বসতিগুলো শনাক্ত করা হয়। এই স্তরগুলো একটি অপরটি থেকে রং, গঠনবিন্যাস এবং হস্তশিল্পের দ্বারা ভিন্ন হত। পরিত্যক্ত বা বর্জিত স্থান যেগুলোকে নিস্ফলা স্তর বলা হত সেগুলো এইসব চিহ্নের অনুপস্থিতেই শনাক্ত করা যায়।

সাধারণত সবচেয়ে প্রাচীনতম স্তর নিচে থাকে এবং উপরে থাকে নবীনতম স্তর। এই স্তরগুলোর অধ্যয়নকে স্তর বিজ্ঞান বলা হয়। স্তরগুলোতে প্রাপ্ত নিদর্শনগুলোকে নির্দিষ্ট সাংস্কৃতিক পর্যায়ের সাথে যুক্ত করা যায় বা কোনো প্রত্নস্থলের সাংস্কৃতিক পর্যায়ক্রম সম্পর্কে ধারণা দেয়।

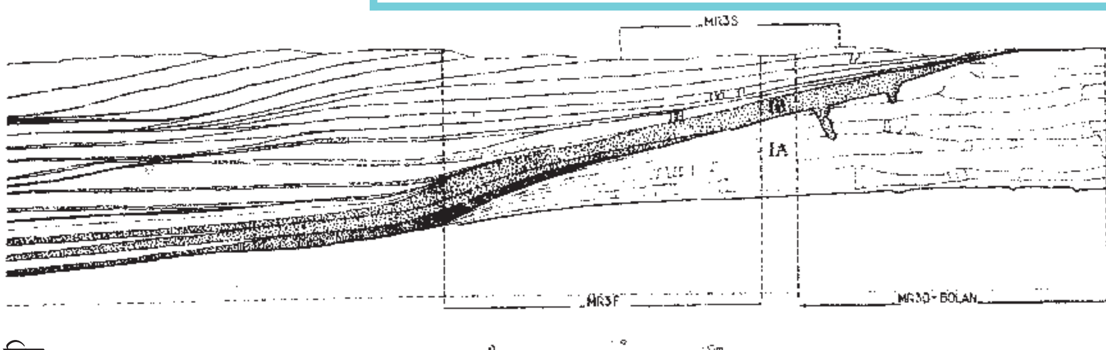

চিত্র 1.25

একটি ছোটো ঢিবির স্তরবিন্যাস। লক্ষ করো যে স্তরগুলো ঠিক অনুভূমিক (horizontal) নয়।

পৃথক স্তরে পাওয়া গেলেও তাদের একত্রে শ্রেণিবদ্ধ করা হয়। ফলস্বরূপ এই আবিষ্কারগুলোর সূত্র সম্পর্কে মূল্যবান তথ্য হারিয়ে যায়, যেগুলোকে পুনরায় পাওয়া অসম্ভব।

10.3 নতুন কলাকৌশল এবং প্রশ্নাবলি

1944 সালে ASI এর ডাইরেক্টর জেনারেল হয়ে R.E.M. হুইলার এই সমস্যার সংশোধনের ব্যবস্থা করেন। হুইলার স্বীকার করেন যে, যান্ত্রিকভাবে একটি সমান্তরাল অনুভূমিক রেখার খনন করার চেয়ে বেশি প্রয়োজনীয় হল ঢিবিগুলোর মৃত্তিকার স্তরবিন্যাস অনুসরণ করা। তদুপরি একজন প্রাক্তন সেনাবাহিনীর ব্রিগেডিয়ার হিসেবে তিনি তার সাথে প্রত্নতত্ত্ব অনুশীলনের জন্য একটি সামরিক যথার্থতাও নিয়ে এসেছিলেন।

হরপ্পা সভ্যতার ভৌগোলিক সীমান্তের সাথে বর্তমানের জাতীয় সীমান্তরেখার যত্সামান্য বা কোনো সম্পর্ক নেই। তাছাড়া উপমহাদেশের ভাগের পর এবং পাকিস্তান রাষ্ট্র গঠনের পর অধিকাংশ প্রত্নতত্ত্বস্থল পাকিস্তানের অন্তর্গত হয়ে গেছে। এই ঘটনা ভারতীয় প্রত্নতত্ত্ববিদ্দের ভারতে প্রত্নতত্ত্ব স্থলগুলো শনাক্ত করার চেষ্টা করতে উৎসাহিত করেছে। কচ্ছে একটি বিস্তৃত জরিপ বেশ কিছু হরপ্পা বসতি উদ্ঘাটিত করেছে এবং পাঞ্জাব ও হরিয়ানায় অনুসন্ধান হরপ্পার নির্ধারিত স্থানের তালিকা দীর্ঘায়িত করেছে। এই অনুসন্ধান ও খনন প্রচেষ্টার অংশ হিসেবে যখন কালিবংগান, লোথাল, রাখীগড়ী এবং অতি সাম্প্রতিককালে ধোলাবিরা আবিষ্কৃত হয়েছে তেমনি নূতন তথ্য অনুসন্ধানের কার্যও পাশাপাশি চলছে।

কয়েক দশক যাবৎ নতুন কিছু প্রসঙ্গও গুরুত্ব লাভ করেছে। যেখানে কতিপয় প্রত্নতাত্ত্বিক প্রায়ই একটি সাংস্কৃতিক ধারাবাহিকতার অনুসন্ধানে লিপ্ত, অন্যেরা বিশেষ খনন স্থানগুলোর অবস্থানের যৌক্তিকতা অনুধাবন করার চেষ্টা করেছেন। এঁরা হস্তকলার প্রাচুর্য নিয়েও অনুসন্ধান করেন, অনুধাবন করতে চান এই সকল হস্তশিল্পের আনুমানিক কার্যকারিতা কি ছিল।

1980 সাল থেকে হরপ্পার প্রত্নতত্ত্ব সম্পর্কে আন্তর্জাতিক আগ্রহ বৃদ্ধি পায়। উপমহাদেশ এবং বিদেশ হতে বিশেষজ্ঞগণ একযোগে হরপ্পা ও মহেঞ্জোদারোতে কাজ করছেন। তারা আধুনিক বিজ্ঞানসম্মত প্রযুক্তি ব্যবহার করে যার মধ্যে কাদা, পাথর, ধাতু, উদ্ভিদ এবং পশুর অবশিষ্টাংশ প্রাপ্তির জন্য অনুসন্ধান করার পাশাপাশি সহজলভ্য প্রমাণের ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র অংশের পুঙ্খানুপুঙ্খ বিশ্লেষণও যুক্ত বলেছে। এই অনুসন্ধানগুলো ভবিষ্যতে আকর্ষণীয় ফলাফল দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দেয়।

➲ আলোচনা করো...

এই অধ্যায়ের কোন্ প্রসঙ্গসমূহ ক্যানিংহামকে আগ্রহান্বিত করত? 1947 সাল হতে কোন্ প্রসঙ্গগুলো আগ্রহের কারণ ছিল?

হরপ্পায় হুইলার

প্রারম্ভিক পুরাতত্ত্ববিদগণ, প্রায়ই একটি রোমাঞ্চকর মনোভাবের দ্বারা চালিত হতেন। হরপ্পার অভিজ্ঞতা সম্পর্কে হুইলার সে কথাই লিখেছেন :

> আমার মনে পড়ে সেটি ছিল 1944 সালের মে মাসের এক তপ্ত রাত্রি, পুরাতাত্ত্বিক অনুসন্ধান-এর নবনিযুক্ত ডিরেক্টার জেনারেল হিসাবে আমি একজন স্থানীয় মুসলিম অফিসার-এর সাথে 'হরপ্পা' নামক একটি ছোটো রেলওয়ে স্টেশন থেকে এক গভীর বালুর পথ ধরে চার মাইল টাঙ্গায় চড়ে প্রাচীন ঢিবি যা চাঁদের আলোয় জ্যোৎস্না স্নাত ছিল, এর পাশে এক বিশ্রামাগারে পৌঁছালাম। আমাকে আমার উদ্বিগ্ন সাথী সাবধান করে দেয় যে, আমাদের অনুসন্ধানের কাজ পরদিন সকাল 5.30মি শুরু করে 7.30 মিনিটের মধ্যে শেষ করতে হবে কেননা এরপর প্রচণ্ড গরম পড়বে। আমরা ভেতরে প্রবেশ করলাম, প্রবেশ দ্বারে কালো রঙের পতঙ্গগুলো শান্তভাবে নতজানু ছিল এবং রাতের বাতাস পাশের জঙ্গলের অসংখ্য শেয়ালের চিৎকারে খান্ খান্ হয়ে যাচ্ছে। পরের দিন সকালে যথাসময়ে বালির স্তূপের দিকে 5.30-এ বালির স্তূপের দিকে আমাদের যাত্রা শুরু হয়। দশ মিনিটের মধ্যে আমি থেকে গেলাম আর সবচেয়ে উঁচু ঢিবি দেখে অবিশ্বাস্য দৃষ্টি নিয়ে আমি চোখ রগড়াতে লাগলাম। ছয় ঘণ্টা পর বিব্রত কর্মচারীবৃন্দ এবং আমি তখন প্রখর সূর্যের তাপের মধ্যে কোদাল ও ছুরি দিয়ে কঠোর পরিশ্রম করছিলাম। আমি ভয় পাচ্ছিলাম আমার সহযোগীরা আমার এই অবিরাম কাজের গতির জন্য আমাকে 'পাগল সাহেব' না ভাবতে শুরু করে।
>
> R.E.M. হুইলার এর *My Archaeological Mission to India and Pakistan,* 1976 থেকে নেওয়া।

11. অতীতের খণ্ডচিত্রকে মিলিয়ে নেওয়ার সমস্যা (PROBLEMS OF PIECING TOGETHER THE PAST)

আমরা দেখেছি, হরপ্পা লিপি এই প্রাচীন সভ্যতাকে অনুধাবন করতে সাহায্য করে না। বরং বস্তুগত নিদর্শনগুলো প্রত্নতত্ত্ববিদদের অধিকতর সুষ্ঠুভাবে হরপ্পার জীবনশৈলী পুনর্নির্মাণে সাহায্য করে। এই বস্তুগুলো বিভিন্ন প্রকারের পাত্র, যন্ত্রপাতি, অলংকারাদি, গৃহে ব্যবহৃত বস্তু সকল ইত্যাদি। জৈবিক বস্তু যেমন বস্ত্র, চর্ম, কাঠ, নলখাগড়া সাধারণত পচনশীল হয়, বিশেষ করে গ্রীষ্মমণ্ডলীয় অঞ্চলে যা টিকে থাকে তা হলো পাথর, পোড়া মৃৎপাত্র (টেরাকোটা) ধাতু ইত্যাদি।

এটি মনে রাখাও জরুরি যে, শুধুমাত্র ভেঙে যাওয়া বা অনুপযোগী বিষয় সামগ্রীই ফেলে দেওয়া হত। অন্যান্য বস্তু সম্ভবত পুনর্ব্যবহার উপযোগী করা হত। সুতরাং মূল্যবান হস্তশিল্প যা অক্ষত অবস্থায় উদ্ধার করা হয়েছে সেগুলো হয় অতীতে হারিয়ে গিয়েছিল নয়তো সঞ্চিত করে রাখা হলেও তা পুনরুদ্ধার করা হয়নি। অন্যভাবে বলা যায় এই আবিষ্কৃত বস্তুসকল আকস্মিক, প্রতীক স্বরূপ নয় বরং আকস্মিক।

11.1 আবিষ্কৃত বস্তুর শ্রেণিবিন্যাস :

হস্তশিল্প পুনরুদ্ধার প্রত্নতাত্ত্বিক উদ্যোগের প্রারম্ভ মাত্র। প্রত্নতাত্ত্বিকেরা অতঃপর তাদের আবিষ্কার সমূহের শ্রেণিবিভাগ করেন। শ্রেণিবিভাগের একটি সহজ নীতি হল বস্তুগত বিভাজন যেমন পাথর, কাদা, ধাতু, অস্থি, গজদন্ত ইত্যাদি। দ্বিতীয় এবং অধিকতর জটিল হল কার্যবিধি অনুযায়ী শ্রেণিবিভাগ : পুরাতত্ত্ববিদ্‌দের সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে হয়, যেমন- এক হস্তশিল্প একটি যন্ত্রাংশ না অলংকার, নাকি দুইই অথবা আচার-অনুষ্ঠানের জন্য ব্যবহৃত অন্য কিছু।

কোনো একটি হস্তশিল্পের কার্যকারিতা বোঝার জন্য অনেক সময় বর্তমানে ব্যবহৃত হয় এমন সকল বস্তুর সাথে তার সাদৃশ্য দেখেও করা হয় যেমন - পুঁতি, চূর্ণযন্ত্র, প্রস্তর ফলক এবং পাত্রাদি ইত্যাদি এর সুস্পষ্ট উদাহরণ। প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌গণ কোনো বস্তুর কার্যকারিতা বোঝার জন্য সেই বস্তুটির আবিষ্কারের স্থান ও অনুসন্ধান করে থাকেন। এটি কি কোনো গৃহে, নর্দমায়, সমাধিস্থানে অথবা চুল্লি বা ইটের ভাঁটায় পাওয়া গেছে?

কখনো প্রত্নতত্ত্ববিদরা অপ্রত্যক্ষ প্রমাণের সাহায্যও নিয়ে থাকেন। উদাহরণ হিসেবে বলা যায় যদিও হরপ্পার খননস্থলে তোলার সন্ধান পাওয়া গেছে, কিন্তু বস্তু সম্বন্ধে তথ্য জানার জন্য আমাদের ভাস্কর্যের চিত্রাঙ্কণ এর মতো অপ্রত্যক্ষ প্রমাণের উপর নির্ভর করতে হয়।

প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌দের উল্লেখনীয় বস্তুর পরিকাঠামোর বিকাশ সাধন করতে হত। আমরা লক্ষ করেছি যতক্ষণ না প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌গণ হরপ্পায় প্রাপ্ত সীলমোহরটির সূত্র অর্থাৎ যেখানে সেটি উপস্থাপিত ছিল, সেটি হৃদয়ঙ্গাম করতে পেরেছেন,

এর সাংস্কৃতিক পরম্পরা যেখানে এটি আবিষ্কৃত হয়েছে এবং মেসোপটেমিয়ার আবিষ্কার সমূহের সাথে এটি তুলনা করতে পেরেছেন ততক্ষণ এর অর্থ অনুধাবন করা সম্ভব হয়নি।

11.2 ব্যাখ্যার সমস্যাবলি :

প্রত্নতাত্ত্বিক ব্যাখ্যার সমস্যা সবচেয়ে বেশি প্রতীয়মান হয় ধর্মীয় আচার আচরণ পুনর্নির্মাণের ক্ষেত্রে। প্রথমদিকের প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌দের ধারণা ছিল, যে বস্তুগুলো অস্বাভাবিক ও অজানা তার ধর্মীয় তাৎপর্য আছে। এর মধ্যে অলংকার ও আভরণমণ্ডিত এবং মাথায় বিস্তারিত প্রসাধনসহ টেরাকোটার স্ত্রী মূর্তিগুলো রয়েছে। এদের মাতৃদেবী রূপে আখ্যায়িত করা হয়। দুষ্প্রাপ্য প্রস্তরনির্মিত মূর্তিকে প্রায় একই ভঙ্গিমায় পুরোহিত নৃপতির মতো সঙ্গাতিপূর্ণ করে, যেখানে হাত হাঁটুর উপর রাখা অবস্থায় উপবেশিত পুরুষ মূর্তিগুলোকেও একইভাবে শ্রেণিবিন্যাস করা হয়েছে। অন্যান্য উদাহরণে কাঠামোগুলোকে আনুষ্ঠানিক তাৎপর্য দেওয়া হয়েছে। এর মধ্যে রয়েছে কালিবঙ্গান এবং লোথালে পাওয়া বিশাল স্নানঘর ও অগ্নিবেদী।

সিলমোহর যেগুলোতে কিছু সংখ্যক ধর্মীয় আচরণের তাৎপর্য বর্ণনা করা হয়েছে, তা পরীক্ষা করে ধর্মীয় বিশ্বাস ও রীতিনীতি পুনর্গঠনের চেষ্টাও করা হয়েছে, অন্যগুলোতে উদ্ভিদের চিত্র অঙ্কিত ছিল, যা প্রকৃতি পূজার ইঙ্গিত করে। সিলমোহরের উপর অঙ্কিত কিছু পশু যেমন- একশৃঙ্গাবিশিষ্ট পশু যা প্রায়শই ইউনিকর্ণ (একশৃঙ্গা বিশিষ্ট অশ্ব) নামে পরিচিত ছিল, তা কাল্পনিক ও সংযুক্ত বলে মনে হয়। কিছু সিলমোহরে আসন করে যোগীর ভঙ্গিমায় উপবিষ্ট পশু দ্বারা পরিবেশিষ্টত প্রতিকৃতিতে আদি শিবের নমুনা হিসাবে ধরা যায়। যিনি হিন্দুধর্মের একজন প্রধান দেবতার প্রাচীন প্রতিকৃতি। এছাড়া শঙ্কু আকৃতি বিশিষ্ট প্রস্তর নির্মিত বস্তুকে ‘লিঙ্গা’ হিসেবে শ্রেণিবিন্যাস করা হয়। হরপ্পার ধর্মের অনেক পুনর্গঠন এই ধারণার ভিত্তিতে তৈরি হয় যে, প্রারম্ভিক এবং পরবর্তী ঐতিহ্য তথা প্রথার মধ্যে সম্পূর্ণ সাদৃশ্য রয়েছে। এর কারণ হল প্রায়শই প্রত্নতত্ত্ববিদগণ্‌ জানা হতে অজানার দিকে অর্থাৎ বর্তমান হতে অতীতে বিচরণ করেন। যদিও এটি পাথরের জাঁতাকল এবং হাঁড়িগুলোর (পাত্র) ক্ষেত্রে যুক্তিসঙ্গাত হয় কিছু ধর্মীয় প্রতীকের বিষয়ে তা বেশিমাত্রায় অনুমান ভিত্তিক হয়ে পড়ে।

এসো আমরা আদি শিবের নমুনা সর্বস্ব সিলমোহরগুলোর প্রতি দৃষ্টিপাত করি। প্রাচীনতম ধর্মগ্রন্থ, ঋগ্বেদ (অনুমানিক 1500-1000 BCE তে সংকলিত) রুদ্র নামে এক দেবতার উল্লেখ আছে, যেই নামটি পরবর্তীকালে পৌরাণিক ঐতিহ্যে শিবকে বোঝাতে (প্রথম সহস্রাব্দ CE; চতুর্থ অধ্যায়ে দেখো) ব্যবহৃত হয়েছে। কিন্তু ঋগ্বেদে রুদ্রকে শিবের মতো পশুপতি (পশুদের অধিপতি, বিশেষভাবে গবাদি পশুদের) বা যোগী হিসেবে দেখানো হয়নি। অন্যভাবে বলা যায়, ঋগ্বেদের রুদ্রের সাথে এই বর্ণনার মিল নেই। তাহলে কিছু কিছু পণ্ডিতদের মতানুসারে সম্ভবত ইনি কি ওঝা?

চিত্র 1.26
এটা কি? একটি মাতৃদেবীর মূর্তি?

চিত্র 1.27
একটি আদি শিবের সিলমোহর

লিঙ্গা একটি মসৃণ পাথর যা শিবের প্রতীক হিসেবে পূজা করা হয়।

ওঝা হল এমন পুরুষ বা মহিলা যারা দাবি করত তাদের মোহিনীবিদ্যা এবং নিরাময় করার ক্ষমতা আছে, এর সাথে অন্য জগতের সঙ্গে সংযোগ সাধন করতে পারতো বলেও দাবি করে।

চিত্র 1.28
খুটি না লিঙ্গা ?

এই প্রস্তরগুলো সম্পর্কে একজন প্রাচীনতম খননকারী ম্যাকে বলেছেন :
বিভিন্ন আকারের নাপিস, লাজুলি, জেসপার, মূল্যবান পাথর ও অন্যান্য পাথর, যা খুব সুন্দরভাবে কেটে মসৃণ করা হয় এবং যার উচ্চতা দুই ইঞ্চিরও কম ছিল, তা লিঙ্গা নামে পরিচিত ছিল ... অন্যদিকে এটাও সম্ভব যে এগুলো হয়তো কোনো বোর্ড খেলায় ব্যবহৃত হত।
আর্নেস্ট ম্যাকের, Early Indus civilization, 1948 থেকে নেওয়া।

➲ আলোচনা করো...

পুরাতাত্ত্বিক নির্দশন হতে হরপ্পা অর্থনীতির কোনো দিকগুলোর পুনর্নির্মিত সম্ভব হয়েছে?

এতগুলো দশকের প্রত্নতাত্ত্বিক কার্যকলাপের ফলে কী অর্জিত হয়েছে? হরপ্পার অর্থনীতি সম্পর্কে আমাদের একটি পরিচ্ছন্ন ধারণা হয়েছে। আমরা সামাজিক বিভিন্নতার জট ছাড়াতে পেরেছি। এই সভ্যতার কার্যপ্রণালী সম্পর্কেও আমাদের যথেষ্ট ধারণা হয়েছে। আমরা সত্যিই জানি না যে লিপিগুলোর পাঠোদ্ধার হলে আমরা আরও কত কিছু জানতে পারতাম। যদি একটি দ্বিভাষী লিপি পাওয়া যেত তবে হরপ্পাবাসীরা কোন্ ভাষায় কথা বলত সেই প্রশ্নে হয়তো বিরাম টানা যেতো।

বেশ কয়েকটি পুনর্গঠন বর্তমানেও অনুমান নির্ভর রয়ে গেছে। বৃক্ষ, স্নানাগারটি কি একটি আনুষ্ঠানিক কাঠামো ছিল? সাক্ষরতার বিস্তৃতি কতখানি ছিল? কেন হরপ্পা সমাধিক্ষেত্রে সামাজিক বৈষম্য খুব সামান্য পরিলক্ষিত হয়? এছাড়াও লিঙ্গা বৈষম্যগত প্রশ্নগুলোরও উত্তর অজানা থেকে গেছে — মহিলারা কী পাত্রাদি নির্মাণ করত না শুধুমাত্র রং করতো (বর্তমানের মতো)? অন্য কারিগরদের কী কাজ ছিল? টেরাকোটার স্ত্রী মূর্তিগুলো কী কাজে ব্যবহৃত হত? হরপ্পা সভ্যতার প্রেক্ষিতে খুব কম পণ্ডিতই লিঙ্গা বৈষম্য সম্পর্কিত বিষয়গুলো অনুসন্ধান করেছেন এবং এটি ভবিষ্যতের অনুসন্ধানের জন্য সম্পূর্ণ নূতন একটি ক্ষেত্র।

চিত্র 1.29
দুচাকার একটি টেরাকোটা গাড়ি।

সময়পঞ্জী 1
ভারতীয় প্রারম্ভিক প্রত্নতত্ত্বের মুখ্য সময়াবলি

20 লক্ষ বর্ষ (বর্তমানের পূর্বে)	প্রাচীন প্রস্তর যুগ
80,000	মধ্য প্রাচীন প্রস্তর যুগ
35,000	উচ্চ প্রাচীন প্রস্তর যুগ
12,000	মধ্য প্রস্তর যুগ
10,000	নব্য প্রস্তর যুগ (প্রাচীন কৃষিজীবি ও পশুপালকগণ)
6,000	তাম্র প্রস্তর যুগ (সর্বপ্রথম তামার ব্যবহার)
2600 BCE	হরপ্পা সভ্যতা
1000 BCE	প্রারম্ভিক লৌহকাল, প্রস্তর নির্মিত সমাধি
600 BCE-400 BCE	প্রারম্ভিক ঐতিহাসিক কাল

(বি.দ্র. - প্রদত্ত সময়পঞ্জী আনুমানিক। এছাড়াও সমগ্র উপমহাদেশে বিকাশের হার বিভিন্ন অঞ্চলে সমান নয়। যে তারিখ উল্লেখ করা হয়েছে সেগুলো প্রতিটি পর্যায়ের প্রাচীনতম নিদর্শন।)

সময়পঞ্জী 2
হরপ্পা পুরাকীর্তির মুখ্য প্রমাণাদি

উনিশ শতক	
1875	হরপ্পা সিলমোহর সম্পর্কে কানিংহামের বিবরণ।
বিংশ শতক	
1921	এম.এস. বত্স হরপ্পার খনন শুরু করেন।
1925	মহেঞ্জোদারোর খনন কাজ শুরু।
1946	আর.ই.এম. হুইলার হরপ্পার খনন শুরু করেন।
1955	এস. আর. রাও লোথালে খননকার্য শুরু করেন।
1960	বি বি লাল এবং বি কে থাপার কালিবঙ্গানে খনন শুরু করেন
1974	এম. আর মুঘল বাহাওয়ালপুরে অনুসন্ধান কার্য শুরু করেন
1980	একদল জার্মান ও ইতালীয় পুরাতত্ত্ববিদ মহেঞ্জোদারোতে ভূমি খনন শুরু করেন।
1986	আমেরিকান দল হরপ্পায় খনন শুরু করেন।
1990	আর. এস. বিস্ত ধোলাবিরায় খনন শুরু করেন।

Fig. 1.30
A Harappan burial

উত্তর দাও 100-150 টি শব্দের মধ্যে

1. হরপ্পার নগর সমূহে বসবাসকারী জনসাধারণের জন্য সহজলভ্য খাদ্যের তালিকা প্রস্তুত করো। সহজলভ্য খাদ্যদ্রব্য সরবরাহকারী গোষ্ঠীদের চিহ্নিত করো।
2. পুরাতত্ত্ববিদ্‌গণ হরপ্পার সমাজের আর্থ-সামাজিক ব্যবধান কীরূপে অনুসন্ধান করেছে? তারা কী ধরনের বৈষম্য লক্ষ করেছেন?
3. তুমি কি মনে করো যে, হরপ্পা শহরগুলোর নিকাশী ব্যবস্থা নগর পরিকল্পনার ইঙ্গিত দেয়? তোমার উত্তরের স্বপক্ষে যুক্তি দাও।
4. হরপ্পা সভ্যতায় পুঁতি তৈরি করতে যে সকল উপাদান ব্যবহৃত হত তার তালিকা প্রস্তুত কর। কোনো এক ধরনের পুঁতি তৈরি করার প্রক্রিয়া বর্ণনা কর।
5. চিত্র 1.30 দিকে তাকাও এবং কী দেখলে তা বর্ণনা কর। দেহটি কীরূপে রাখা হয়েছে? মৃতদেহের সম্মুখে রাখা বস্তুগুলো কী কী? মৃতের শরীরে কোনো হস্তশিল্পজাত জিনিস আছে কি? এগুলো কি কঙ্কালের লিঙ্গাকে নির্দেশ করে?

নিম্নে উল্লেখিত বিষয়ের উপর টীকা লেখো (500টি শব্দের মধ্যে) :

6. মহেঞ্জোদারোর স্বাতন্ত্র্যসূচক বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করো।
7. হস্তশিল্প উৎপাদনের জন্য হরপ্পা সভ্যতায় প্রয়োজনীয় উপাদানের তালিকা প্রস্তুত কর এবং সেই উপাদান কিরূপে জোগাড় করা হত আলোচনা কর।
8. পুরাতত্ত্ববিদ্‌গণ অতীতের ইতিহাস কীরূপে পুর্নগঠন করেন। আলোচনা কর।
9. হরপ্পা সমাজে শাসকদের সম্ভাব্য কার্যকলাপ বর্ণনা করো।

মানচিত্রের কাজ

10. মানচিত্র 1-এ যে সকল স্থলে কৃষিকাজের প্রমাণ পাওয়া গেছে সেই স্থানগুলোতে পেন্সিলের সাহায্যে বৃত্তাঙ্কণ কর। যেখানে কাঁচামাল উৎপন্ন হওয়ার চিহ্ন পাওয়া গেছে সেখানে 'X' এবং যেসকল স্থলে হস্তশিল্প উৎপাদনের প্রমাণ পাওয়া গেছে যেই স্থানে 'R' চিহ্ন বসাও।

প্রকল্প (যে-কোনো একটি)

11. তোমার শহরে কোনো যাদুঘর আছে কিনা খুঁজে দেখো এবং সেখানকার দশটি বস্তুর উপর প্রতিবেদন লেখো এরা কত প্রাচীন, কোথায় এদের পাওয়া গেছে এবং কেন এদের প্রদর্শন করা হয় সে সম্বন্ধে তোমার মত কী?
12. দশটি পাথর, ধাতু ও কাদায় তৈরি বস্তুর উদাহরণ সংগ্রহ কর, যা বর্তমানকালে ও নির্মিতও ব্যবহৃত হয়। এই অধ্যায়ে দেওয়া হরপ্পা সভ্যতার চিনের সঙ্গে এইসব বস্তুর তুলনা করো এবং এদের মধ্যে যা সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্য তুমি লক্ষ করেছ, তা আলোচনা করো।

তুমি যদি আরও জানতে চাও তাহলে পড়ো :

Raymond and Bridget Allchin. 1997. *Origins of a Civilization.* Viking, New Delhi.

G.L. Possehl. 2003. *The Indus Civilization.* Vistaar, New Delhi.

Shereen Ratnagar. 2001. *Understanding Harappa.* Tulika, New Delhi.

আরও তথ্যের জন্য তুমি দেখতে পার :
http://www.harappa.com/har/harres0.html

বিষয়বস্তু
দুই

রাজা, কৃষক এবং শহর

প্রারম্ভিক রাজ্য এবং অর্থনীতি
(600 খ্রিস্ট পূর্বাব্দ থেকে 600 খ্রিস্টাব্দ)

হরপ্পা সভ্যতার অবসান ঘটিয়ে 1,500 বছরের দীর্ঘ সময় ধরে উপমহাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে এই সভ্যতা বিভিন্ন উন্নয়ন ঘটিয়েছিল। সেই কালটিও ছিল, সেই সময়কালে, যে সময় সিন্ধু এবং এর উপনদীগুলোর পারে বসবাসকারী লোকদের দ্বারা ঋক্‌বেদ রচিত হয়েছিল। সেই সময় উত্তর ভারত, দাক্ষিণাত্য মালভূমি এবং কর্ণাটকের কিছু অংশ সহ উপমহাদেশের অনেক জায়গায় কৃষিকাজের বন্দোবস্তগুলো চালু ছিল। এছাড়াও দাক্ষিণাত্য এবং আরও দক্ষিণে যাযাবর জনগোষ্ঠীর বসবাসের প্রমাণ পাওয়া যায়। খ্রিস্টপূর্ব প্রথম সহস্রাব্দ থেকে মেগালিথস নামে পরিচিত বিস্তৃত পাথর কাঠামো তৈরি এবং মৃতদেহের সৎকার করার নতুন পদ্ধতিগুলো মধ্য ও দক্ষিণ ভারতে প্রচলিত ছিল। অনেক ক্ষেত্রে মৃতদেহকে সমৃদ্ধ রেঞ্জের লোহার সরঞ্জাম ও অস্ত্র দিয়ে সমাহিত করা হত।

চিত্র 2.1
সাঁচীর একটি শিলালিপি (মধ্যপ্রদেশ) খ্রিস্টপূর্ব দ্বিতীয় শতাব্দী।

খ্রিস্টপূর্ব ষষ্ঠ শতাব্দী থেকে অন্যান্য ধারার প্রবণতা যে ছিল, তার প্রমাণ পাওয়া যায়। সম্ভবত সেই সময়ের সবচেয়ে বড়ো ঘটনা ছিল প্রাচীন রাজ্য, সাম্রাজ্য এবং রাজধানীগুলোর উত্থান। এই রাজনৈতিক প্রক্রিয়াগুলোর অন্তর্নিহিত পরিবর্তনগুলো ছিল, কৃষি উৎপাদনকে কীভাবে সংগঠিত করা হয়েছিল তা প্রমাণ করা। একই সাথে প্রায় সমস্ত উপমহাদেশ জুড়ে নতুন শহরগুলো তৈরি হয়েছিল।

ইতিহাসবিদরা বিভিন্ন উৎস থেকে, যেমন শিলালিপি, সাহিত্য, মুদ্রা এবং দৃশ্যমান (visual) উপাদানগুলোর মাধ্যমে এই উন্নয়নগুলো বোঝার চেষ্টা করেন। আমাদের কাছে এটা একটা জটিল প্রক্রিয়া। তোমরা এটাও লক্ষ করবে যে, এই উৎসগুলো কিন্তু পুরো কাহিনিটি বলে না।

1. প্রিন্সেপ এবং পিয়াদস্সি (PRINSEP AND PIYADASSI)

1830-এর দশকে ভারতের লিপিগুলোর উন্নতির ক্ষেত্রে কিছু স্মরণীয় ঘটনা ঘটেছিল। এটি তখনই হয়েছিল যখন ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি সংস্থার পদাধিকারিক জেমস প্রিন্সেপ প্রথম দিকের শিলালিপি এবং মুদ্রাতে ব্যবহৃত ব্রাহ্মী এবং খরোষ্ঠী লিপি দুটির পাঠোদ্ধার করেন। তিনি দেখেন যে, অধিকাংশ লিপিতেই রাজাকে পিয়াদস্সি বলে অভিহিত করা হয়েছে। পিয়দস্সি শব্দের

এপিগ্রাফি হল শিলালিপি অধ্যয়ন।

অর্থ হল ‘দেখতে সুন্দর’। কিছু শিলালিপি ছিল, যেগুলোতে রাজাকে অশোক নামে উল্লেখ করা হয়েছে। বৌদ্ধ সাহিত্যগুলো থেকে জানা যায়, অশোক ছিলেন একজন বিখ্যাত শাসক।

ইউরোপীয় এবং ভারতীয় পণ্ডিতদের বিভিন্ন ভাষায় রচিত শিলালিপি এবং সাহিত্যগুলো পাঠোদ্ধার করে এই উপমহাদেশে বিভিন্ন শাসক রাজবংশগুলোর বংশ তালিকার পুনর্গঠন করে, প্রারম্ভিক ভারতের রাজনৈতিক ইতিহাস রচনার এক নতুন দিকদর্শন দিয়ে ছিলেন। ফলস্বরূপ বিংশ শতাব্দীর প্রথম দশকের শুরুতে প্রাচীন ভারতের রাজনৈতিক ইতিহাসের এক বিস্তৃত রূপরেখা দেওয়া সম্ভব হয়েছিল।

পরবর্তী সময়ে, পণ্ডিতরা তাঁদের রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গির প্রেক্ষাপটে রাজনৈতিক ইতিহাস পরিবর্তন করতে শুরু করেছিলেন। তাঁরা রাজনৈতিক পরিবর্তনের মধ্যে কোনো অর্থনৈতিক এবং সামাজিক উন্নতির কোনো সম্পর্ক ছিল কিনা তা অনুসন্ধান করতে লাগল। শীঘ্রই এটা অনুধাবন করা হয়েছিল যে এই সংযোগগুলো সর্বদা সহজ বা সরাসরি ছিল না।

2. প্রাচীন রাজ্যগুলো (The Earliest States)

2.1 ষোড়শ মহাজনপদ (The sixteen *mahajanapadas*)

খ্রিস্টপূর্ব ষষ্ঠ শতাব্দীকে ভারতের প্রাচীন ইতিহাসের সন্ধিক্ষণ বলে বিবেচনা করা হয়। এটি প্রাথমিক যুগের শহরগুলোর সাথে সম্পর্কিত, লোহার ক্রমবর্ধমান ব্যবহার, মুদ্রার বিকাশ ইত্যাদির সাথে সম্পর্কযুক্ত একটি যুগ। এই সময়ে বৌদ্ধ ও জৈন ধর্মসহ বিভিন্ন চিন্তা পদ্ধতির বিকাশ ঘটেছিল। প্রাচীন বৌদ্ধ ও সাহিত্যগুলোতে (চতুর্থ অধ্যায়ে দেখবে) এবং অন্যান্য সাহিত্যগুলো থেকে জানা যায়। এই সময় যে ষোলোটি রাজ্য ছিল, এগুলো একসাথে ষোড়শ মহাজনপদ নামে পরিচিত ছিল। যদিও ষোড়শ মহাজন পদের নামের তালিকা অনেক বড়ো তথাপি এর মধ্যে কয়েকটি হল বজ্জি (বৃজি), মগধ, কোশালা, কুরু, পাঞ্চাল, গান্ধার এবং অবন্তী। এটা স্পষ্ট যে, এই রাজ্যগুলো ষোড়শ মহাজন পদের মধ্যে খুবই গুরুত্বপূর্ণ ছিল।

যখন অধিকাংশ মহাজনপদগুলো রাজাদের দ্বারা শাসিত হত, তখন কিছু মহাজনপদ ছিল যেগুলো গণ বা সংঘ নামে পরিচিত শাসকগোষ্ঠীর দ্বারা পরিচালিত হত (p. 30), যেখানে বহুলোকের মধ্যে ক্ষমতা ভাগ করা হয়েছিল। এগুলোকে প্রায়শই একসাথে ‘রাজস্’ বলা হত। মহাবীর এবং বৌদ্ধ উভয়ই (চতুর্থ অধ্যায়) এই জাতীয় গণের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। এমন কিছু উদাহরণ, যেমন বজ্জি (বৃজি) সংঘের ক্ষেত্রে রাজস্‌রা সমষ্টিগতভাবে জমির মতো সম্পদ নিয়ন্ত্রণ করত। যদিও তথ্যাদির অভাবে তাদের ইতিহাসগুলো পুনর্গঠন করা কষ্টসাধ্য। তথাপি এই রাজ্যগুলোর অনেকগুলোই প্রায় এক হাজার বৎসর টিকেছিল।

প্রতিটি মহাজনপদের একটি রাজধানী শহর ছিল। যেগুলো প্রায়শই দুর্গে

(শিলালিপি) Inscriptions

শিলালিপি হল পাথর, ধাতু এবং মাটির পাত্রাদির উপরে খোদাই করা রচনা। এগুলোর মধ্যে রাজা বা শাসকদের গুণাগুণ, কার্যকলাপ এবং রাজাদের শাসনের স্বরূপ অন্তর্ভুক্ত করা হয় অথবা ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানে পুরুষ এবং মহিলাদের দান সামগ্রী উল্লেখ করা থাকে। শিলালিপিগুলো বস্তুত স্থায়ী প্রমাণপত্র। অনেক শিলালিপিতে সন, তারিখ উল্লেখ করা থাকে। আবার কতগুলোতে প্রাচীন লিপি বিজ্ঞানের তারিখ অথবা লিখন শৈলীর যথাযথ পরিমাণ উল্লেখ থাকে। যেমন, উদাহরণস্বরূপ 250 খ্রিস্ট পূর্বাব্দে “a” অক্ষরটি লেখা হত 𑀅 এইভাবে, আর 500 খ্রিস্টাব্দে “a” অক্ষরটি লেখা হত 𑀅 এইভাবে।

প্রাচীন শিলালিপিগুলো প্রাকৃত ভাষায় লেখা ছিল। সাধারণ মানুষেরা যে ভাষায় কথা বলত তাকে প্রাকৃত ভাষা বলা হত। প্রাকৃত সাহিত্য এবং শিলালিপিতে অজাতশত্রু এবং অশোকের মতো শাসকদের কথা জানা যায়। এই অধ্যায়ে প্রাকৃত শব্দগুলোর বানান করা হয়েছে। পালি, তামিল এবং সংস্কৃত ভাষাগুলোকেও তুমি খুঁজে পাবে, যেগুলো শিলালিপি এবং সাহিত্য গ্রন্থগুলো লেখাতে ব্যবহার করা হয়েছে। সম্ভবত জনগণ অন্যান্য ভাষাতেও কথা বলতেন, যেগুলো লেখার কাজে ব্যবহার করা হয়নি।

জনপদ অর্থ হল ভূমি, যেখানে জনা (জনগণ, জাতি বা উপজাতি)রা এর পাদদেশে বসতো বা বসতি স্থাপন করত। এই শব্দটি প্রাকৃত এবং সংস্কৃত উভয়ক্ষেত্রেই ব্যবহার হয়েছে।

➲ সর্বাধিক ঘন ক্লাস্টারযুক্ত এমন রাজ্য ও শহর কোন্‌গুলো ছিল?

ঘেরা ছিল। এই দুর্গ শহরগুলোকে টিকিয়ে রাখার জন্য প্রয়োজনীয় সেনা এবং আমলাদের প্রয়োজনীয় সম্পদ সরবরাহ করা হত। খ্রিস্টপূর্ব ষষ্ঠ শতাব্দী থেকে ব্রাহ্মণরা সংস্কৃত সাহিত্য রচনা শুরু করেন, যা ধর্ম সূত্র নামে পরিচিত। এগুলো ছিল শাসকদের জন্য রচিত রীতিনীতি (একইভাবে অন্যান্য সামাজিক গোষ্ঠীর জন্যও) যা আদর্শগতভাবে ক্ষত্রিয় হিসাবে প্রত্যাশিত ছিল। শাসকদেরকে কর আদায় করার পরামর্শ দেওয়া হয়েছিল এবং চাষি ব্যবসায়ী ও কারিগরদের শ্রদ্ধা জানাতে বলা হয়েছে। যাযাবর এবং বন মানুষদের কাছ থেকেও কী সম্পদ সংগ্রহ করা হয়েছিল? আমরা তা সত্যিই জানি না। আমরা যা জানি তা হল প্রতিবেশী রাষ্ট্রগুলোতে অভিজানগুলো সম্পদ অর্জনের বৈধ উপায় হিসাবে স্বীকৃত ছিল। ধীরে ধীরে কিছু রাজ্য স্থায়ী সেনাবাহিনী নিয়োগ করে এবং নিয়মিত আমলা পোষণ করতে থাকে। বাকি রাজ্যগুলো মিলিশিয়া নামে সাহায্যকারী সৈন্য নিয়োগ করত। এরা কৃষকদের উপর বেশি নির্ভর করত না।

অলিগার্চি শব্দের অর্থ হল সরকার গঠন, যেখানে ক্ষমতা বণ্টন করা হয়েছে একদল মানুষের কাছে। রোমান প্রজাতন্ত্র, যেটি সম্পর্কে গত বছর পড়েছ। এটি অলিগার্চি শব্দের পরিবর্তে ব্যবহার করা হয়েছে।

2.2 ষোড়শ মহাজনপদের মধ্যে প্রথম মগধ :

খ্রিস্টপূর্ব ষষ্ঠ এবং চতুর্থ শতাব্দীর মধ্যে ষোড়শ মহাজনপদের রাজ্যগুলোর মধ্যে মগধ (বর্তমান বিহার) রাজ্য সবচেয়ে বেশ শক্তিশালী ছিল। আধুনিক ঐতিহাসিকরা বিভিন্নভাবে মগধের উন্নতির ব্যাখ্যা দিয়েছেন। মগধ ছিল এমন একটি রাজ্য যেখানে বিশেষত কৃষিক্ষেত্রগুলো উৎপাদনশীল ছিল। এছাড়াও ছিল সুলভ লৌহ খনিগুলো (বর্তমানে ঝাড়খণ্ড) যেগুলো যন্ত্রপাতি ও অস্ত্রের জন্য লৌহ সরঞ্জাম সরবরাহ করেছিল। এই রাজ্যের বনাঞ্চলে সেনাবাহিনীর গুরুত্বপূর্ণ হাতিয়ার হাতিগুলো পাওয়া গিয়েছিল। এছাড়াও গঙ্গা এবং এর উপনদীগুলো সস্তা এবং সুবিধাজনক যোগাযোগের মাধ্যম হিসাবে ব্যবহার করা হত। তবে, প্রথম দিকের বৌদ্ধ এবং জৈন লেখকরা, যাঁরা মগধের ক্ষমতার শীর্ষে আরোহণের কথা সম্পর্কে লিখেছেন, তাঁরা উচ্চাভিলাষী সম্রাটদের ব্যক্তিগত নীতির কথা বলেছেন। এই নির্মম উচ্চাভিলাষী রাজাদের মধ্যে ছিলেন বিম্বিসার, অজাতশত্রু, মহাপদ্মনন্দ এবং তাঁদের মন্ত্রীবর্গ, যারা তাদের নীতি বাস্তবায়নে সহায়তা করেছিল।

প্রথমদিকে রাজগাহ (প্রকৃত নাম বর্তমানে রাজগির, বিহার) ছিল মগধের রাজধানী, মজার বিষয় হল রাজগাহ নামের প্রাচীন অর্থ হল 'রাজার বাড়ি'। রাজগাহ পাহাড়ের মাঝে অবস্থিত একটি দুর্গবসতি ছিল। পরে, খ্রিস্টপূর্ব চতুর্থ শতাব্দীতে রাজগাহ থেকে রাজধানী পাটলিপুত্রে স্থানান্তরিত হয়েছিল, যার বর্তমান নাম পাটনা। গঙ্গা প্রধান যোগাযোগের মাধ্যম ছিল।

➲ **আলোচনা করো...**

মগধের উত্থান সম্পর্কে প্রাচীন লেখক এবং আধুনিক ঐতিহাসিকদের দেওয়া বিভিন্ন ব্যাখ্যাগুলো কী কী?

চিত্র 2.2
রাজগিরির দুর্গ প্রাচীর।

➲ কেন এই দুর্গ প্রাচীর তৈরি হয়েছিল?

ভাষা এবং লিপি

অশোকের অধিকাংশ শিলালিপি প্রাকৃত ভাষায় লিখিত। যদিও এই উপমহাদেশের উত্তর-পশ্চিমে যারা ছিল তারা আরামাইক এবং গ্রিক ছিল। অধিকাংশ প্রাকৃত শিলালিপিগুলো ব্রাহ্মীলিপিতে লেখা। উত্তর-পশ্চিমের কিছু লিপি খরোষ্ঠী লিপিতে লেখা ছিল। আফগানিস্তানের শিলালিপিতে আরামাইক এবং গ্রিক লিপি ব্যবহার করা হয়েছে।

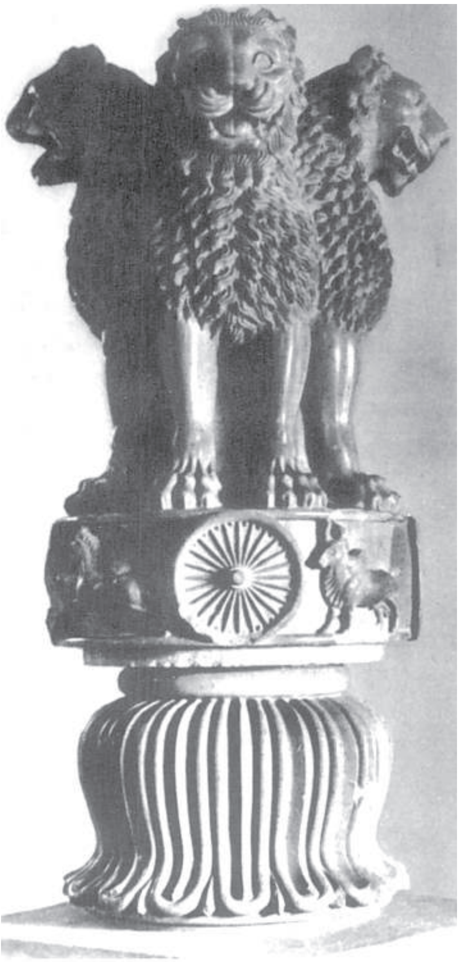

চিত্র 2.3
সিংহ রাজা

➲ কেন বর্তমানে সিংহরাজাকে গুরুত্বপূর্ণ মনে করা হয়?

3. একটি প্রাচীন সাম্রাজ্য (An Early Empire)

মগধের উত্থানের সাথে সাথে মৌর্য সাম্রাজ্যেরও চরম বিকাশ ঘটে। মৌর্য সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যের (321 খ্রিস্টপূর্বাব্দ) আমলে সাম্রাজ্য সুদূর উত্তর পশ্চিম আফগানিস্তান থেকে বালুচিস্তান পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। তাঁর নাতি অশোক যিনি প্রাচীন ভারতের সর্বশ্রেষ্ঠ শাসক ছিলেন, তিনি কলিঙ্গ (বর্তমানে উড়িষ্যা উপকূলবর্তী) বিজয় করেন।

3.1 মৌর্যদের সম্পর্কে সন্ধান করা (Finding out about the Mauryas)

মৌর্য সাম্রাজ্যের ইতিহাস লিখতে গিয়ে ঐতিহাসিকরা বিভিন্ন ধরনের উৎসের ব্যবহার করেছেন। এর মধ্যে রয়েছে প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শনগুলো, বিশেষত ভাস্কর্য। সমসাময়িক বিবরণগুলোও মূল্যবান ছিল। যেমন মেগাস্থিনিসের (গ্রিক রাষ্ট্রদূত যিনি চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যের রাজসভায় এসেছিলেন) বিবরণ, যা বিভিন্ন খণ্ডে লেখা আছে। অন্য একটি উৎস গ্রন্থ হল 'অর্থশাস্ত্র'। এটি সম্ভবত কৌটিল্য বা চাণক্য রচনা করেন, যিনি ঐতিহ্যগতভাবে চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যের বিশ্বস্থ মন্ত্রী ছিলেন। এছাড়া মৌর্যরাও পরবর্তী বৌদ্ধ, জৈন এবং পৌরাণিক সাহিত্যে এবং একইভাবে সংস্কৃত সাহিত্যে তা উল্লেখ করেন। যদিও এগুলো গুরুত্বপূর্ণ, তথাপি পাথর এবং স্তম্ভগাত্রে পাওয়া অশোকের (272/268-231 খ্রিস্ট পূর্বাব্দে) শিলালিপিগুলোকে মূল্যবান শিলালিপি হিসাবে গণ্য করা হয়।

অশোকই ছিলেন প্রথম শাসক যিনি তাঁর বাণীগুলো তাঁর প্রজা এবং সরকারি কর্মচারীদের জন্য প্রাকৃতিক পাথর এবং মসৃণ পাথরের স্তম্বে খোদাই করেছিলেন। অশোক, তাঁর শিলালিপিতে 'ধম্ম' বলতে কী বুঝিয়েছেন তার সুন্দর ব্যাখ্যা দিয়েছেন। এতে যুক্ত হয়েছিল, বড়োদেরকে শ্রদ্ধা করা, ব্রাহ্মণ এবং সন্ন্যাসীদেরকে শ্রদ্ধা করা, দাস এবং চাকরদের প্রতি দয়া দেখানো, অন্য ধর্ম এবং ঐতিহ্যকে শ্রদ্ধা করা।

3.2 সাম্রাজ্যের শাসনব্যবস্থা (Administering the empire)

মৌর্য সাম্রাজ্যে পাঁচটি প্রধান রাজনৈতিক কেন্দ্র ছিল। যথা, রাজধানী পাটলিপুত্র এবং তক্ষশীলার প্রাদেশিক কেন্দ্র, উজ্জয়িনী, তোশালি এবং সুবর্ণগিরি। এগুলো সবই অশোকের শিলালিপিতে উল্লেখ করা হয়েছে। আমরা যদি এই শিলালিপিগুলোর বিষয়বস্তু পরীক্ষা করি তাহলে আমরা কার্যত একই বার্তা সর্বত্র খোদাই করা দেখতে পাই। বর্তমানে পাকিস্তানের উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ এবং ভারতের অন্ধপ্রদেশ, উড়িষ্যা এবং উত্তরাখণ্ডে এগুলো উৎকীর্ণ হয়েছে। এই সুবিশাল সাম্রাজ্যের প্রশাসনিক পদ্ধতি কী একই রকম ছিল? ঐতিহাসিকরা ক্রমবর্ধমানভাবে বুঝতে পেরেছেন যে এটি অসম্ভব ছিল।

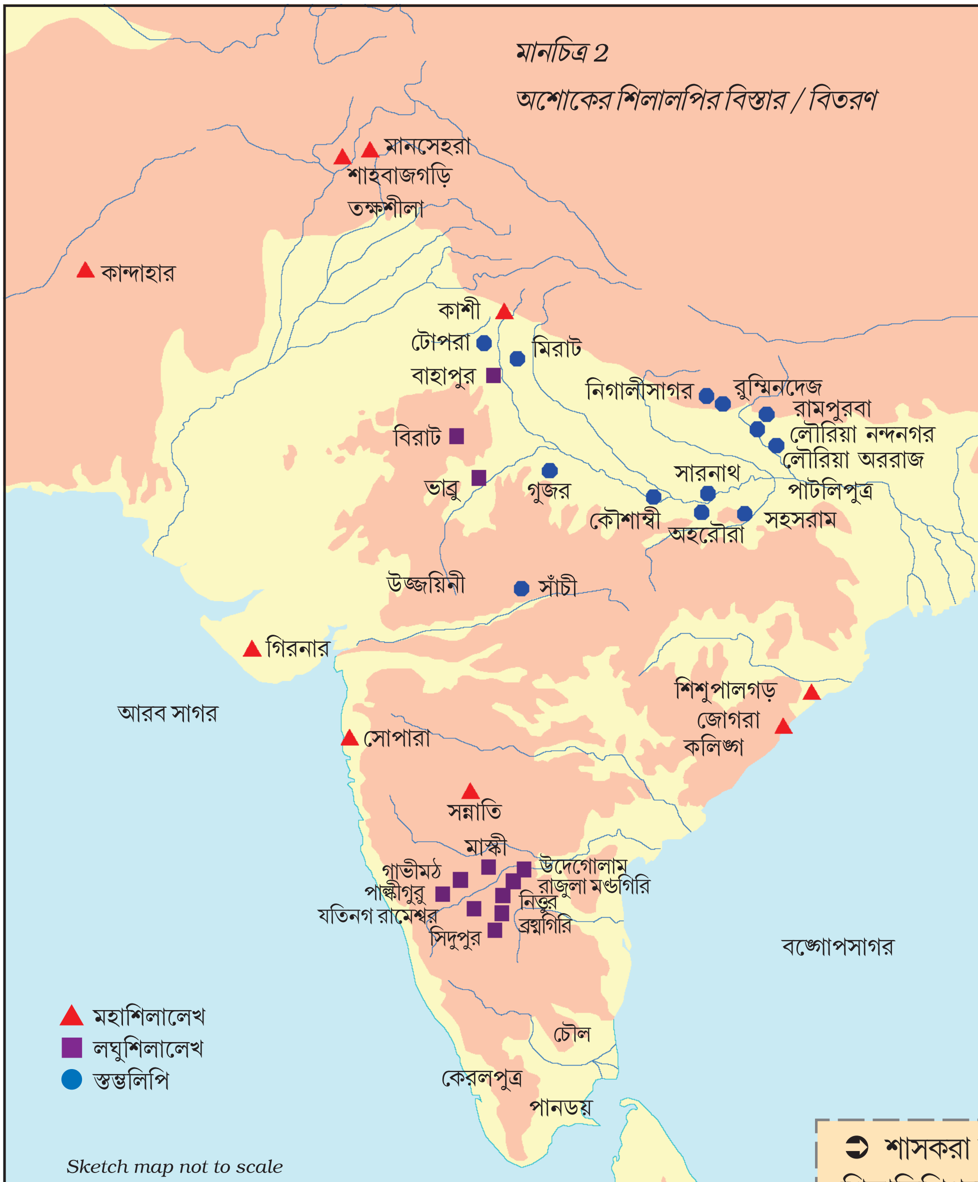

মানচিত্র 2

অশোকের শিলালপির বিস্তার / বিতরণ

➲ শাসকরা কি এমন অঞ্চলগুলোতেও শিলালিপিগুলো খোদাই করেছিল, যেগুলো তাদের সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল না?

সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত অঞ্চলগুলো ছিল আরও বিচিত্র। আফগানিস্তানের পাহাড়ি ভূখণ্ড এবং উড়িষ্যার সমুদ্র উপকূলের মধ্যে বৈসাদৃশ্য কল্পনা করো।

রাজধানী এবং প্রাদেশিক কেন্দ্রগুলোতে প্রশাসনিক নিয়ন্ত্রণ সবচেয়ে শক্তিশালী ছিল বলে মনে হয়। এই সব কেন্দ্রগুলোকে সযত্নে বেছে নেওয়া হয়েছিল। তক্ষশীলা এবং উজ্জয়িনী উভয়ই দীর্ঘ দূরত্বের বাণিজ্যিক পথে অবস্থিত ছিল। তখন সুবর্ণগিরি (সাহিত্যিক ভাষার সোনালি পর্বত) সম্ভবত কর্ণাটকের স্বর্ণখনির টেপিংয়ের জন্য গুরুত্বপূর্ণ ছিল।

সাম্রাজ্যের অস্তিত্বের জন্য স্থল এবং জল উভয় যোগাযোগ ব্যবস্থা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ছিল। কেন্দ্র থেকে প্রদেশগুলো পরিভ্রমণ করতে কয়েক মাস না

উৎস 1

রাজার কর্মচারীরা কী করেছিলেন

মেগাস্থিনিসের বিবরণ থেকে একটি অংশ এখানে দেওয়া হয়েছে :

রাজ্যের বিখ্যাত আধিকারিকরা ... মিশরের মতো নদীগুলোকে তদারকি করুন এবং জমি পরিমাপ করুন। প্রধান খালগুলো থেকে তাদের শাখাগুলোতে জল বেরিয়ে আসার প্রণালীগুলো পর্যবেক্ষণ করুন, কারণ প্রত্যেককে যাতে সমান জল সরবরাহ করা যায়। একই ব্যক্তিদের হাতে শিকারিদের দায়িত্বও ছিল এবং অঞ্চল অনুসারে তাদের পুরস্কার বা শাস্তি দেওয়ার ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে। তারা কাঠুরিয়া, ছুতার, কামার এবং খনি খননকারীদের কাছ থেকে কর আদায় করত এবং জমির সাথে সংযুক্ত পেশাগুলো তত্ত্বাবধান করত।

➲ এইসব পেশাধারী দলগুলোকে তত্ত্বাবধান করার জন্য কেন আধিকারিকদের নিয়োগ করা হত?

➲ আলোচনা করো...

মেগাস্থিনিস এবং অর্থশাস্ত্রের উদ্ধৃতাংশগুলো পড়ো (উৎস) এবং মৌর্য প্রশাসনের ইতিহাস পুনর্গঠনে এই পাঠ্যগুলো কতটা কার্যকর বলে তুমি মনে কর?

হলেও কয়েক সপ্তাহ সময় লেগে যেত। এর অর্থ হল, যারা অভিযানে বের হতেন তাদের জন্য খাওয়া দাওয়া ও বিভিন্ন বিধি ব্যবস্থা গ্রহণের পাশাপাশি সুরক্ষার ব্যবস্থাও করা হত। এটা সুস্পষ্ট যে পরবর্তীকালে বিষয়টি নিশ্চিত করার জন্য সেনাবাহিনী একটি গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম ছিল। সামরিক ক্রিয়াকলাপ সমন্বয়ের জন্য মেগাস্থিনিস একটি মূল কমিটি এবং 6টি উপ-কমিটির কথা উল্লেখ করেছেন। এগুলোর মধ্যে প্রথম উপকমিটিটি নৌ-বিভাগ দেখাশোনা করত। দ্বিতীয়টি যোগাযোগ ব্যবস্থা এবং রসদের দায়িত্বে ছিল। তৃতীয় উপ কমিটিটি পদাতিক বাহিনীর দায়িত্বে, চতুর্থটি অশ্বারোহী বাহিনীর দায়িত্বে পঞ্চমটি যুদ্ধরথ এবং ষষ্ঠ উপকমিটিটি হস্তী বাহিনীর দায়িত্বে ছিল। দ্বিতীয় উপবিভাগটির কার্যকলাপ ছিল বিভিন্ন ধরনের। যেমন, বিভিন্ন সরঞ্জাম বহন করা, গোরুর গাড়ির (বলদের টানা গাড়ি) ব্যবস্থা করা, সৈন্যদের জন্য খাদ্য সংগ্রহ এবং পশুর জন্য চারণভূমি খুঁজে নেওয়া এবং সৈনিকদের দেখাশোনা করার জন্য চাকর এবং শিল্পীদের নিয়োগ করা।

অশোকও ধম্ম প্রচারের মাধ্যমে তাঁর সাম্রাজ্যের অখণ্ডতা বজায় রাখতে চেষ্টা করেছিলেন। তাঁর ধম্মের বৈশিষ্ট্যগলো ছিল খুবই সরল এবং কার্যত সর্বজনীনভাবে প্রযোজ্য। তাঁর মতে, বর্তমান এবং পরবর্তী পৃথিবীর মানুষের মঙ্গাল সাধন করাই ছিল তাঁর ধম্মের মূল উদ্দেশ্য। ধম্মের বাণী প্রচার করার জন্য তিনি ধম্ম মহামাত্ত নামে এক বিশেষ শ্রেণির কর্মচারী (আধিকারিক) নিয়োগ করেন।

3.3 সাম্রাজ্য কতটা গুরুত্বপূর্ণ ছিল ? (How important was the empire?)

ঊনবিংশ শতাব্দীতে যখন ঐতিহাসিকরা প্রাচীন ভারতের ইতিহাস পুর্নগঠনের কাজ শুরু করেন, তখন তাঁরা মৌর্য সাম্রাজ্যকে মুখ্য সময়কাল হিসাবে ধরেছেন। ভারতবর্ষ তখন ঔপনিবেশিক শাসনের অধীনে এবং ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অংশ ছিল। ঊনবিংশ শতাব্দী এবং বিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে ভারতীয় ঐতিহাসিকরা এই সম্ভাবনাটি খুঁজে পেয়েছিলেন যে প্রথমদিকে ভারত সাম্রাজ্য ছিল চ্যালেঞ্জিং এবং রোমাঞ্চকর। এছাড়াও পাথরের ভাস্কর্যসহ মৌর্যদের সাথে সম্পর্কিত কিছু প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শনগুলোকে দর্শনীয় শিল্পের উদাহরণ হিসাবে বিবেচনা করা হয়েছিল। ঐতিহাসিকদের মধ্যে অনেকেই অশোকের শিলালিপির বার্তাটি অন্যান্য শাসকদের তুলনায় খুব আলাদা দেখতে পেয়েছিলেন। তাঁরা বলেন, অশোক অন্যান্য শাসকদের তুলনায় অনেক বেশি ক্ষমতাশালী এবং পরিশ্রমী ছিলেন। পরবর্তীকালের শাসকরা, যাঁরা মহামান্য উপাধি গ্রহণ করেছিলেন, তাঁদের তুলনায় অশোক অনেক নম্র ছিলেন। সুতরাং, এতে অবাক হওয়ার কিছুই নেই যে, বিংশ শতাব্দীর জাতীয়তাবাদী নেতারা

তাঁকে অনুপ্রেরণামূলক ব্যক্তিত্ব হিসাবে বিবেচনা করেছেন।

তবুও, মৌর্য সাম্রাজ্য কতটা গুরুত্বপূর্ণ ছিল? এই সাম্রাজ্য মাত্র 150 বছর টিকেছিল, যা উপমহাদেশের ইতিহাসের প্রশস্ততায় খুব দীর্ঘ সময় নয়। পাশাপাশি তোমরা যদি মানচিত্র 2 দেখো, তোমরা লক্ষ করবে যে মৌর্য সাম্রাজ্য পুরো উপমহাদেশকে ঘিরে রাখেনি। এমনকি সাম্রাজ্যের সীমান্তের নিয়ন্ত্রণ পর্যন্ত সমান ছিল না। খ্রিস্টপূর্ব দ্বিতীয় শতাব্দীর মধ্যে উপমহাদেশের বেশ কয়েকটি অংশে নতুন নতুন শাসক এবং রাষ্ট্রের আবির্ভাব ঘটে।

4. রাজত্বের নতুন জাতিসমূহ

4.1 দক্ষিণের শাসক এবং রাজারা (Chiefs and kings in the south)

তামিলাকামের চোল, চেরাস ও পাণ্ডুদের (প্রাচীন তামিল দেশের নাম, যেগুলো বর্তমানে অন্ধপ্রদেশ, কেরলা এবং তামিলনাড়ুর সাথে যুক্ত) প্রধানগণসহ দাক্ষিণাত্য এবং আরো দক্ষিণে যে নতুন রাজ্যগুলোর উত্থান হয়েছিল, সেগুলো স্থিতিশীল এবং সমৃদ্ধ ছিল - তা প্রমাণিত হয়েছে।

প্রধান এবং প্রধানগণ

রাষ্ট্রের প্রধান ছিলেন ক্ষমতাশালী ব্যক্তি। তার অবস্থান বংশগত হতে পারে বা নাও হতে পারে। তিনি তার আত্মীয় স্বজন থেকে সমর্থন প্রাপ্ত ছিলেন। তাঁর কার্যাদিগুলোর মধ্যে বিশেষ রীতিনীতি সম্পাদন, যুদ্ধের নেতৃত্ব এবং সালিশি বিরোধগুলো অন্তর্ভুক্ত ছিল। তিনি অধস্তনদের (রাজাদের মতো নয় যারা সাধারণত কর আদায় করে) কাছ থেকে উপহার গ্রহণ করতেন এবং প্রায়ই সেগুলো তাঁর সমর্থকদের মধ্যে বিলিয়ে দিতেন। সাধারণত মুখ্য ডোমগুলোতে নিয়মিত সেনাবাহিনী এবং কর্মকর্তা ছিল না।

বিভিন্ন সূত্র থেকে আমরা এই সকল রাজ্যগুলো সম্পর্কে জানতে পারি। উদাহরণস্বরূপ, প্রাচীন তামিল সঙ্গম সাহিত্যের (তৃতীয় অধ্যায়ে দেখ) কবিতাগুলোতে প্রধানরা (রাজারা) কীভাবে সম্পদ অর্জন করতেন এবং বিতরণ করতেন তা বর্ণনা করা হয়েছে। অনেক প্রধান (সর্দার) এবং রাজারা দূরদেশের বাণিজ্য থেকে রাজস্ব আদায় করতেন। এদের মধ্যে ছিল সাতবাহনরা যারা পশ্চিম এবং মধ্য ভারতে শাসন করত (খ্রিস্টপূর্ব দ্বিতীয় শতাব্দী থেকে দ্বিতীয় শতাব্দী পর্যন্ত) এবং মধ্য এশিয়ার শক্ জনগণরা, যারা এই উপমহাদেশের উত্তর-পশ্চিম অংশে এবং পশ্চিম অংশে রাজ্য স্থাপন করেছিল। তাদের উৎপত্তির সামাজিক ইতিহাস প্রায় অস্পষ্ট। কিন্তু, আমরা সাতবাহনদের ইতিহাস দেখলে দেখি তারা একসময়ে ক্ষমতা দখল করেছিল এবং বিভিন্ন উপায়ে সামাজিক মর্যাদা দাবি করার চেষ্টা করেছিল।

উৎস 2

সেনাবাহিনীর জন্য হাতিদের বন্দি করা

অর্থশাস্ত্রে রাষ্ট্রের প্রশাসনিক ব্যবস্থা এবং সামরিক সংগঠনের কথা বিস্তৃতভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। এতে বলা হয়েছে, কীভাবে হাতিগুলোকে বন্দি করা হত। হাতির বনাঞ্চলের রক্ষীরা, যারা হাতিকে লালন পালনে সাহায্য করত, তারা হাতির পায়ে শৃঙ্খল পরাত। সীমান্তরক্ষী যারা বনে বাস করত, একইভাবে যারা হাতির পরিচর্যা করত, তারা একসাথে যুক্ত হয়ে পাঁচ অথবা সাতটি স্ত্রী হাতির সাহায্যে হাতির মল এবং মূত্র অনুসরণ করে বন্য হাতিদের আটক করত।

➲ যদি গ্রিকদের বিবরণ সত্যি হয়, তাহলে এই বিশাল সৈন্যবাহিনীর ভরনপোষণের জন্য মৌর্য শাসকদের কত সম্পদ ব্যয় হত বলে তুমি মনে কর?

Source 3

পাণ্ডয় প্রধান সেনগুতুভনের বনবিহার / যাত্রা

এটি তামিল মহাকাব্য সিলপ্পাদিকারমের একটি অংশে --- (যখন আমরা বন পরিভ্রমণ করেছিলাম) জনগণ পাহাড় থেকে নেমে এসেছিল, গান গাইতে গাইতে, নাচতে নাচতে ... ঠিক যেমনভাবে যুদ্ধে বিজয়ী রাজাকে শ্রদ্ধা জানানো হয়। তারা উপহার নিয়ে এসেছিল - হাতির দাঁত, সুগন্ধি কাঠ, হরিণের পশম দিয়ে তৈরি পাখা, মধু, চন্দন কাঠ, সুলমা, হলুদ, এলাচী, মরিচ প্রভৃতি। তারা সাথে নিয়ে এসেছিল নারকেল, আম, ঔষধি গাছ, ফল, পেঁয়াজ, আখ, ফুল, সুপারি, কলা, ব্যাঘ্র শাবক, সিংহ, হাতি, বানর, ভাল্লুক, হরিণ, কস্তুরী মৃগ, শিয়াল, ময়ূর, বন্য বিড়াল, বন মোরগ এবং পোষ মানা টিয়া পাখি প্রভৃতি...।

➲ কেন জনসাধারণ এই উপহারগুলো বহন করে এনেছিল? সর্দার কি এসবের ব্যবহার করতেন?

4.2 ঐশ্বরিক রাজা (Divine kings)

রাজারা নিজেদের উচ্চ আসন লাভের জন্য বিভিন্ন দেবদেবীর সাথে নিজেদেরকে সম্পর্ক গড়ে তুলতেন। উদাহরণস্বরূপ, এই কৌশলটি কুশান শাসকরা গ্রহণ করেছিলেন। (খ্রিস্টপূর্ব প্রথম শতাব্দী এবং খ্রিস্টীয় প্রথম শতাব্দী) যারা বিশাল সাম্রাজ্য বিস্তার করেছিলেন মধ্য এশিয়া থেকে উত্তর পশ্চিম ভারত পর্যন্ত। শিলালিপি এবং ঐতিহ্যবাহী সাহিত্য থেকে তাদের ইতিহাস পুনরুদ্ধার করা হয়েছে। যে রাজ্যগুলোতে তাঁরা প্রকল্প গ্রহণ করেছিল, তার উৎকৃষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায় তাদের মুদ্রা এবং ভাস্কর্য শিল্পে।

মথুরার (উত্তরপ্রদেশ) কাছে মাট মন্দিরে কুষাণ শাসকদের এক বিশাল মূর্তি স্থাপন করা হয়েছে। আফগানিস্তানের একটি মন্দিরেও কুষাণ শাসকদের অনুরূপ একটি মূর্তি রয়েছে। কিছু ঐতিহাসিক মনে করেন যে, এর দ্বারা কুষাণরা নিজদেরকে দেবতাদের সাথে তুলনা করতে চেয়েছেন। অনেক কুষাণ শাসকরা বিভিন্ন উপাধি গ্রহণ করেছেন। যেমন - 'দেবপুত্র' বা 'ভগবানের পুত্র'। সম্ভবত তাঁরা চিনের শাসক যারা নিজেদেরকে 'স্বর্গপুত্র' বলতেন তাদের দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন।

চতুর্থ শতাব্দীতে গুপ্ত সাম্রাজ্যের মতো বিশাল সাম্রাজ্যের প্রমাণ পাওয়া যায়। এই সাম্রাজ্য সামন্তদের উপর নির্ভরশীল ছিল। তাঁরা স্থানীয় সম্পদগুলো রক্ষা করতেন এবং পুরো ভূমির উপর তাদের নিয়ন্ত্রণ ছিল। তাঁরা শাসকদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করত। শাসকদেরকে সামরিক সাহায্য দিত। শক্তিশালী সামন্তরা রাজা হতে পারত। বিপরীতভাবে, দুর্বল শাসকরা বড়ো শাসকদের অধীনস্থ হয়ে পড়ত।

সাহিত্য, মুদ্রা এবং শিলালিপিতে গুপ্ত শাসকদের ইতিহাস লিখিত আছে। কবিরা, তাদের প্রস্তুতিতে রাজাদের প্রশংসা রচনা করেছেন। ঐতিহাসিকরা প্রায়শই এই জাতীয় রচনাগুলো থেকে প্রকৃত তথ্য সংগ্রহ করার চেষ্টা করেন। যারা এগুলো রচনা ও পাঠোদ্ধার করেছেন, তারা প্রায়শই এইসব

চিত্র 2.4
একটি কুষাণ মুদ্রার
অগ্রভাগ : উল্টোদিকে রাজা কনিষ্কের মূর্তি - দেবতা হিসাবে।

➲ কীভাবে রাজা চিত্রিত হয়েছেন?

বিবরণগুলোকে আক্ষরিক সত্য হিসাবে না ভেবে কবিতা রচনার তথ্য হিসাবে মূল্যবান এবং সত্য বলে মনে করেন। গুপ্ত সাম্রাজ্যের সর্বোচ্চ সম্রাট সমুদ্রগুপ্তের সভাকবি হরিষেণ প্রয়াগ প্রশস্তি (এলাহাবাদ প্রশস্তি নামেও পরিচিত) রচনা করেন (খ্রিস্টপূর্ব চতুর্থ শতাব্দীতে)।

উৎস 4

সমুদ্রগুপ্তের প্রশস্তি

এটি প্রয়োগ প্রশস্তির একটি অংশ —

পৃথিবীতে তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বী কেউ ছিল না। তাঁর গুণ এবং শুভকাজগুলো অন্যান্য রাজাদের যশকেও ম্লান করে দিয়েছিল। তিনি ছিলেন এক পরাত্মা পুরুষ। তিনি ভালো সমৃদ্ধিগুলোকে রক্ষা করেছিলেন এবং খারাপ ধারণাগুলোকে ধ্বংস করেছিলেন। তাঁর কোমল হৃদয় শ্রদ্ধা, ভক্তি এবং মানবতায় পরিপূর্ণ ছিল। তাঁর হৃদয় করুণায় পরিপূর্ণ ছিল। তিনি শত সহস্র গাভী দান করেছিলেন। তাঁর হৃদয় সবসময় দুঃস্থ, দরিদ্র, অবহেলিত এবং পীড়িত মানুষদের উন্নতি বিধানে পরিপূর্ণ হয়ে থাকত। তিনি ছিলেন মানবতার এক দিব্য প্রতিমূর্তি, তাঁকে তুলনা করা হয় কুবের (সম্পদের দেবতা), বরুণ (সমুদ্রের দেবতা) ইন্দ্র (বৃষ্টির দেবতা) এবং যম (মৃত্যুর দেবতা) দেবতার সাথে।

চিত্র 2.5

বালি এবং পাথর দিয়ে তৈরি রাজা কনিষ্কের মূর্তি

➲ ভাস্কর্যটিতে কী কী উপাদান রয়েছে যা মূর্তিটিকে একজন রাজার মূর্তি বলে মনে হয়?

➲ আলোচনা করো...

কেন তুমি মনে কর রাজারা ঐশ্বরিক ক্ষমতার দাবি করেছিল?

উৎস 5

গুজরাটের সুদর্শন (সুন্দর) হ্রদ

2 নং মানচিত্রে গিরনারকে খুঁজে বের করো। সুদর্শনা হ্রদটি হল একটি কৃত্রিম জলাশয়। শক শাসক রুদ্র দমনের কার্যকলাপ নিয়ে সংস্কৃত ভাষায় রচিত (খ্রিস্টীয় দ্বিতীয় শতকে) একটি শিলালিপি থেকে আমরা তা জানতে পারি।

এই শিলালিপিতে বর্ণনা করা হয়েছে যে হ্রদটি, সাথে বাঁধ এবং জলাশয়টি স্থানীয় জনগণরা মৌর্য শাসনকালে তৈরি করেছিল। যাই হউক, পরে একটি বড়ো ঝড় বাঁধটিকে ভেঙে ফেলে এবং হ্রদ থেকে জল বের হয়ে যায়। রুদ্র দমন তখন সেই অঞ্চলের শাসন ক্ষমতায় ছিল। তিনি নিজ ব্যয়ে হ্রদটি মেরামত করে এবং এর জন্য প্রজাদের কাছ থেকে কোনো অর্থ নেন নি।

একই পাথরের অন্য একটি লিপিতে (পঞ্চম শতাব্দীতে রচিত) উল্লেখ করা হয়েছে কীভাবে গুপ্ত বংশের একজন শাসক এই হ্রদটির পুনরায় সংস্কার করেছেন?

➲ কেন শাসকরা জলসেচের ব্যবস্থা করেছিলেন?

ধানরোপণের ক্ষেত্রে স্থানান্তর কথাটি ব্যবহার করা হয়। যেখানে জলের প্রাচুর্য রয়েছে। এই পদ্ধতিতে প্রথমে বীজবপন করা হয়। তারপর যখন চারাগাছ জন্মায় তখন সেখান থেকে চারাগাছগুলোকে জল জমে থাকা মাঠে বপন করা হয়। এটি চারাগাছ এবং বেশি ফলনের উৎপাদনের অনুপাতকে নিশ্চিত করে।

5. একটি পরিবর্তিত গ্রাম

5.1 রাজাদের জনপ্রিয়তার ছবি

শাসকদের সম্পর্কে প্রজারা কী ভাবেন? সম্ভবত শিলালিপিগুলো সব কিছুর উত্তর সরবরাহ করতে পারবে না। আসলে সাধারণ মানুষ খুব কমই তাদের চিন্তা ভাবনা এবং অভিজ্ঞতার হিসাব রাখতেন। তা সত্ত্বেও ঐতিহাসিকরা জাতক এবং পঞ্চতন্ত্রের বিভিন্ন গল্পগুলোর পরীক্ষা নিরীক্ষা করে এইসব সমস্যার সমাধান করতে চেষ্টা করেন। অধিকাংশ গল্পই সম্ভবত জনপ্রিয় ছিল। এগুলো ছিল লোকমুখে বলা কাহিনি, যা পরে লিখিত হয়েছে। প্রথম শতাব্দীর মধ্যভাগে জাতক গ্রন্থটি পালি ভাষায় লেখা হয়েছে।

গণ্ডাতিনদু জাতকে এমনি একটি গল্প 'দুস্ট রাজা', প্রজাদের জন্য কতটা দুঃখী তা বর্ণনা করা হয়েছে। সঙ্গে যুক্ত করা হয়েছে, বৃদ্ধা মহিলা, বৃদ্ধ পুরুষ, কৃষক, পশুপালক গ্রাম্য বালক এবং পশুদেরকে। রাজা ছদ্মবেশে নগর পরিক্রমায় বের হয়ে খোঁজ নিতেন তাঁর প্রজারা তাঁর সম্পর্কে কী ভাবেন? তারা প্রত্যেকে তাদের দুঃখ কস্টের জন্য রাজাকে অভিশাপ দিচ্ছে কিনা? রাজার কাছে অভিযোগ ছিল যে প্রজারা রাতে ডাকাত এবং দিনের বেলায় কর আদায়কারীদের দ্বারা আক্রান্ত হত। এই অবস্থা থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য প্রচুর লোক গ্রাম ছেড়ে বনে গিয়ে বসবাস করছিল।

এই গল্প রাজা এবং তাঁর প্রজাদের মধ্যে সম্পর্কের কথা প্রমাণ করে। বিশেষ করে গ্রামীণ প্রজাদের সম্পর্ক। তারা প্রায়ই বিস্মৃত হতেন যে, রাজারা প্রায়শই উচ্চ শুল্কের দাবি করে তাদের রাজকোষগুলো পূরণ করার চেস্টা করতেন। বিশেষভাবে কৃষকরা এই দাবিকে জবরদস্তি বলে মনে করে। জাতক গল্পে প্রতিফলিত হয়েছে যে, বনের মধ্যে পালিয়ে যাওয়ার, একটি বিকল্প পথ ছিল। এদিকে, করের ক্রমবর্ধমান চাহিদা মেটাতে এবং উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে অন্যান্য কৌশলও গৃহীত হয়েছিল।

5.2 উৎপাদন বাড়ানোর কৌশল (Strategies for increasing production)

উৎপাদন বৃদ্ধির একটি কৌশল ছিল কৃষিক্ষেত্রে লাঙল বদল, যা খ্রিস্টপূর্ব ষষ্ঠ শতাব্দীতে গঙ্গা এবং কাবেরী নদীর পলি উর্বর উপত্যকায় বিস্তার লাভ করেছিল। যেসব অঞ্চলে বেশি বৃস্টিপাত হত সেখানে লৌহ টিপযুক্ত লাঙ্গালের সাহায্যে পলিমাটিকে কৃষির জন্য ব্যবহার করা হত। অপর দিকে গাঙ্গেয় উপত্যকার কিছু অংশে স্থানান্তর কৃষির প্রচলনের ফলে ধান উৎপাদন বেড়ে গিয়েছিল। যদিও এর অর্থ হল উৎপাদকের পক্ষে ব্যাক-ব্রেকিং কাজ।

কৃষি উৎপাদনের ক্ষেত্রে যখন লৌহ লাঙল স্থান দখল করেছিল, তখন এই উপমহাদেশে এর ব্যবহারের উপর কিছু বিধি নিষেধ প্রয়োগ করা হল।

অর্ধশুষ্ক অঞ্চলের কৃষকরা যেমন - পাঞ্জাবের কিছু অংশ এবং রাজস্থানে বিংশ শতাব্দী পর্যন্ত এই পদ্ধতি প্রয়োগ করা হয়নি। এই উপমহাদেশের উত্তর পশ্চিম এবং মধ্যভাগের পাহাড়ি অঞ্চলে যারা বসবাস করে, তারা নিড়ানি কৃষিতে অভ্যস্ত, যা ভূখণ্ডের জন্য বেশ ভালো উপযোগী ছিল।

কৃষিক্ষেত্রে উৎপাদন বাড়ানোর আর একটি পদ্ধতি হল জলসেচ ব্যবস্থা, কূপ, ট্যাংক এবং কম ব্যবহৃত খাল থেকে এই জলসেচ ব্যবস্থা। কূপ, ট্যাংক এবং কম ব্যবহৃত খাল থেকে এই জলসেচ করা হত। কৃষকরা ব্যক্তিগতভাবে অথবা দলবদ্ধভাবে জলসেচ প্রক্রিয়া সংগঠিত করত। পরবর্তী সময়ে শক্তিশালী ব্যক্তিরা সাথে রাজারা প্রায়ই শিলালিপিতে এইসব কার্যকলাপ লিপিবদ্ধ করেছেন।

5.3 গ্রামীণ সমাজে বিভিন্নতা (Differences in rural society)

যদিও উৎপাদন বৃদ্ধির ক্ষেত্রে প্রায়ই প্রযুক্তিবিদ্যার ব্যবহার করা হত, কিন্তু লাভ সর্বত্র সমান ছিল না। যা স্পষ্ট তা হল কৃষিতে নিযুক্ত লোকদের মধ্যে ক্রমবর্ধমান পার্থক্য ছিল। বিশেষ করে বৌদ্ধ গল্পগুলোতে ভূমিহীন, কৃষক শ্রমিক, ছোটো কৃষক এবং বড়ো বড়ো জমিদারদের উল্লেখ রয়েছে। পালি সাহিত্যে প্রায়ই গৃহপতিদেরকে দ্বিতীয় এবং তৃতীয় শ্রেণির কৃষক বলে অভিহিত করা হয়েছে। বড়ো জমিদাররা একইভাবে গ্রামীণ প্রধানরা (যাদের অবস্থান বংশগত ছিল) শক্তিশালী ব্যক্তিত্বের অধিকারী ছিলেন, তারা প্রায়ই অন্য কৃষকদের নিয়ন্ত্রণ করতেন। তামিল সাহিত্যে (সঙ্গম সাহিত্য) উল্লেখ করা হয়েছে, যে গ্রামে বিভিন্ন শ্রেণির মানুষ বসবাস করত। যেমন বড়ো জমির মালিক অথবা ভেল্লালর, কৃষক অথবা উজহাভার, দাস অথবা এডিমাই। জমি (ভূমি), শ্রম এবং কিছু নতুন প্রযুক্তিবিদ্যার ভিত্তিতে এই পার্থক্য করা হয়েছিল। এ জাতীয় পরিস্থিতিতে জমির উপর নিয়ন্ত্রণের প্রশ্নগুলো অবশ্যই গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছিল, কারণ এগুলো নিয়ে আইনি গ্রন্থগুলোতে বিস্তৃত আলোচনা করা হয়েছে।

গহপতি

একজন গহপতি ছিলেন একটি বাড়ির মালিক ও প্রভু অথবা বাড়ির প্রধান, যিনি মহিলা, শিশু, দাস এবং শ্রমিকদের যারা একই অঞ্চলে বসবাস করত, তাদেরকে নিয়ন্ত্রণ করতেন, তিনি সম্পদেরও মালিক ছিলেন। যেমন - জমি, পশু এবং অন্যান্য জিনিসপত্র - যেগুলো একটি পরিবারের অন্তর্গত থাকে। কোনো কোনো সময় গহপতি শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে শহরের অভিজাত ও ধনী ব্যবসায়ীদের বোঝাতে।

উৎস 6

সীমানার গুরুত্ব

প্রাচীন ভারতের আইন শাস্ত্রগুলোর মধ্যে মনুসংহিতা ছিল একটি প্রধান গ্রন্থ। এটি সংস্কৃতে লেখা। খ্রিস্ট পূর্ব দ্বিতীয় শতাব্দী থেকে দুশো খ্রিস্টাব্দের মধ্যে এই গ্রন্থটি রচিত হয়েছিল। এই গ্রন্থে রাজার কর্তব্য কী তা বলা হয়েছে।

দেখা যায় সীমানা সম্পর্কে অজ্ঞতার কারণে পৃথিবীতে নিয়মিত বিরোধগুলো দেখা দেয়। তার উচিত ... সীমানা চিহ্নিতকারীদের কবর দেওয়া উচিত ছিল। পাথর, হাড়, গরুর চুল, তুষ, ছাই, হাঁড়ি, শুকনো গোবর, হট, কয়লা নুড়ি এবং বালু দিয়ে। তারও অন্যান্য অনুরূপ পদার্থ থাকতে হবে যা সীমানার চৌরাস্তাতে লুকানো চিহ্ন হিসাবে (সমাধিস্থ) সমাহিত থাকবে যা) মাটিতে ক্ষয় হবে না।

➲ এই সীমানা চিহ্নিতকারীগুলো কি বিরোধগুলো সমাধান করার জন্য যথেষ্ট ছিল?

উৎস 7

একটি ছোটো গ্রামের জীবন

হর্ষবর্ধনের সভাকবি বানভট্টের লেখা 'হর্ষচরিত' (সপ্তম শতাব্দীতে) হল কনৌজের শাসক হর্ষবর্ধনের জীবন চরিত। এটি সংস্কৃত ভাষায় লেখা। (3 নং মানচিত্রে দেখ)। এটি সাহিত্যের একটি অংশ - বিন্ধ্যবনের উপকণ্ঠে একটি বসতি গড়ে উঠেছিল। সেখানকার জীবনযাত্রার উপস্থাপন ছিল অত্যন্ত বিরল ঘটনা।

সীমান্তবর্তী অঞ্চলগুলো বেশিরভাগ অংশ বনে ঢাকা ছিল। ধানী জমির অংশ মাড়াই ক্ষেত এবং আবাদনযোগ্য জমি ছোটো কৃষকরা ভাগ করে নিয়েছিল। এটি মূলত কোদাল সংস্কৃতি ছিল ... ঘাসে আবৃত বিচ্ছিন্নভাবে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা ক্ষেতগুলোতে লাঙল দেওয়া খুব কষ্টসাধ্য ছিল। কয়েকটি পরিষ্কার জায়গায় ছিল কালো মাটি, যা কালো লোহার মতোই শক্ত, ...

ছালার বাণ্ডিল সহ লোকেরা চলছিল ... অসংখ্য বস্তা তোলা ফুল প্রচুর শন ও শন বাণ্ডিল, পরিমাণ মতো মধু, ময়ূর, লেজের পালক, মোমের মালা, লগস এবং ঘাস। গ্রামের স্ত্রীরা পার্শ্ববর্তী গ্রামগুলোর জন্য তড়িঘড়ি করে, সমস্ত কিছু বিক্রয়ের চিন্তা করে এবং মাথায় ঝুড়িগুলো বনের ফলে ভর্তি ছিল।

➲ এই অধ্যায়ে বর্ণিত বিভিন্ন পেশার লোকদের তুমি কীভাবে শ্রেণিবিভাগ করবে?

5.4 ভূমিদান এবং নতুন গ্রামীণ অভিজাতগণ : (Land grants and new rural elites)

শিলালিপি থেকে প্রমাণ পাওয়া যায় যে, এই শতাব্দীর প্রারম্ভিক লগ্নে ভূমিদানের ব্যবস্থা ছিল। কিছু পস্তর শিলালিপিতে এইগুলো লেখা আছে। তবে অধিকাংশ তামার পাত্রে যারা এই ভূমিগ্রহণ করেছেন তাদের নাম উল্লেখ করা হয়েছে (চিত্র 2.13), যে প্রমাণগুলো টিকে আছে সেগুলো সাধারণত ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান বা ব্রাহ্মণদের অনুদান সম্পর্কে লিখিত। অধিকাংশ শিলালিপিই সংস্কৃত ভাষায় লেখা। কোনো কোনো ক্ষেত্রে, বিশেষ করে সপ্তম শতাব্দীর পর থেকে শিলালিপিগুলোর কিছু অংশ সংস্কৃতে লেখা ছিল। আর কিছু অংশ স্থানীয় তামিল অথবা তেলেগু ভাষায় লেখা ছিল। চলো, এইরকম একটি শিলালিপি আরও নিবিড়ভাবে দেখি।

প্রাচীন ভারতের ইতিহাসে বিখ্যাত শাসক দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের (375-415 খ্রিস্টাব্দ) কন্যা ছিল প্রভাবতী গুপ্তা। তাঁর বিয়ে হয়েছিল আর একটি বিখ্যাত শাসক পরিবারে। ঐ বিখ্যাত পরিবারটি ছিল বাকাটক বংশ। যারা দাক্ষিণাত্যে খুবই শক্তিশালী ছিল। (3 নং মানচিত্র দেখো)। সংস্কৃত আইন গ্রন্থ অনুসারে মহিলাদের ভূমি এবং সম্পত্তিতে কোনো অধিকার ছিল না। একটি শিলালিপিতে উল্লেখ আছে যে, প্রভাবতী গুপ্তার জমিতে প্রবেশাধিকার ছিল, যা তিনি তখন দান করেছিলেন। এটা করা হয়েছিল কারণ তিনি রাণি ছিলেন (প্রাচীন ভারতের ইতিহাস থেকে এর সামান্য কিছু জানা যায়) এবং তাই তাঁর পরিস্থিতি ব্যতিক্রমী ছিল। এটা সম্ভব হয়েছিল কারণ আইন গ্রন্থের বিধানগুলো সমানভাবে কার্যকর করা হয়নি।

শিলালিপি গ্রামীণ জনসাধারণের সম্পর্কে ধারণা দেয়। এর সাথে ব্রাহ্মণ এবং কৃষকদেরকেও যুক্ত করে দেওয়া হয়েছিল। একইভাবে অন্যদেরকেও, যারা রাজা বা তাঁর প্রতিনিধিদের জন্য একাধিক পণ্য সরবরাহ করবেন বলে আশা করা হয়েছিল। শিলালিপি অনুসারে, তারা গ্রামের নতুন জমিদারকে মান্য করত এবং সম্ভবত তাঁকে সমস্ত রকম বকেয়া পরিশোধ করত।

সাম্রাজ্যের বিভিন্ন অংশে এই ধরনের ভূমিদানের কথা শিলালিপিতে পাওয়া গেছে। আঞ্চলিক বৈচিত্র্যের জন্য ভূমিদানের আকারও বিভিন্ন ছিল — ছোটো জমি থেকে বড়ো অকৃষিজ জমি — দানগ্রহণকারীদের এই অধিকারগুলো দেওয়া হয়েছিল। ভূমি অনুদানের প্রভাব ঐতিহাসিকদের মধ্যে উত্তপ্ত বিতর্কের বিষয় ছিল। কেউ কেউ মনে করেন যে, ভূমি অনুদান কৃষকদের নতুন অঞ্চলে প্রসারিত করার জন্য ক্ষমতাসীন বংশ দ্বারা গৃহীত কৌশলগুলোর একটি অংশ ছিল। অন্যরা মনে করেন যে, ভূমি অনুদান রাজনৈতিক শক্তি দুর্বল করার ইঙ্গিত, কারণ রাজারা সামন্তদের নিয়ন্ত্রণ করার ক্ষমতা হারিয়েছিল। তারা জমি অনুদান করে মিত্রদের মন জয়ের চেষ্টা করেছিল। তারা আরও অনুভব

করে যে, রাজারা সুপারম্যান হিসাবে নিজেকে উৎসাহিত করার চেষ্টা করেছিল কারণ তারা নিয়ন্ত্রণ হারাচ্ছিল : তারা সম্মুখে শক্তি উপস্থাপন করতে চেয়েছিল।

উৎস ৪

প্রভাবতী গুপ্তা এবং দানগুণা গ্রাম

প্রভাবতী গুপ্তা তাঁর শিলালিপিতে যা বলেছেন :

প্রভাবতী গুপ্তা দানগুণা গ্রামের গ্রাম কুটু মবিনাস (গৃহস্থ বা কৃষক যারা গ্রামে বাস করে) ব্রাহ্মণ এবং অন্যান্যদের আদেশ দিচ্ছেন ...... আপনাদের জানা উচিত যে কার্তিক মাসের শুক্লা দ্বাদশ তিথিতে আমরা আমাদের ধর্মীয় যোগ্যতা বাড়াতে এই গ্রামের জলছত্র আচারি চনাল স্বামীকে দান করেছি ... আপনারা তাঁর সব আদেশ মেনে চলবেন।

আমরা অগ্রহার হিসাবে নিম্নলিখিত বিষয়গুলো অব্যাহতিতে (তাঁকে) সম্মতি জানাই। এই গ্রামে পুলিশ অথবা সৈনিকরা প্রবেশ করবে না; তাদেরকে (এটি) তৃণ, (প্রদত্ত বাধ্যবাধকতা), (প্রাণীদের) লুকানো স্থান এবং কাঠকয়লা (রাজকর্মীদের সাথে ভ্রমণে) থেকে অব্যাহতি দেওয়া হয়েছে, ফেরেন্টিং তরল ক্রয় এবং খনন (লবণ) কাজ থেকে (এর রাজকীয় অগ্রগামী) অব্যাহতি দেওয়া হয়েছে, অব্যাহতি দেওয়া হয় খনি এবং খদিরা গাছ সংগ্রহ থেকেও ফুল এবং দুধ সরবরাহের দায়িত্ব থেকেও অব্যাহতি দেওয়া হয়, লুকানো এবং জমানো সম্পদ সাথে অধিক বা অল্প কর থেকেও অব্যাহতি দেওয়া হয়....।

এই তালিকাটি তেরো বৎসর আগে লেখা হয়েছিল। চক্রদাস দ্বারা এইটি খোদাই করা হয়েছিল।

➲ গ্রামে কী কী জিনিস উৎপাদন হত?

অগ্রহার হল ব্রাহ্মণকে ভূমিদান করা, যিনি রাজাকে রাজস্ব ও অন্যান্য বকেয়া অর্থ প্রদান থেকে অবৈধভাবে অব্যাহতি প্রাপ্ত ছিলেন এবং প্রায়শই এই অধিকার দিতেন। প্রায়শই স্থানীয় লোকদের কাছ থেকে এই বকেয়া আদায়ের অধিকার দেওয়া হয়েছিল।

জমি অনুদানের মাধ্যমে রাজা এবং কৃষকদের মধ্যে সম্পর্ক গড়ে উঠত। তবে এমন কিছু লোক ছিলেন যারা প্রায়শই কর্মকর্তা বা সামন্তদের নাগালের বাইরে ছিলেন। যেমন-পশুপালক, সংগ্রাহক, শিকারী, মৎস্যজীবী, ভ্রাম্যমান শিল্পকার এবং স্থানান্তরিত কৃষকরা। সাধারণত, এই জাতীয় দলগুলো তাদের জীবন এবং লেনদেনের বিশদ রেকর্ড রাখে না।

➲ আলোচনা করো...

খুঁজে বের করো তোমার রাজ্যে কোথায় কোথায় লাঙল, কৃষি, জলসেচ এবং স্থানান্তর কৃষির প্রচলন আছে। যদি না থাকে, তাহলে অন্য কোনো পদ্ধতি ব্যবহার করা হয় কি?

6. শহর এবং বাণিজ্য

6.1 নতুন শহর

চলো, খ্রিস্টপূর্ব ষষ্ঠ শতাব্দী থেকে উপমহাদেশের বেশ কয়েকটি অংশে উদ্ভূত শহর কেন্দ্রগুলোতে ফিরে যাই। আমরা দেখেছি, এর মধ্যে অনেকগুলোই ছিল মহাজনপদের রাজধানী। বস্তুত সমস্ত বড়ো শহরগুলো যোগাযোগের রাস্তায় (রুটে) অবস্থিত ছিল। কিছু নগর, যেমন পাটলিপুত্র নদীতীরস্থ রাস্তায় অবস্থিত ছিল। অন্যগুলো, যেমন উজ্জয়িনী স্থলপথে অবস্থিত ছিল। আবার অন্যগুলো যেমন পুহার বন্দরের পাশে অবস্থিত ছিল, যেখান থেকে সমুদ্রপথ শুরু হয়েছিল। মথুরার মতো অনেক শহর বাণিজ্যিক, সাংস্কৃতিক এবং রাজনৈতিক ক্রিয়াকলাপের কেন্দ্রস্থল ছিল।

6.2 শহরের জন্যসংখ্যা : অভিজাত এবং কারিগর

আমরা দেখেছি, রাজা এবং অভিজাত শাসকরা নগর দুর্গগুলোতে বসবাস করত। যদিও বেশিরভাগ স্থানে বিস্তৃত খনন পরিচালনা করা কঠিন কারণ, এই অঞ্চলগুলোতে লোকেরা এখনও (হরপ্পা শহরগুলোর মতো নয়) বাস করে তাদের কাছ থেকে বিস্তৃত নিদর্শনগুলো উদ্ধার করা হয়েছে। এর মধ্যে রয়েছে চকচকে সূক্ষ্ম মৃৎশিল্পের বাটি এবং থালা, যা নর্দান ব্ল্যাক পলিশ ওয়্যার' হিসাবে পরিচিত। সম্ভবত ধনী লোকদের ব্যবহৃত বিভিন্ন অলংকার, যন্ত্রপাতি, অস্ত্রশস্ত্র, জাহাজ, মূর্তি ইত্যাদি জিনিসগুলো স্বর্ণ, রৌপ্য, তামা, ব্রোঞ্জ, হাতির দাঁত, কাচ, শেল এবং পোড়ামাটির — উপকরণ থেকে তৈরি হত।

পাটলিপুত্রের ইতিহাস

প্রতিটি শহরের নিজস্ব একটি ইতিহাস আছে। উদাহরণস্বরূপ, পাটলিপুত্র, পাটলি গ্রাম নামে পরিচিত একটি গ্রাম হিসাবে শুরু হয়েছিল। তারপর, খ্রিস্ট পূর্ব পঞ্চম শতাব্দীতে মগধের শাসকরা স্থির করল যে তাঁরা রাজধানী রাজগহ থেকে পাটলিপুত্রে স্থানান্তরিত করবেন। তাই তাঁরা এর নতুন নামাকরণ করলেন পাটলিপুত্র। খ্রিস্টপূর্ব চতুর্থ শতাব্দীতে পাটলিপুত্র ছিল। মৌর্য সাম্রাজ্যের রাজধানী এবং এশিয়া মহাদেশের একটি বড়ো শহর পরবর্তীকালে, এর গুরুত্ব স্পষ্টতই হ্রাস পেয়েছে চিনা তীর্থযাত্রী জুয়ান জাং যখন খ্রিস্টীয় সপ্তম শতাব্দীতে শহরটি পরিদর্শন করেছিলেন, তিনি শহরটির ধ্বংস স্তূপে এবং খুব অল্প লোকসংখ্যা দেখতে পেয়েছিলেন।

চিত্র 2.6

একটি মূর্তি উপহার

এইটি মথুরা প্রতিমূর্তির একটি অংশ। একটি প্রাকৃত শিলালিপির পাদদেশে উল্লেখ করা হয়েছে যে ধর্মক নামে একটি স্বর্ণকারের স্ত্রী নাগাপিয়া নামে এক মহিলা এই চিত্রটি একটি মন্দিরে স্থাপন করেছিলেন।

মানচিত্র 3

কিছু গুরুত্বপূর্ণ রাজ্য এবং শহর।

খ্রিস্টপূর্ব দ্বিতীয় শতাব্দীর মধ্যে আমরা বেশ কয়েকটি শহরে ছোটো ছোটো ভোটেভি শিলালিপি পাই। এগুলোতে দাতার নাম উল্লেখ থাকত। কোনো কোনো সময় দাতার পেশাও উল্লেখ থাকত। এই শিলালিপিগুলো থেকে জানা যায় শহরে ধোপা, তাঁতি, লেখক, ছুতার, মৃৎশিল্পী, স্বর্ণকার, কুমোর, কামার, অফিসের কর্মকর্তা, ধর্মীয় গুরু, ব্যবসায়ী এবং রাজারা বসবাস করতেন। কখনো কখনো গিল্ডস বা শ্রেণিস, শিল্প উৎপাদক এবং বণিকদের সংগঠনগুলোর কথাও উল্লেখ করা হয়েছে। এই সংঘ (গিলডস) গুলো সম্ভবত কাঁচামাল সংগ্রহ করে উৎপাদন নিয়ন্ত্রণ করে উৎপাদিত দ্রব্য সামগ্রী বাজারজাত করত। সম্ভবত কারিগররা নগর অভিজাতদের ক্রমবর্ধমান চাহিদা মেটাতে বিভিন্ন ধরনের লোহার সরঞ্জাম ব্যবহার করেছিল।

➲ খ্রিস্টপূর্ব তৃতীয় সহস্রাব্দে হরপ্পান সভ্যতা যে অঞ্চলে গড়ে ওঠে সে অঞ্চলে এমন কোনো শহর ছিল?

ভোটিভ শিলালিপিতে ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান গুলোকে দেওয়া উপহারের রেকর্ড রয়েছে।

Source 9

মালাবার উপকূল (বর্তমান কেরালা)

এখানে এরিথ্রিয়ান সমুদ্রে পেরিপ্লাসের সমুদ্রযাত্রার কথা বলা হয়েছে, একজন গ্রিক নাবিক এই সমুদ্রযাত্রা লিপিবদ্ধ করেছেন (প্রথম শতাব্দীতে) তারা (বিদেশ থেকে ব্যবসায়ীরা) বড়ো বড়ো জাহাজ বোঝাই করে প্রচুর পরিমাণে গোল মরিচ এবং মালা বাথরুম (সম্ভবত দারুচিনি এই অঞ্চলে উৎপাদন হত) এইসব বাজার শহরগুলোতে পাঠাত। এখান থেকেই প্রথম আমদানি হয় প্রচুর পরিমাণে মুদ্রা, পোখরাজ ... অ্যান্টিমনি প্রবাল, অপরিশোধিত কাচ, টিন, তামা, সিসা ইত্যাদি। ... গোলমরিচ, যা এই অঞ্চলের বাজারের কাছে প্রচুর পরিমাণে উৎপাদিত হত, সেগুলো রপ্তানি করা হত। এছাড়াও এখানে প্রচুর পরিমাণে সূক্ষ্ম মুক্তা, হাতির দাঁত, রেশম, কাপড় ইত্যাদি রপ্তানি করা হত। ... সব ধরনের হিরা ও নীলকান্ত মণি, কচ্ছপের খোল এবং স্বচ্ছ পাথরও রপ্তানি করা হত।

তামিলনাড়ুর কোদোমানালে পুঁতি তৈরির শিল্প, মূল্যবান এবং অর্ধ মূল্যবান পাথর ব্যবহারের প্রত্নতাত্ত্বিক প্রমাণ পাওয়া গেছে। সম্ভবত স্থানীয় ব্যবসায়ীরা পেরিপ্লাসে উল্লিখিত পাথরগুলোর মতো পাথর উপকূলীয় বন্দরগুলোতে নিয়ে আসতেন।

➲ কেন লেখক এই তালিকাটি তৈরি করেছিলেন?

“পেরিপ্লাস” একটি গ্রিক শব্দ, এর অর্থ হল সমুদ্রযাত্রা এবং গ্রিক ভাষায় এরিথ্রিয়ানের অর্থ হল লোহিত সাগর।

6.3 উপমহাদেশ এবং এর বাইরে বাণিজ্য :

খ্রিস্টপূর্ব ষষ্ঠ শতাব্দী থেকে স্থল ও নদী পথগুলো উপমহাদেশকে অতিক্রম করেছে এবং বিভিন্ন দিকে প্রসারিত হয়েছিল। মধ্য এশিয়া থেকে বহুদূর পর্যন্ত এই স্থলপথ বিস্তৃত ছিল। জলপথ বন্দর থেকে তট হয়ে আরব সাগর পেরিয়া পূর্ব এবং উত্তর আফ্রিকা এবং পশ্চিম এশিয়া এবং বঙ্গোপসাগরের মধ্যে দিয়ে দক্ষিণ পূর্ব এশিয়া এবং চিনে বিস্তৃত হয়েছে। শাসকরা প্রায়শই কোনো মূল্যের জন্য সুরক্ষা সরবরাহ করে এই পথগুলো নিয়ন্ত্রণ করার চেষ্টা করত। যারা এই পথগুলো অতিক্রম করেছেন তাদের মধ্যে প্যাডেলাররা অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। তারা সম্ভবত পায়ে হেঁটে ভ্রমণ করত। ব্যবসায়ীরা গোরুর গাড়ি (বলদে টানা গাড়ি) এবং পশুদের টানা মালবাহী গাড়ি নিয়ে ভ্রমণ করত। এছাড়াও, সেখানে সামুদ্রিক ব্যবসায়ী শ্রেণি ছিল, যারা সমুদ্রপথে ব্যবসায়ী উদ্যোগগুলো গ্রহণ করত, যদিও এটা ছিল ঝুঁকিপূর্ণ কাজ, কিন্তু অত্যন্ত লাভজনক, বাণিজ্যে সফল বণিকরা, যারা ধনী ব্যক্তিতে পরিণত হয়েছিল, তারা তামিল ভাষায় ম্যাসতুতভান এবং প্রাকৃত ভাষায় শেটি এবং সত্যবাহ নামে প্রসিদ্ধ ছিল। ব্যবসায়ীরা লবণ, শস্য, কাপড়, ধাতু আকরিক নির্মিত দ্রব্য, পাথর, কাঠ, ঔষধি গাছ ইত্যাদি একস্থান থেকে অন্য স্থানে বহন করে নিয়ে যেত। মশলা বিশেষ করে গোল মরিচ, কাপড় এবং ঔষধি গাছ রোম সাম্রাজ্যে খুব চাহিদা ছিল। এগুলো আরব সাগরের পথ দিয়ে ভূমধ্য সাগরে এসে পৌঁছত।

6.4 মুদ্রা এবং রাজারা (Coins and kings)

মুদ্রা প্রবর্তনের মাধ্যমে বিনিময় প্রথাগুলো সহজতর হয়েছিল। রৌপ্য এবং তামা দিয়ে তৈরি পাঞ্চ চিহ্নিত মুদ্রাগুলো (খ্রিস্টপূর্ব ষষ্ঠ শতাব্দী থেকে) প্রথম আবিষ্কার এবং ব্যবহার করা হয়। এগুলো উপমহাদেশের বিভিন্ন স্থানে খনন কার্য থেকে উদ্ধার করা হয়েছে। সম্ভাব্য বাণিজ্যিক নেটওয়ার্কগুলো পুনর্গঠনের জন্য মুদ্রা তাত্ত্বিকগণ এগুলো এবং অন্যান্য মুদ্রাগুলো গবেষণা করেছেন।

মৌর্য রাজবংশসহ অন্যান্য নির্দিষ্ট শাসক রাজবংশগুলোর সাথে মুষ্ট্যাঘাত (পাঞ্চ) চিহ্নিত মুদ্রাগুলো চিহ্নিত করার চেষ্টা করা হয়েছে এবং পরামর্শ দেওয়া হয়েছিল যে এগুলো রাজাদের দ্বারা জারি করা হয়েছে। বণিক, ব্যাংকার এবং নগরবাসীরা সম্ভবত এই ধরনের কিছু মুদ্রা প্রচলন করেছিল। শাসকদের মধ্যে ইন্দো-গ্রিক শাসকরা প্রথম মুদ্রার প্রচলন করেছিল। খ্রিস্টপূর্ব দ্বিতীয় শতাব্দীতে এই উপমহাদেশের উত্তর-পশ্চিম অংশে নিজেদের আধিপত্য স্থাপন করে।

খ্রিস্টীয় প্রথম শতাব্দীতে কুষাণ রাজারা প্রথম স্বর্ণমুদ্রা প্রবর্তন করেন। এগুলো সমসাময়িক রোমান এবং ইরানের পার্থিয়ান শাসকদের দ্বারা জারি করা মুদ্রার ওজনের সমান ছিল এবং এগুলো মধ্য এশিয়া এবং উত্তর ভারতের বিভিন্ন অংশে পাওয়া গেছে। স্বর্ণ মুদ্রার ব্যাপক ব্যবহার প্রমাণ করে যে, সেই সময় লেনদেনের মাধ্যম হিসাবে সোনার বিশাল মূল্য ছিল। এছাড়াও দক্ষিণ

ভারতের প্রত্নতাত্ত্বিক স্থান থেকে রোমান মুদ্রার ভাণ্ডার পাওয়া গেছে। এটা স্পষ্ট যে, বাণিজ্যিক নেটওয়ার্কগুলো রাজনৈতিক সীমানায় সীমাবদ্ধ ছিল না। যেমন-দক্ষিণ ভারত, রোমান সাম্রাজ্যের অংশ ছিল না, কিন্তু বাণিজ্যের মাধ্যমে ভারতের সাথে রোমের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল।

পাঞ্জাব এবং হরিয়ানার ইয়াহুদিয়াদের মতো উপজাতি প্রজাতন্ত্রগুলোও মুদ্রা প্রচলন করেছিল (খ্রিস্টীয় প্রথম শতাব্দীতে) প্রত্নতাত্ত্বিকেরা ইয়াহুদিয়াদের দ্বারা প্রবর্তিত হাজার তামার মুদ্রার সন্ধান পেয়েছেন। এগুলো তাদের আগ্রহ এবং অর্থনৈতিক লেনদেনে (বিনিময়ের) অংশগ্রহণের প্রমাণ দেয়।

বেশ কিছু দর্শনীয় স্বর্ণ মুদ্রা গুপ্ত শাসকদের দ্বারা প্রবর্তন করা হয়েছিল। প্রথম দিকে প্রবর্তিত মুদ্রাগুলো তাদের বিশুদ্ধতার জন্য উল্লেখযোগ্য। এই মুদ্রাগুলো দূরপাল্লার লেনদেনকে সহজ করেছিল, যা থেকে রাজারাও উপকৃত হয়েছিল।

খ্রিস্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীর পরে স্বর্ণ মুদ্রার প্রচলন বন্ধ করে দেওয়া হয়। এটা কি অর্থনৈতিক সংকটের ইঙ্গিত বহন করে? এ নিয়ে ঐতিহাসিকদের মধ্যে মতভেদ রয়েছে। কিছু ঐতিহাসিকের মতে পশ্চিম রোমান সাম্রাজ্যের পতনের সাথে সাথে দূরপাল্লার বাণিজ্যও ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল। এর দ্বারা উপকৃত রাজ্য, সম্প্রদায় এবং অঞ্চলগুলোর সমৃদ্ধিকে প্রভাবিত করেছিল। অনেক ঐতিহাসিকদের মতে নতুন শহর স্থাপন এবং নেটওয়ার্ক বাণিজ্য এ সময় থেকে শুরু হয়েছিল। তারা আরও উল্লেখ করেন যে, সেই সময়ের মুদ্রার সন্ধান কম পাওয়া গেলেও, শিলালিপি এবং বইতে অনেক মুদ্রার উল্লেখ রয়েছে। এটা কি এমনও হতে পারে যে মুদ্রা সংগ্রহের চেয়ে মুদ্রার প্রচলন ছিল বেশি বলে মুদ্রা কম খুঁজে পাওয়া গিয়েছিল।

7. প্রাথমিক স্তরে ফিরে আসা

কীভাবে শিলালিপিগুলো ছড়িয়ে ছিটিয়ে যায়?

এখনও অবধি আমরা অন্যান্য জিনিসের মধ্যে শিলালিপি থেকে উদ্ধৃত অংশগুলো অধ্যয়ন করেছি। কিন্তু ঐতিহাসিকরা কীভাবে, তাদের উপর কী লেখা আছে তা আবিষ্কার করবেন?

চিত্র 2.9
গুপ্তযুগের একটি মুদ্রা।

নুমিসম্যাটিক শব্দের অর্থ হল মুদ্রা ও দৃশ্যমান উপাদানসমূহ নিয়ে গবেষণা যেমন - পাণ্ডুলিপি এবং মূর্তিগুলোর যে ধাতু দিয়ে তৈরি হয়েছে তার বিশ্লেষণ এবং যে প্রসঙ্গে এগুলো পাওয়া গেছে তার আলোচনা ।

চিত্র 2.7
একটি ছাপাঙ্কিত চিহ্নিত মুদ্রা, নামকরণ করা হয়েছে। কারণ প্রতীকগুলো ধাতবপৃষ্ঠের উপর স্ট্যাম্প করা হয়েছিল।

চিত্র 2.8
একটি ইয়ুদেয় মুদ্রা।

➲ আলোচনা করো...

বাণিজ্যে বিনিয়োগের লেনদেনগুলো কী কী? উল্লেখিত উৎস থেকে এই লেনদেনগুলোর মধ্যে কোন্‌টি স্পষ্ট? এমন কি আছে যেগুলো উৎস থেকে স্পষ্ট হয় না?

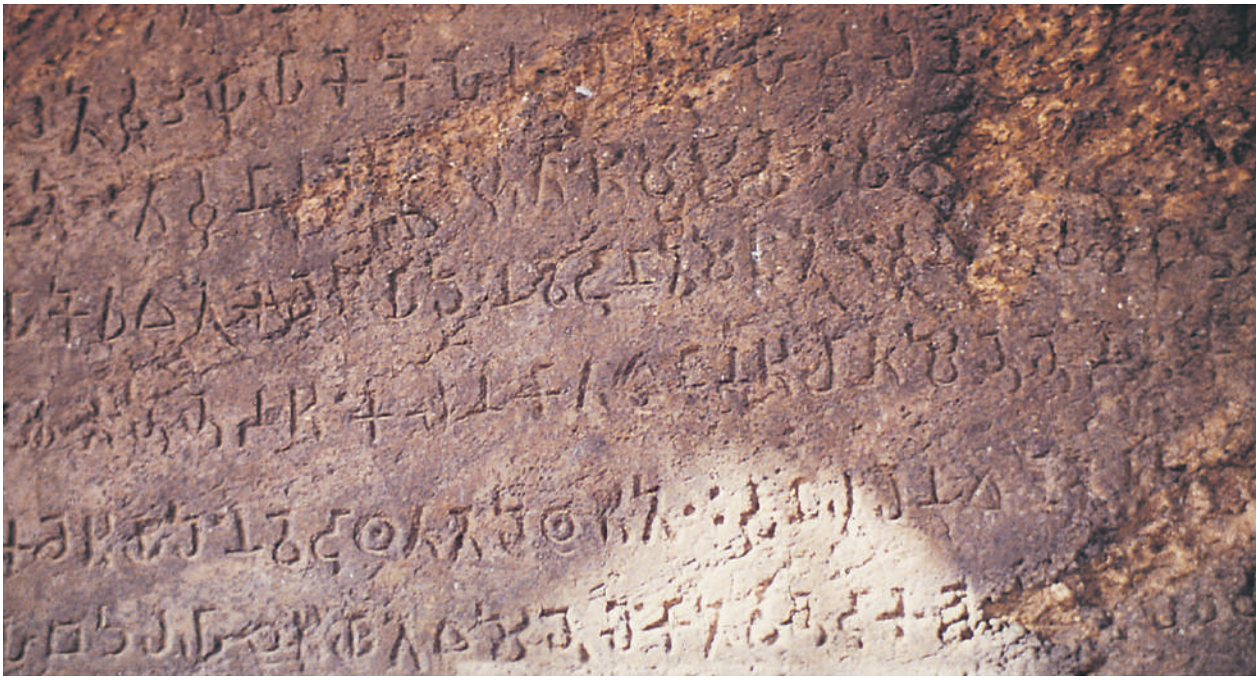

চিত্র 2.10
অশোকের একটি শিলালিপি

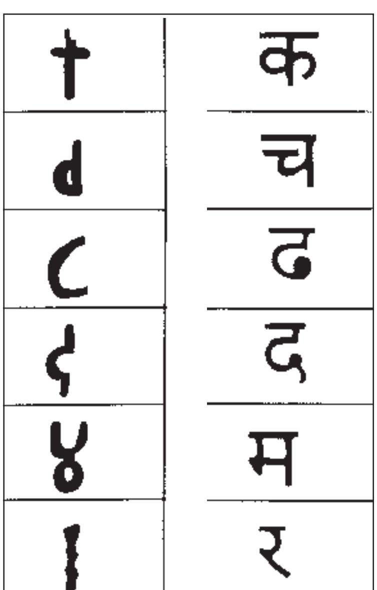

চিত্র 2.11
অশোকের ব্রাহ্মীলিপি সাথে দেবনাগরী অক্ষর

➲ কিছু দেবনাগরী বর্ণ কি ব্রাহ্মীর সাথে মিল রয়েছে? এমন কী আছে যে আলাদা বলে মনে হচ্ছে?

7.1 ব্রাহ্মীলিপির পাঠোদ্ধার :
আধুনিক ভারতের অধিকাংশ ভাষার লিপিগুলো ব্রাহ্মীলিপি থেকে লিখিত। এই লিপি অশোকের শিলালিপিতে বেশি ব্যবহার করা হয়েছে। অষ্টাদশ শতাব্দীর পর থেকে ইউরোপীয় পণ্ডিতরা ভারতীয় পণ্ডিতদের সাহায্যে আধুনিক বাংলা এবং দেবনাগরী হরফের পাণ্ডুলিপিগুলো পাঠোদ্ধার করতে শুরু করেন। তাঁরা তাঁদের অক্ষরগুলোর সাথে প্রাচীন অক্ষরগুলোর তুলনা করতে শুরু করেন।

পণ্ডিতরা যারা প্রাচীন শিলালিপিগুলোর পাঠোদ্ধার করেছিলেন তাঁরা কোনো কোনো সময় অনুমান করেন এগুলো সংস্কৃতে লেখা। যদিও প্রাচীন শিলালিপিগুলো প্রাকৃত ভাষায় লেখা ছিল। কয়েক দশক ধরে যত্নশীলভাবে গবেষণার পরেই জেমস প্রিন্সেপ 1838 সালে অশোকের ব্রাহ্মীলিপির ব্যাখ্যা দিতে সক্ষম হন।

7.2 খরোষ্ঠী লিপি কীভাবে পাঠোদ্ধার করা হয়েছিল :
উত্তর-পশ্চিমে শিলালিপিতে ব্যবহৃত খরোষ্ঠী লিপির বিশ্লেষণ কাহিনি সম্পূর্ণ আলাদা। এখানে, ইন্দো গ্রিক রাজাদের মুদ্রার সন্ধান পাওয়া গেছে যারা এই অঞ্চলে শাসন করেছিল (খ্রিস্টপূর্ব দ্বিতীয় শতাব্দী থেকে খ্রিস্টীয় প্রথম শতাব্দী পর্যন্ত)। ওইসব মুদ্রাগুলোতে গ্রিক এবং খরোষ্ঠী লিপিতে রাজাদের নাম লেখা আছে। ইউরোপীয় পণ্ডিত যারা পুরানো চিঠিগুলোর পাঠোদ্ধার করেন তারা এগুলোর তুলনা করতে পারতেন। উদাহরণস্বরূপ, অ্যাপোলোডোটাসের মতো নাম লেখার জন্য উভয় স্ক্রিপ্টগুলোতে 'ক' এর প্রতীক পাওয়া যেতে পারে। প্রিন্সেপ খরোষ্ঠী শিলালিপিগুলোর ভাষা প্রাকৃত হিসাবে চিহ্নিত করার সাথে সাথে দীর্ঘতর শিলালিপিগুলো পড়াও সম্ভব হয়েছিল।

7.3 শিলালিপি থেকে প্রাপ্ত ঐতিহাসিক প্রমাণ :

এপিগ্রাফিস্ট (লিপিকার) এবং ঐতিহাসিকরা কীভাবে কাজ করে তা সন্ধান করতে চলো আমরা অশোকের দুটি শিলালিপি আরও নিবিড়ভাবে দেখি।

মনে করো, শাসকের নাম অশোক, শিলালিপিতে তা উল্লেখ করা হয়নি (উৎস 10), পরিবর্তে যা ব্যবহৃত হয়েছে তা হল শাসক দ্বারা গৃহীত শিরোনাম - যেমন 'দেবানাম পিয়' অর্থাৎ 'দেবতাদের প্রিয়' এবং পিয়দর্শী বা 'দেখতে সুন্দর'। অন্যান্য কয়েকটি শিলালিপিতে অশোক নামটি উল্লেখ করা হয়েছে, সাথে এই শিরোনাম। উপাধিগুলোও উল্লেখ করা হয়। এই সমস্ত শিলালিপি পরীক্ষা করার পরে এটা প্রমাণিত হয়েছে যে এদের বিষয়বস্তু, শৈলী, ভাষা এবং প্রাচীনলিপি বিজ্ঞান একই রকম, তাই লিপি গবেষকরা এই সিদ্ধান্তে এসেছেন যে, এইগুলো একই শাসক জারি করেছেন।

তোমরা এটাও খেয়াল করে থাকতে পার যে, অশোক দাবি করেছেন যে, পূর্ববর্তী শাসকদের কাছে রিপোর্ট পাওয়ার কোনো ব্যবস্থা ছিলনা, যদি তোমরা অশোকের আগের এই উপমহাদেশের রাজনৈতিক ইতিহাস দেখ তাহলে তোমরা কী মনে করবে অশোকের এই মন্তব্য সত্য? শিলালিপিতে দেওয়া বিবৃতিগুলো সত্য, বিচারযোগ্য বা অতিরঞ্জিত কিনা তা ঐতিহাসিকরা প্রতিনিয়ত বিচার এবং মূল্যায়ন করে চলছে।

তোমরা কি লক্ষ করেছ যে বন্দনীতে শব্দ রয়েছে? লিপি লেখকরা কোনো কোনো সময় এগুলোর পরিষ্কার অর্থ বোঝার জন্য কিছু কিছু শব্দ যোগ করেছিলেন। এটি লেখকের উদ্দেশ্য সঠিকভাবে পরিবর্তিত হচ্ছে না, তা নিশ্চিত করার জন্য এটি সাবধানতা অবলম্বন করতে হবে।

ঐতিহাসিকদের আরো অনেক কিছু মূল্যায়ণ করতে হবে। যদি কোনো রাজার আদেশ শহরগুলোর নিকটবর্তী প্রাকৃতিক পাথরে বা যোগাযোগের পথগুলোতে লিপিবদ্ধ থাকে, তবে পথিকরা কি এগুলো পড়তে থামবেন? সম্ভবত অধিকাংশ জনসাধারণ পড়ালেখা জানতেন না? উপমহাদেশের প্রত্যেকে কি পাটলিপুত্রে ব্যবহৃত প্রাকৃত ভাষা বুঝতে পেরেছিল? রাজার আদেশ কি অনুসরণ করা হত? এই জাতীয় প্রশ্নের উত্তরগুলো খুঁজে পাওয়া সর্বদা সহজ ছিল না।

উৎস 10

রাজার আদেশ

এইভাবে রাজা দেবানামপ্রিয় পিয়দশী বলছেন :

অতীতে, নিয়মিত প্রতিবেদন পাওয়ার জন্য এবং বিষয়গুলো নিষ্পত্তি করার জন্য কোনো ব্যবস্থা ছিল না, কিন্তু আমি নিম্নলিখিত ব্যবস্থা গ্রহণ করেছিলাম। প্রতিবেদকরা প্রতিনিয়ত আমাকে জনগণের খবরাখবর দিতেন, আমি যখন, যেখানে যে অবস্থাই থাকি না কেন হয়তো আমি খাচ্ছি, অভ্যন্তরীণ সাক্ষাৎকারে, শয়ন ঘরে, গাভী পরিসেবায়, বা আমাকে বহন করছি (সম্ভবত একটি পাল্কি) বা বাগানে যে অবস্থাতেই থাকি না কেন? আমি মানুষের বিষয়গুলো নিষ্পত্তি করার চেস্টা করব।

➲ লিপিকাররা, প্রতিবেদক-দেরকে সংবাদদাতা হিসাবে উল্লেখ করেছেন, আমরা আজ সাংবাদিকদের সাথে যেভাবে কাজ করি তার থেকে কীভাবে প্রতিবেদকদের কার্যকলাপ আলাদা ছিল?

চিত্র 2.12
ইন্দো-গ্রিক রাজা মেনান্দারের একটি মুদ্রা

উৎস 11

রাজার বেদনা / যন্ত্রণা

দেবানামপিয়া পিয়দশী রাজা অশোক আট বছর রাজত্ব করার পর, কলিঙ্গ (বর্তমান উড়িষ্যা উপকূলে অবস্থিত) বিজয় করেন। এই যুদ্ধে একশ পনেরো হাজার মানুষ দ্বীপান্তরিত হল, একশো হাজার মানুষকে হত্যা করা হল এবং আরো অনেকে মারা গেল।

কলিঙ্গোর শাসন ব্যবস্থা গ্রহণ করার পর দেবনাম পিয় ধম্মের অধ্যয়ন করেন। ধম্মকে জীবনের ব্রত হিসাবে গ্রহণ করেন। জনগণকে ধম্মের মাধ্যমে চলার জন্য উপদেশ দিলেন। কলিঙ্গ বিজয়ের পর দেবনাম পিয়ের এই ছিল অনুশোচনা।

এটি দেবনামপিয়ার কাছে অত্যন্ত বেদনাদায়ক এবং দুর্ভাগ্যজনক হিসাবে বিবেচিত হয় যে, যখন কেউ একটি দেশ বিজয় করে তখন সেই দেশের জনগণকে জবাই, মৃত্যু এবং নির্বাসনের মাধ্যমেই সে বিজয়ী হয়।

➲ আলোচনা করো...

মানচিত্র 2 দেখো এবং অশোকের শিলালিপিগুলোর অবস্থান আলোচনা করো। তুমি কোনো নিদর্শন লক্ষ কর কি?

যদি আমরা অশোকের শিলালিপিগুলো দেখি তাহলে এই ধরনের কিছু সমস্যার প্রমাণ পাই (উৎস 11) - যা প্রায়শই শাসকের যন্ত্রণাকে প্রতিফলিত করার পাশাপাশি যুদ্ধের প্রতি তার দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন চিহ্নিতকরণ হিসাবে ব্যাখ্যা করা হয়। যেমনটি আমরা দেখতে পাব, যদি শিলালিপিটি পড়ে আমরা এর আক্ষরিক অর্থ বুঝতে না পারি তাহলে পরিস্থিতি আরও জটিল হয়ে ওঠে।

বর্তমান ওড়িশায় অশোকের যে শিলালিপিগুলো পাওয়া গেছে যেগুলোতে কোনো যন্ত্রণার চিত্র ফুটে উঠেনি। অন্যভাবে বলা যায়, যে অঞ্চলটিতে অশোক জয়লাভ করেছিল, সেই অঞ্চলে শিলালিপিটি পাওয়া যায় নি। আমরা এটা থেকে কী বুঝতে পারি? এটি কি এমন যে সাম্প্রতিক বিজয়ের যন্ত্রণা এই অঞ্চলে খুব বেদনাদায়ক ছিল এবং তাই শাসক বিষয়টি উল্লেখ করতে অক্ষম ছিলেন?

৪. শিলালিপি প্রমাণের সীমাবদ্ধতা

এখন সম্ভবত এটি স্পষ্টতই প্রমাণিত হয়েছে যে শিলালিপি ঘটনা প্রকাশ করতে পারে, তারও সীমাবদ্ধতা রয়েছে। কখনও কখনও, প্রযুক্তিগত সীমাবদ্ধতা আছে : চিঠিগুলো খুব অদ্ভুতভাবে খোদাই করা হয়েছে এবং এইভাবে পুনর্গঠনগুলো অনিশ্চিত হয়ে গেল। এছাড়াও, শিলালিপিগুলো ক্ষতিগ্রস্থ হতে পারে বা চিঠিগুলোও উধাও হয়ে যেতে পারে। পাশাপাশি, শিলালিপিতে ব্যবহৃত শব্দের সঠিক অর্থ সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়া সর্বদা সহজ নয়, যা কয়েকটি নির্দিষ্ট জায়গা বা সময়ের সাথে নির্দিষ্ট হয়ে থাকে। তোমরা যদি এপিগ্রাফিকাল জার্নালটি (লিপিতাত্ত্বিক সাময়িক পত্রিকা) পড়, তবে তোমরা বুঝতে পারবে যে ঐতিহাসিকরা ক্রমাগত লিপি পাঠোদ্ধার করার বিকল্প উপায়গুলো নিয়ে নিয়মিত বিতর্ক এবং আলোচনা করছেন। যদিও বিভিন্ন প্রকারের সহস্র শিলালিপির সন্ধান পাওয়া গেছে কিন্তু এইগুলোর পাঠোদ্ধার, প্রকাশ ও অনুবাদ করা এখনো সম্ভব হয়নি। এছাড়াও, আরো অনেক শিলালিপির অস্তিত্ব রয়েছে, যেগুলো সময়ের বিপর্যয়ের হাত থেকে রক্ষা করা যায়নি, সুতরাং, বর্তমানে যা পাওয়া যায় সম্ভবত যেটি খোদাই করা ছিল কেবল তার একটি ভগ্নাংশমাত্র।

সম্ভবত আরও একটি মৌলিক সমস্যা ছিল। শিলালিপিতে এমন কিছু লিপিবদ্ধ ছিল না, যা আমরা রাজনৈতিক বা অর্থনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে গুরুত্বপূর্ণ হিসাবে বিবেচনা করতে পারি। উদাহরণস্বরূপ, নিয়মমাফিক কৃষি অনুশীলন এবং দৈনন্দিন জীবনের সুখ দুঃখের বিষয়গুলো শিলালিপিতে উল্লেখ ছিল না, যেগুলো প্রায়শই বিখ্যাত ঘটনাগুলোর কেন্দ্রবিন্দু ছিল। এছাড়াও শিলালিপিগুলোর বিষয়বস্তু প্রায় অদৃশ্যভাবে সেই ব্যক্তির দৃষ্টিভঙ্গিকে প্রসারিত করে যা তাদেরকে পরিচালনা করে। সেই হিসাবে, অতীতকে আরও ভালো বোঝার জন্য তাদের কাছে অন্যান্য দৃষ্টিকোণগুলোও পাশাপাশি থাকা দরকার।

সুতরাং, শুধু এপিগ্রাফিক (লিপি) রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক ইতিহাসকে সম্পূর্ণভাবে বোঝার উপাদান হিসাবে গ্রহণ করা যায় না। এছাড়াও, ইতিহাসবিদ্‌রা প্রায়শই পুরোনো এবং নতুন প্রমাণ, উভয়ই নিয়ে প্রশ্ন তোলেন। ঊনিশ শতকের শেষ ভাগ এবং বিংশ শতাব্দীর প্রথমদিকে পণ্ডিতরা মূলত রাজাদের ইতিহাসে আগ্রহী ছিলেন। বিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি থেকে অর্থনৈতিক পরিবর্তন এবং বিভিন্ন সামাজিক গোষ্ঠীগুলোর উত্থানের মতো বিষয়গুলো আরও অনেক বেশি গুরুত্ব পেয়েছিল। সাম্প্রতিক দশকে প্রান্তিক গোষ্ঠীর ইতিহাস নিয়ে অনেক বেশি ব্যস্ততা দেখা গেছে। এটি সম্ভবত পুরানো উৎসগুলোর নতুনভাবে তদন্ত এবং বিশ্লেষণের নতুন কৌশলগুলোর বিকাশের দিকে পরিচালিত করবে।

চিত্র 2.13
কর্ণাটক থেকে একটি তাম্র শাসন শিলালিপি। খ্রিস্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দী।

সময় তালিকা 1
প্রধান রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক উন্নয়ন

600-500 খ্রিস্ট পূর্বাব্দ	ধানরোপন ; গঙ্গা উপত্যকায় নগরায়ণ, মহাজনপদ; ছাপাঙ্কিত মুদ্রার প্রচলন।
500-400 খ্রিস্ট পূর্বাব্দ	মগধের শাসকদের ক্ষমতা দৃঢ়করণ।
327-325 খ্রিস্ট পূর্বাব্দ	মেসিডনের রাজা আলেকজাণ্ডারের ভারত অভিযান।
321 খ্রিস্ট পূর্বাব্দ	চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যের সিংহাসন আরোহন।
272/268-231 খ্রিস্ট পূর্বাব্দ	অশোকের রাজত্বকাল।
185 খ্রিস্ট পূর্বাব্দ	মৌর্য সাম্রাজ্যের সমাপ্তি।
200-100 খ্রিস্ট পূর্বাব্দ	উত্তর-পশ্চিমে ইন্দো-গ্রিকদের শাসন : দক্ষিণ ভারতে চৌল, চেরাস এবং পাণ্ডুদের শাসন; দাক্ষিণাত্যে সাতবাহনদের শাসনকাল।
100 খ্রিস্ট পূর্বাব্দ-200 খ্রিস্টাব্দ	উত্তর-পশ্চিমে শক্ (মধ্যএশিয়া থেকে আগত জনগণ) শাসকরা রোমান বাণিজ্য, স্বর্ণমুদ্রার প্রচলন।
78 খ্রিস্টাব্দ	কণিষ্কের সিংহাসন আরোহণ।
100-200 খ্রিস্টাব্দ	প্রাচীন শিলালিপিতে সাতবাহন এবং শক্ শাসকদের জমি/ভূমিদানের প্রমাণ।
320 খ্রিস্টাব্দ	গুপ্ত শাসনের শুরু / আরম্ভ।
335-375 খ্রিস্টাব্দ	সমুদ্রগুপ্তের শাসনকাল।
375-415 খ্রিস্টাব্দ	দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের শাসনকাল : দাক্ষিণাত্যে বাকাটকসদের শাসনকাল।
500-600 খ্রিস্টাব্দ	কর্ণাটকে চালুক্যদের উত্থান এবং তামিলনাড়ুতে পল্লবদের উত্থান।
606-647 খ্রিস্টাব্দ	কনৌজের রাজা হর্ষবর্ধনের রাজত্বকাল : চিনা তীর্থযাত্রী জুয়ান জাং বৌদ্ধ গ্রন্থগুলোর সন্ধানে ভারতে আসেন।
712	আরবদের সিন্ধু বিজয়।

(বিঃ দ্রঃ - সঠিকভাবে অর্থনৈতিক অগ্রগতির তারিখ নির্ধারণ করা কঠিন। এছাড়াও, প্রচুর উপমহাদেশীয় বৈচিত্র্য রয়েছে , যা সময় রেখায় নির্দেশিত হয়নি। নির্দিষ্ট বিকাশের জন্য শুধুমাত্র প্রাথমিকতম তারিখগুলো দেওয়া হয়েছে। কনিষ্কের সিংহাসন আরোহণের তারিখ নির্দিষ্ট নয় এবং এটি একটি ‘ ?’ দিয়ে চিহ্নিত করা হয়েছে।)

সময় তালিকা 2
লিপির মুখ্য অগ্রগতি

অষ্টাদশ শতাব্দী	
1784 খ্রিস্টাব্দ	এশিয়াটিক সোসাইটির প্রতিষ্ঠা (বাংলায়)
ঊনবিংশ শতাব্দী	
1810-এ	কলিন ম্যাকেনজি সংস্কৃত এবং দ্রাবিড় ভাষায় 8,000টিরও বেশি শিলালিপি সংগ্রহ করেন।
1838	জেমস প্রিন্সেপ দ্বারা অশোকের ব্রাহ্মীলিপির পাঠোদ্ধার।
1877	আলেকজাণ্ডার কানিংহাম দ্বারা অশোকের শিলালিপি প্রকাশ।
1886	দক্ষিণ ভারতীয় শিলালিপিগুলোর একটি সাময়িক পত্রিকা এপিগ্রাফিয়া কারণাটিকার প্রথম সংখ্যা।
1888	এপিগ্রাফিয়া ইন্ডিকার প্রথম সংখ্যা প্রকাশ।
বিংশ শতাব্দী :	
1965-66	ডি.সি. স্যারকার দ্বারা ভারতীয় এপিগ্রাফি প্রকাশ এবং ভারতীয় এপিগ্রাফির শব্দ কোশ প্রকাশ।

100-150 শব্দের মধ্যে উত্তর দাও

1. প্রাচীন ঐতিহাসিক শহরগুলোতে উৎপাদিত শিল্প নৈপুণ্যের প্রমাণগুলো আলোচনা করো। কোন্ কোন্ দিক দিয়ে এগুলো হরপ্পা সভ্যতা থেকে পৃথক?
2. মহাজনপদের বৈশিষ্ট্যগুলো আলোচনা করো।
3. ইতিহাসবিদ্‌রা কীভাবে সাধারণ মানুষের জীবন পুনর্গঠন করেছেন?
4. দানগুণা গ্রামে উৎপাদিত জিনিসগুলোর সাথে পাণ্ড্যয়ন প্রধানকে (উৎস 3) দেওয়া জিনিসের তালিকার তুলনামূলক আলোচনা করো (উৎস 8), তুমি কি কোনো মিল বা পার্থক্য লক্ষ করেছ?
5. এপিগ্রাফিস্টরা (লিপিকাররা) যে যে সমস্যার সম্মুখীন হয়েছিলেন সেগুলোর একটি তালিকা তৈরি করো।

নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলোর একটি সংক্ষিপ্ত রচনা লেখো (500 শব্দের মধ্যে) :

6. মৌর্য সাম্রাজ্যের প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলো আলোচনা করো। তুমি যে অশোকের শিলালিপিগুলো অধ্যয়ন করেছ সেগুলোর মধ্যে কোন্ উপাদানটি স্পষ্ট বলে মনে হয়?

7. বিংশ শতাব্দীর সর্বজন পরিচিত এফিগ্রাফিস্ট ডি.সি. স্যারকরে বলেছেন, "ভারতীয়দের জীবন, সংস্কৃতি এবং ক্রিয়াকলাপের এমন কোনো দিক নেই যা শিলালিপিতে প্রতিফলিত হয় নি।" — আলোচনা করো।

8. মৌর্য পরবর্তী সময়ে যে জাতিগুলো রাজত্ব করেছিল তাদের বর্ণনা দাও।

9. বর্ণিত সময়ে কৃষিক্ষেত্রে কী কী পরিবর্তন হয়েছিল?

মানচিত্রের কাজ

10. মানচিত্র 1 এবং 2-এর মধ্যে তুলনা করো এবং মৌর্য সাম্রাজ্যের অধীনে যে যে মহাজনপদগুলো ছিল তার একটি তালিকা তৈরি করো। অশোকের কোনো শিলালিপি এই অঞ্চলগুলোতে পাওয়া গিয়েছিল কি?

প্রকল্প : (যে-কোনো একটি)

11. এক মাসের খবরের কাগজ সংগ্রহ করো। সরকারি কাজ সম্পর্কে সরকারি কর্মকর্তাদের দেওয়া সমস্ত বক্তব্য কেটে পেস্ট করো। এই জাতীয় প্রকল্পগুলোর জন্য উৎসগুলো সম্পর্কে রিপোর্টগুলো কী বলেছে তা নোট করো। কীভাবে উৎসগুলো এবং প্রকল্পের উদ্দেশ্য সংঘবদ্ধ হয়েছে? কে এই বিবৃতি জারি করে এবং কীভাবে? কেন তারা এটা জারি করেছিল? এই অধ্যায়ে যে সব শিলালিপিগুলোর বর্ণনা করা হয়েছে তার সাথে এগুলোর তুলনা করো। এগুলোর মধ্যে কী কী সাদৃশ্য এবং কী কী বৈসাদৃশ্য তুমি লক্ষ করেছ?

12. বর্তমানে প্রচলিত পাঁচটি বিভিন্ন ধরনের নোট এবং মুদ্রা সংগ্রহ করো। এর প্রত্যেকটির মধ্যে তুমি সম্মুখ ভাগে এবং বিপরীত ভাগে (সামনে এবং পিছনে) কী দেখেছ তা বর্ণনা করো। এর থেকে সাধারণ বৈশিষ্ট্যগুলোর একটি রিপোর্ট তৈরি করো। ঠিক একইভাবে বিভিন্ন ছবি, লিপি, ভাষা, আকার, আকৃতি এবং অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ উপাদান যেগুলো তুমি খুঁজে পেয়েছ তারও একটি রিপোর্ট তৈরি করো। এই অধ্যায়ে দেখানো মুদ্রাগুলোর সাথে এগুলোর তুলনা করো। ব্যবহৃত উপকরণ, টাকশাল করার কৌশল, দৃশ্যমান প্রতীক এবং তাদের তাৎপর্য এবং মুদ্রাগুলোর সম্ভাব্য কার্যকরি বিষয়গুলো নিয়ে আলোচনা করো।

যদি তুমি আরও কিছু জানতে চাও তাহলে এগুলো পড়ো :

D.N. Jha. 2004.
Early India: A Concise History.
Manohar, New Delhi.

R. Salomon. 1998.
Indian Epigraphy. Munshiram Manoharlal Publishers Pvt. Ltd, New Delhi.

R.S. Sharma. 1983.
Material Culture and Social Formation in Early India.
Macmillan, New Delhi.

D.C. Sircar. 1975.
Inscriptions of Asoka.
Publications Division, Ministry of Information and Broadcasting, Government of India, New Delhi.

Romila Thapar. 1997.
Asoka and the Decline of the Mauryas. Oxford University Press, New Delhi.

আরও বেশি তথ্য জানার জন্য তুমি নিম্নলিখিত ওয়েবসাইট দেখো :

http://projectsouthasia.sdstate.edu/Docs/index.html

বিষয়বস্তু
তিন

সম্পর্ক, বর্ণ এবং শ্রেণি

প্রারম্ভিক সমাজ
(আনুমানিক 600 খ্রি. পূ. থেকে 600 খ্রীষ্টাব্দে)

আগের অধ্যায়ে আমরা দেখেছি যে, আনুমানিক 600 খ্রিস্ট পূর্বাব্দ থেকে 600 খ্রিস্টাব্দের মধ্যবর্তী সময়ে অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক জীবনে অনেক পরিবর্তন সাধিত হয়েছে। এর মধ্যে কিছু কিছু পরিবর্তন তৎকালীন সমাজকেও প্রভাবিত করেছিল। উদাহরণস্বরূপ, বনাঞ্চলে কৃষির প্রসার ঘটে, যার ফলে বনাঞ্চলে বসবাসকারী লোকেদের জীবন জীবিকারও পরিবর্তন সাধিত হয়। বিশেষ সামাজিক গোষ্ঠী হিসেবে কারুশিল্পীদের উদয় হয়। এছাড়া সম্পত্তির অসমান বণ্টন, সামাজিক বৈষম্যকে প্রখর করে তোলে।

ঐতিহাসিকরা এইসব প্রক্রিয়াকে অনুধাবন করার জন্য প্রায়শই সাহিত্যিক পরম্পরার সাহায্য নেন। কিছু গ্রন্থ সামাজিক আচরণের মানদণ্ড নির্ধারণ করে। অন্যান্য গ্রন্থসমূহ বিবিধ সামাজিক পরিস্থিতি এবং রীতিনীতির বর্ণনা করে এবং অনেক সময় এইগুলোর উপর মন্তব্যও করে। শিলালিপিগুলো থেকে আমরা সমাজের কিছু অভিনেতাদের ঝলক পাই। আমরা আরোও দেখব যে, প্রতিটি গ্রন্থ (এবং শিলালিপি) নির্দিষ্ট কোনো সামাজিক গোষ্ঠীর দৃষ্টিকোণ থেকে রচনা করা হত। অতএব এই জিনিসটি আমাদের মনে রাখা প্রয়োজন যে, এই গ্রন্থগুলো কে লিখেছেন এবং কাদের জন্য রচনা করা হত। আমাদের এই বিষয়েও লক্ষ করা প্রয়োজন যে, এই গ্রন্থগুলোর রচনাতে কোন্ ভাষার ব্যবহার করা হয়েছে এবং এইগুলোর প্রচার প্রসার কীভাবে হয়েছে। গ্রন্থগুলোকে আমরা যত্ন সহকারে লক্ষ করলে দেখব, সেগুলো থেকে আমরা সমাজে প্রচলিত আচার ব্যবহার ও রীতি নীতিগুলো সম্পর্কে জানতে পারি, যেগুলো সামাজিক ইতিহাসকে রূপদান করেছিল।

চিত্র 3.1
পশ্চিমবঙ্গ হতে প্রাপ্ত আনুমানিক সপ্তদশ শতকের একটি পোড়া মাটির মূর্তি মহাভারতের একটি দৃশ্য বর্ণিত হয়েছে।

আমরা উপমহাদেশের অন্যতম একটি সমৃদ্ধশালী গ্রন্থ মহাভারতের দিকে আলোকপাত করতে পারি, মহাকাব্যটি তার বর্তমান রূপে 100,000 এরও বেশি শ্লোকের মাধ্যমে তৎকালীন সামাজিক শ্রেণি এবং তাদের অবস্থাকে বর্ণনা করে। এই গ্রন্থটিকে রচনা করতে প্রায় 1,000 বছরেরও বেশি সময় লাগে (আনুমানিক 500 খ্রি:পূ: হতে), মহাভারত গ্রন্থের কিছু কাহিনি সম্ভবত সমাজে অনেক আগে থেকেই প্রচলিত ছিল, যেগুলো পরবর্তী সময়ে গ্রন্থটির মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হয়। মহাভারতের মুখ্য

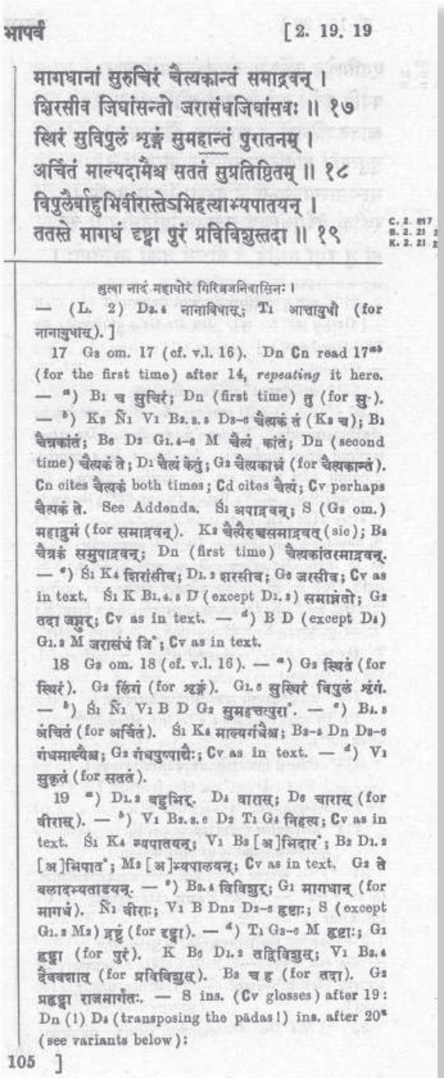
भापर्व [2. 19. 19

मागधानां सुरुचिरं चैत्यकान्तं समाद्रवन् ।
शिरसीव जिघांसन्तो जरासंधजिघांसवः ॥ १७
स्थिरं सुविपुलं शृङ्गं सुमहान्तं पुरातनम् ।
अर्चितं माल्यदामैश्च सततं सुप्रतिष्ठितम् ॥ १८
विपुलैर्बाहुभिर्वीरास्तेऽभिहत्याभ्यपातयन् ।
ततस्ते मागधं दृष्ट्वा पुरं प्रविविशुस्तदा ॥ १९

— (L. 2) $D_{3.4}$ नानाविधास्; T_1 आचायुधौ (for नानायुधास्).]

চিত্র 3.2

মহাভারতের সমালোচনাত্মক পৃষ্ঠার একটি খণ্ড। বড়ো মোটা অক্ষরে ছাপাখণ্ডটি, মূলগ্রন্থের একটি অংশ। বিভিন্ন পাণ্ডুলিপিতে বিদ্যমান বৈচিত্র্যগুলো ছোটো আকারের ছাপা, যেগুলোকে খুব যত্ন সহকারে তালিকাভুক্ত করা হয়েছিল।

কাহিনিটি দুইটি পরিবারের মধ্যে হওয়া যুদ্ধ বিগ্রহের উপর ভিত্তি করে রচিত। এই গ্রন্থের কিছু অংশে বিভিন্ন সামাজিক গোষ্ঠীর জন্য আচার ব্যবহারের নিয়মকানুনও রয়েছে। কখনো কখনো (কিন্তু সব সময় নয়) এই গ্রন্থের মুখ্য চরিত্রগুলোকে এই সকল সামাজিক রীতিনীতিগুলোর অনুসরণ করতে দেখা যায়। নিয়মকানুন তথা রীতি-নীতিগুলো অনুসরণ বা তাদের অবহেলা কীসের ইঙ্গিত করে?

1. মহাভারতের সমালোচনাত্মক সংস্করণ

1919 সালে একজন প্রখ্যাত ভারতীয় সংস্কৃত শাস্ত্র পণ্ডিত ভি.এস. সুকথাঙ্কর-এর তত্ত্বাবধানে অত্যন্ত এক উচ্চাকাঙ্ক্ষী প্রকল্পের সূচনা হয়। প্রায় 12 জন পণ্ডিতের একটি দল মিলিতভাবে মহাভারতের সমালোচনাত্মক সংস্করণের কাজ শুরু করেন। এর সাথে জড়িত কাজগুলো কী কী ছিল? প্রথমদিকে এর অর্থ ছিল, দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে বিভিন্ন রকমের লিপিতে লিখিত মহাভারতের সংস্কৃত পাণ্ডুলিপিগুলোকে সংগ্রহ করা।

প্রত্যেক পাণ্ডুলিপি থেকে পাওয়া শ্লোকগুলোকে তুলনা করার একটি পদ্ধতি তাঁরা খুঁজে বের করেন। শেষপর্যন্ত, তাঁরা এমন শ্লোকগুলো নির্বাচিত করেন, যেগুলো অধিকাংশ সংস্করণে পাওয়া যায় এবং সেগুলোকে কয়েকটি খণ্ডে প্রায় 13,000 পৃষ্ঠায় প্রকাশ করেন। গ্রন্থ রচনার এই কাজটি সম্পূর্ণ করতে 47 বছর সময় লাগে। এই পুরো প্রক্রিয়াটিতে দুটো বিষয় স্পষ্ট হয়ে উঠে। প্রথমত: সংস্কৃত ভাষায় লিখিত সংস্করণগুলোতে অনেক মিল খুঁজে পাওয়া যায়। এছাড়া সমস্ত উপমহাদেশ জুড়ে যেমন : উত্তরের কাশ্মীর হতে নেপাল এবং দক্ষিণের কেরল হতে তামিলনাডু পর্যন্ত প্রাপ্ত সমস্ত পাণ্ডুলিপিগুলোতেও এই মিল খুঁজে পাওয়া যায়। দ্বিতীয়ত, বহু শতাব্দী ধরে মহাভারত প্রচারিত হতে থাকায় এর মধ্যে অনেক আঞ্চলিক বিভিন্নতা স্পষ্ট হয়ে উঠে। এই সকল ভিন্নতাগুলোর সংস্কলন মূলগ্রন্থের পাদটীকা এবং পরিশিষ্টের মধ্যে লিপিবদ্ধ করা হয়েছিল। এই 13,000 পৃষ্ঠার মধ্যে অর্ধেকেরও বেশি অংশে এই বিভিন্নতাগুলোকে বর্ণনা করা হয়েছে।

এই দিক থেকে আমরা যদি লক্ষ করি তবে দেখব যে, এইসব প্রভেদগুলো জটিল প্রক্রিয়ার প্রতিফলন, যেগুলো প্রাথমিক (এবং পরবর্তী) সামাজিক ইতিহাসগুলোকে প্রভাবশালী ঐতিহ্য এবং সহজসরল স্থানীয় চিন্তাধারণা ও রীতিনীতির মধ্যে সংলাপের মাধ্যমে রূপদান করেছিল। এই সংলাপগুলোতে দ্বন্দ্বের সাথে সাথে ঐক্যমতও পাওয়া যায়।

আমরা এই প্রক্রিয়াগুলো প্রাথমিকভাবে ঐ সমস্ত সংস্কৃত গ্রন্থ থেকে জানতে পারি, যেগুলোকে ব্রাহ্মণরা নিজেদের জন্য রচনা করেছিল। ঊনবিংশ এবং বিংশ শতাব্দীর ঐতিহাসিকেরা প্রথম বছরের মতো যখন সামাজিক ইতিহাসের বিষয় তথা সমস্যাগুলোকে খুঁজে বের করে, তখন তারা এটা ভেবে ঐ গ্রন্থগুলোর আক্ষরিক অর্থ গ্রহণের পক্ষপাতী ছিলেন যে, এই গ্রন্থগুলোর

মধ্যে যা কিছুই লেখা হয়েছে, বাস্তবে তা পালন করা হয়। পরবর্তী সময়ে পন্ডিতেরা পালি, প্রাকৃত এবং তামিল ভাষায় রচিত অন্যান্য সাহিত্যিক পরম্পরাগুলোর অধ্যয়ন শুরু করে। এই অধ্যয়নের ফলে এটা স্পষ্ট হয় যে, সামগ্রিকভাবে আদর্শ স্থাপনকারী সংস্কৃত গ্রন্থগুলোকে সাধারণভাবে নির্ভরযোগ্য বলে মনে করা হত। আদর্শ স্থাপনকারী সংস্কৃত গ্রন্থগুলোকে প্রশ্নসূচক দৃষ্টিভঙ্গিতেও দেখা হত এবং কখনো কখনো এইগুলোকে অগ্রাহ্যও করা হত। ঐতিহাসিকেরা কীভাবে সামাজিক ইতিহাস পুনর্নির্মাণের চেষ্টা করেছে। এই বিষয়টি আমাদের স্মরণ রাখা প্রয়োজন।

পরিবার এবং আত্মীয়তার জন্য ব্যবহৃত শব্দাবলি

সংস্কৃত গ্রন্থে ‘কূল’ শব্দটি পরিবার বোঝানোর জন্য ব্যবহৃত হয় এবং জ্ঞাতি’ শব্দটি স্বজাতির একটি বৃহৎ পরিসরের জন্য ব্যবহৃত হয়। সংস্কৃত ভাষায় ব্যবহৃত ‘বংশ’ শব্দটি কোনো পরিবারের পূর্বসূরীদের একত্রিত সমষ্টিকে বোঝাতে।

2. আত্মীয়তা এবং বিবাহ
বিবিধ নিয়মকানুন এবং প্রয়োগের বিভিন্নতা

2.1 পরিবার সম্পর্কে তথ্যের খোঁজ

আমরা প্রায়শই পারিবারিক জীবনকে সহজেই স্বীকার করে থাকি। কিন্তু তোমরা লক্ষ করবে যে, সমস্ত পরিবার একই রকমের হয় না। পরিবারের সদস্য সংখ্যা, একে অপরের সাথে তাদের সম্পর্ক এবং তাদের ক্রিয়াকলাপ ভিন্ন হয়। প্রায়শই একই পরিবারভুক্ত সদস্যরা খাবার এবং অন্যান্য জিনিসপত্র নিজেদের মধ্যে মিলে মিশে ব্যবহার করে। তারা একসাথে বসবাস করে এবং কাজকর্ম ও আচার অনুষ্ঠান একই সাথে সম্পাদন করে। পরিবার সাধারণত বড়ো একটি গোষ্ঠীর অংশ, যাদের আমরা আত্মীয় বলে থাকি। অথবা আমরা পরিভাষাগত শব্দের ব্যবহার করে আত্মীয়কে ‘স্বজাতি’ বলতে পারি। যদিও পারিবারিক বন্ধনগুলোকে প্রায়শই স্বাভাবিক ও রক্তের সম্পর্ক বলে ধরে নেওয়া হয়। তবুও এই সম্পর্কগুলোকে ভিন্নভাবে সংজ্ঞায়িত করা হয়। উদাহরণস্বরূপ, কিছু কিছু সমাজে খুড়তুতো ও পিসতুতো ভাই বোনদের সাথে রক্তের সম্পর্ক থাকে। অন্যদিকে অন্যান্য সমাজে এরকম কোনো সম্পর্ক থাকে না।

ঐতিহাসিকরা প্রারম্ভিক সমাজ ব্যবস্থায় অভিজাত পরিবারগুলো সম্পর্কে তথ্য অতি সহজেই উদ্ধার করতে পারেন। কিন্তু অতি সাধারণ লোকেদের পারিবারিক সম্পর্কগুলোকে পুনর্নির্মাণ করা, ঐতিহাসিকদের কাছে অনেক কঠিন। ঐতিহাসিকেরা পরিবার এবং আত্মীয়তা সম্পর্কিত বিচারধারাগুলোরও বিশ্লেষণ করেন। এইগুলোর বিশ্লেষণ তথা অধ্যয়ন করা অনেক গুরুত্বপূর্ণ, কারণ এর মাধ্যমে মানুষের চিন্তাচেতনা সম্পর্কে অনেক কিছু জানা যেত। সম্ভবত, এইসব বিচারধারা জনগণের ক্রিয়াকলাপকে রূপদান করে থাকবে, যেমনভাবে এই ক্রিয়াকলাপের ফলে তাদের দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন হয়ে থাকে।

পিতৃবংশানুক্রমিক ব্যবস্থার অর্থ হল, বংশ পরম্পরায় পৈত্রিক সম্পত্তি পিতা থেকে পুত্র, পুত্র থেকে পৌত্র, এরপর প্রপৌত্র প্রভৃতির মধ্যে হস্তান্তরিত হতে থাকা। *মাতৃবংশানুক্রমিক* শব্দটির ব্যবহার আমরা সাধারণত তখন করে থাকি, যখন কোনো বংশ পরম্পরা যা-এর সাথে জড়িত থাকে।

2.2 পিতৃবংশানুক্রমিক ব্যবস্থার আদর্শ :

আমরা কী সেই বিষয়গুলোকে চিহ্নিত করতে পারি, যখন আত্মীয়তা সম্পর্কের মধ্যে পরিবর্তন আসে? এই পর্যায়ে মহাভারতের কাহিনিগুলোও আত্মীয়তার উপরই রচিত। এই মহাকাব্যটিতে কৌরব ও পাণ্ডব-এই দুই পরিবারের মধ্যে

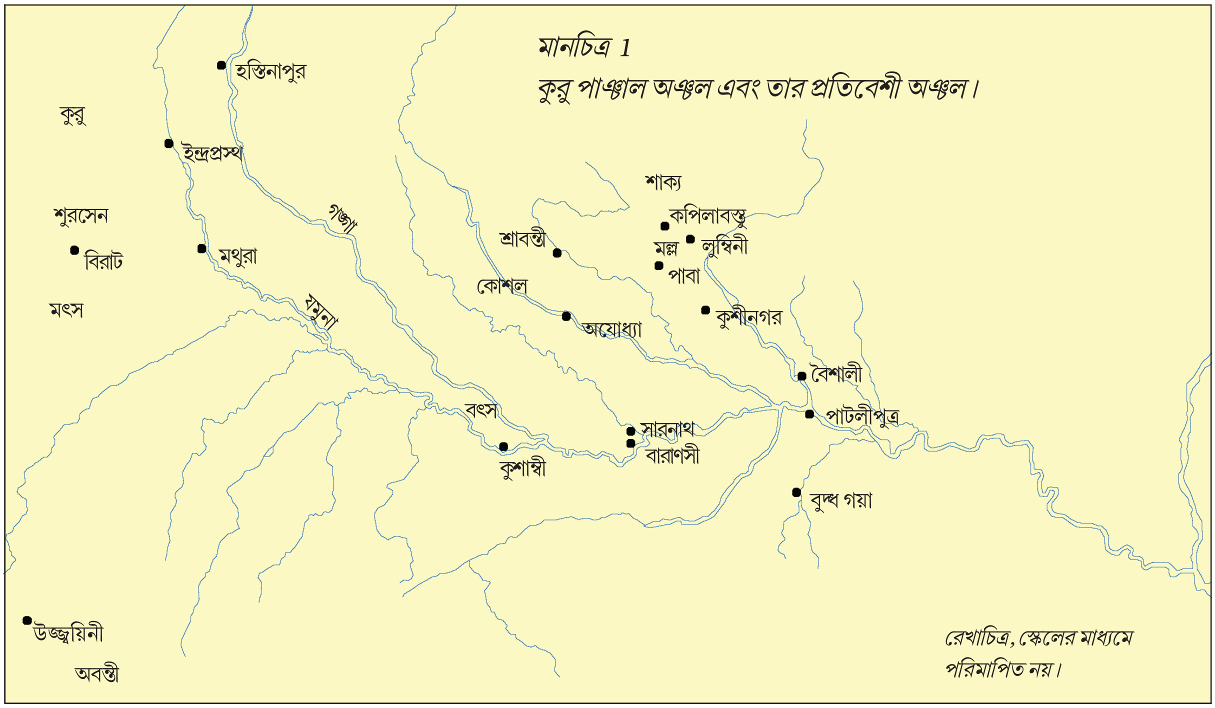

রাজ্য ও ক্ষমতা দখলের লড়াই-এর কথা বর্ণিত আছে। কুরু এবং পাণ্ডব এই দুই পরিবারই কুরু বংশের সাথে সম্পর্কিত ছিল, যাদের একটি জনপদের উপরই (অধ্যায়-2, মানচিত্র-1) শাসন ছিল। শেষ পর্যন্ত, এই পরিবারের মধ্যে চলতে থাকা দ্বন্দ্ব, যুদ্ধতে এসে সমাপ্ত হয়, যেখানে পাণ্ডবরা বিজয়ী হয়। এরপর পিতৃবংশানুক্রমিক উত্তরাধিকারের ঘোষণা হয়। যদিও পিতৃবংশীয় ব্যবস্থার কথা এই মহাকাব্য রচনার পূর্বেও বিদ্যমান ছিল। মহাভারত গ্রন্থের মূল কাহিনি এই ধারণাটিকে সুদৃঢ় করে যে, পিতৃবংশীয় ব্যবস্থা ছিল গুরুত্বপূর্ণ।

উৎস 1

সুসন্তানের জন্মদান

এখানে ঋগ্‌বেদ থেকে নেওয়া একটি মন্ত্রের উদ্ধৃতাংশ রয়েছে, যা সম্ভবত আনুমানিক 1000 খ্রিস্ট পূর্বাব্দে বিবাহ অনুষ্ঠান চলাকালীন পুরোহিতগণের উচ্চারণের জন্য এই মন্ত্র গ্রন্থে সন্নিবেশিত হয়। বর্তমানেও অনেক হিন্দু বিবাহে এই মন্ত্র ব্যবহৃত হয় :

আমি তাকে এখান থেকে মুক্ত করলাম। কিন্তু সেখান থেকে নয়। আমি সেখানে তাকে দৃঢ়ভাবে আবদ্ধ করেছি। যাতে ইন্দ্রের অনুগ্রহে তার উত্তম সন্তান লাভ হয় এবং স্বামীর ভালোবাসার সৌভাগ্য প্রাপ্ত হয়।

ইন্দ্র ছিলেন শৌর্য, যুদ্ধ এবং বৃষ্টির একজন প্রধান দেবতা। "এখানে" বলতে 'পিতার' ঘর এবং "সেখানে" বলতে 'স্বামীর' ঘর বোঝানো হয়েছে।

➲ এই মন্ত্রের প্রসঙ্গে বর ও বধূর দৃষ্টিকোণ থেকে বিবাহের তাৎপর্যসমূহ আলোচনা করো। এই তাৎপর্য্যগুলো কি একই রকম, নাকি কোনো পার্থক্য রয়েছে?

উৎস 2

আত্মীয় পরিজনদের মধ্যে কলহের কারণ কী?

এই উদ্ধৃতাংশ সংস্কৃত মহাভারতের আদি পর্ব (আক্ষরিক অর্থে প্রথম খণ্ড) থেকে নেওয়া যেখানে কৌরব ও পাণ্ডবদের মধ্যে সংঘর্ষের সূত্রপাতের কারণ বর্ণনা করা হয়েছে : কৌরবরা ছিল ... ধৃতরাষ্ট্রের পুত্র এবং পাণ্ডবরা .... ছিল তাদের জ্ঞাতি ভাই। যেহেতু ধৃতরাষ্ট্র অন্ধ ছিলেন, তার ছোটো ভাই পাণ্ডু হস্তিনাপুরের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হন (মানচিত্র -2 দেখো) ... যদিও পাণ্ডুর অকাল মৃত্যুর পর ধৃতরাষ্ট্র রাজা হন, কারণ সকল রাজপুত্রদেরই বয়স তখন কম ছিল। রাজপুত্রদের বয়স বৃদ্ধির সাথে সাথে, হস্তিনাপুরের জনগণ পাণ্ডবদের প্রতি পক্ষপাত প্রকাশ করতে থাকে কেননা কৌরবদের থেকে তারা অধিক দক্ষ ও ন্যায় পরায়ণ ছিল যার ফলে জ্যেষ্ঠ কৌরব দুর্যোধন ঈর্ষান্বিত হয়ে পড়ে। সে তার পিতাকে বলল "আপনি স্বয়ং অপূর্ণতার দরুণ সিংহাসনে বসতে পারেন নি। যদিও আপনি পরে সেটির দায়িত্ব প্রাপ্ত হন। যদি পাণ্ডবরা পাণ্ডু থেকে উত্তরাধিকার লাভ করে তাহলে নিশ্চিতভাবে তাদের পুত্র, পৌত্র এবং প্রপৌত্ররাও এর উত্তরাধিকারী হবে। আমরা এবং আমাদের ছেলেরা এই রাজকীয় উত্তরাধিকার থেকে বেদখল হয়ে জগতের নজরে তুচ্ছ হিসাবে পরিগণিত হব"। এই ধরনের বর্ণনাগুলো আক্ষরিক অর্থে সত্যি নাও হতে পারে, কিন্তু এ থেকে আমরা একটি ধারণা পাই যে, লেখক কি চিন্তা করে এটি রচনা করেছিল। অনেক সময় এ সমস্ত ক্ষেত্রে পরস্পর বিরোধী বিচারধারা নিহিত থাকে।

➲ উদ্ধৃতাংশটি পড়ো এবং রাজা হওয়ার বিভিন্ন যোগ্যতাবলিকে তালিকাভুক্ত কর। এগুলোর মধ্যে, একটি বিশেষ পরিবারে জন্মলাভ কতটুকু গুরুত্বপূর্ণ ছিল? এগুলোর মধ্যে কোন্ নির্ণায়ক ব্যাপারটি যুক্তিযুক্ত বলে মনে হয়? এগুলোর মধ্যে এমন কোনো বিষয় আছে কি যা তোমার কাছে অনুচিত বলে মনে হয়?

পিতৃবংশানুক্রমিক ব্যবস্থায়, পিতার মৃত্যুর পর তার পুত্র (রাজ পরিবার সিংহাসন অর্জন করার ক্ষেত্রেও) সম্পত্তির উপর দাবি জানাতে পারত।

অধিকাংশ রাজবংশ (সম্ভবত খ্রিস্টপূর্ব ষষ্ঠ শতাব্দী থেকে) পিতৃবংশানুক্রমিক ব্যবস্থার অনুসরণ করত বলে মেনে নেওয়া হয়। যদিও এই ব্যবস্থার মধ্যে বিভিন্নতাও ছিল। কখনো কখনো রাজা সন্তানহীন হলে, তার সম্পত্তির উত্তরাধিকারী, অপর এক ভাই হয়ে যেত। আবার কখনো অন্যান্য আত্মীয় স্বজনেরাও রাজসিংহাসনের উপর দাবী করত। এছাড়া কিছু বিশেষ পরিস্থিতিতে মহিলারাও শাসন ক্ষমতার পরিচালনা করত, যেমন-প্রভাবতী গুপ্ত (অধ্যায়-2 এ দেখো)।

পিতৃবংশানুক্রমিকতার সঙ্গে সম্পৃক্ত শাসক পরিবারের কাছে অসাধারণ কিছু ছিল না। ঋগ্বেদের মতো শাস্ত্রীয় গ্রন্থগুলোর মন্ত্রে এটা স্পষ্ট। এটা সম্ভব যে, ব্রাহ্মণ সহ উচ্চ মর্যাদা সম্পন্ন ধনী পুরুষেরাও এই মনোভাব পোষণ করত।

বিবাহের প্রকারভেদ

অন্তর্বিবাহে (*Endogamy*) বৈবাহিক সম্পর্ক একই জ্ঞাতিগোষ্ঠী, একই বর্ণ অথবা একই স্থানে বসবাসকারী লোকেদের মধ্যে হয়ে থাকে।

অসবর্ণ বিবাহ (Exogamy) গোত্রের বাইরের বৈবাহিক সম্পর্ককে বোঝায়।

বহুবিবাহ (Polygyny) প্রথায় এক পুরুষের অনেক স্ত্রী থাকে।

বহুপতি (Polyandry) প্রথায় এক স্ত্রীর অনেক স্বামী থাকে।

উৎস 3

আট প্রকার বিবাহ

এখানে মনু স্মৃতিতে বর্ণিত প্রথম, চতুর্থ, পঞ্চম এবং ষষ্ঠ বিবাহ পদ্ধতির কথা বলা হয়েছে।

প্রথমঃ মূল্যবান বস্ত্রাদি পরিধান ও তার সাথে অলঙ্কারে সজ্জিত কন্যাকে বেদ শিক্ষায় শিক্ষিত এমন এক ব্যক্তির নিকট সম্প্রদান করা যাকে পিতা নিজে আমন্ত্রণ করেন।

চতুর্থ ঃ পিতা বর ও বধূকে এই বলে সম্বোধন করেন যে, "তোমরা একসাথে মিলে নিজেদের দায়িত্ব পালন কর" এবং এই বলে ইনি নিজের কন্যাকে সম্প্রদান করেন এবং উভয়কে সম্মান প্রদর্শন করেন।

পঞ্চমঃ বরের বধূ প্রাপ্তি তখনই সম্ভব যখন সে নিজ ক্ষমতা ও ইচ্ছানুসারে বধূ ও তার জ্ঞাতি গোষ্ঠীকে যথেষ্ট পরিমাণ ধন সম্পত্তি প্রদান করে।

ষষ্ঠ ঃ স্ত্রী এবং পুরুষের মধ্যে স্বেচ্ছায় মিলন .... যা তাদের প্রবল আকাঙ্ক্ষার ফলশ্রুতি ...।

➲ প্রত্যেক বিবাহ পদ্ধতিতে বিবাহের সিদ্ধান্ত কারা নিত তা আলোচনা করো:
(ক) পাত্রী
(খ) পাত্র
(গ) পাত্রীর পিতা
(ঘ) পাত্রের পিতা
(ঙ) অন্য যে-কোনো ব্যক্তি

2.3 বিবাহের নিয়মকানুন :

যেখানে পিতৃগোত্রকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য পুত্রের ভূমিকা ছিল গুরুত্বপূর্ণ সেক্ষেত্রে কন্যাদের পৃথক দৃষ্টিতে দেখা হত। পিতার সম্পত্তিতে তাদের কোনো অধিকার ছিল না। একই সময়ে, নিজের গোত্রের বাইরে তাদের বিবাহ দেওয়া কাম্য ছিল। একে বহির্বিবাহ প্রথা (exogamy) বলা হয়। এর অর্থ হল উচ্চ বংশের কম বয়সের মেয়ে এবং স্ত্রীলোকদের জীবন খুব সতর্কতার সাথে নিয়ন্ত্রণ করা হত, যাতে তাদের 'সঠিক' সময়ে এবং 'সঠিক' ব্যক্তির সাথে বিবাহ দেওয়া যায়। এর ফলে এই ধারণার উৎপত্তি হয় যে 'কন্যাদান' ছিল পিতার একটি গুরুত্বপূর্ণ ধর্মীয় কর্তব্য।

নতুন নগরসমূহের উত্থানের সাথে সাথে (অধ্যায় 2) সামাজিক জীবন অধিকতর জটিল হয়ে উঠে। নিজেদের উৎপাদিত পণ্যসামগ্রী ক্রয় বিক্রয়ের জন্য দূরের এবং কাছের লোকজন শহুরে পরিবেশে পরস্পরের সাথে মিলিত হত এবং নিজেদের মতামত বিনিময় করত। সম্ভবত এই কারণে পূর্বেকার বিশ্বাস ও রীতিনীতি (চতুর্থ অধ্যায় দেখো) নিয়ে প্রশ্নচিহ্ন উত্থাপিত হয়। এইসব প্রশ্নের সম্মুখীন হওয়ার দরুণ ব্রাহ্মণরা সমাজে বিস্তৃত আচার আচরণ চালু করেন। বিশেষত ব্রাহ্মণরা এবং সমাজের অন্যান্য অংশের জনগণের জন্য এই আচরণগুলো পালনীয় ছিল। আনুমানিক 500 খ্রিস্ট পূর্বাব্দ হতে এইসব নিয়মকানুনগুলো সংস্কৃত গ্রন্থে সংকলন হওয়া শুরু হয় এবং এই গ্রন্থগুলো ধর্মসূত্র ও ধর্মশাস্ত্র নামে পরিচিত। এদের মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হল 'মনুস্মৃতি' যার রচনাকাল আনুমানিক 200 খ্রিস্টপূর্ব হতে 200 খ্রিঃ মাঝামাঝি সময়।

যদিও এই গ্রন্থগুলোর ব্রাহ্মণ লেখকরা দাবি করত যে তাদের দৃষ্টিকোণ সর্বজনীন এবং তাদের তৈরি করা নিয়মকানুন প্রত্যেকেরই পালন করা দরকার। তবে বাস্তব সামাজিক সম্পর্ক তার থেকে আরও বেশি জটিল ছিল। তাছাড়া উপমহাদেশের আঞ্চলিক বৈচিত্র্যও যোগাযোগের অসুবিধার দরুণ ব্রাহ্মণদের প্রভাব সর্বব্যাপী ছিল না।

মজার ব্যাপার হল ধর্মসূত্র ও ধর্মশাস্ত্র আট প্রকার বিবাহের স্বীকৃতি দিয়েছে। এদের মধ্যে প্রথম চারটি 'উত্তম' মানা হত এবং বাকি চারটির নিন্দা করা হত। সম্ভবত এই বিবাহ পদ্ধতি ঐসব লোকেদের মধ্যে প্রচলিত ছিল যারা ব্রাহ্মণদের নিয়মকে অস্বীকার করত।

2.4 মহিলাদের *গোত্র*

প্রায় 100 খ্রিস্ট পূর্ব হতে চলে আসা একটি ব্রাহ্মণীয় রীতি অনুসারে জনগণকে (বিশেষ করে ব্রাহ্মণদের) গোত্র অনুসারে শ্রেণিবিভাগ করা হয়েছিল। প্রত্যেক গোত্র একজন বৈদিক ঋষির নামানুসারে হয়েছিল এবং একই গোত্রের অন্তর্গত লোকদের এই ঋষির বংশজ হিসাবে মানা হত। গোত্রের দুটি নিয়ম বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ : বিবাহের পর মহিলারা পিতার গোত্র ত্যাগ করে স্বামীর গোত্রকে

উৎস 4

শিলালিপি থেকে প্রাপ্ত সাতবাহন রাজাদের নাম

শিলালিপি থেকে সাতবাহন রাজাদের কয়েক প্রজন্মের নাম জানা যায়। লক্ষ করো এখানে সব নামের উপাধি 'রাজা'। তাছাড়া আরেকটি শব্দ লক্ষ করো 'পুত্র' শব্দ দ্বারা যার সমাপ্তি হয়। গৌতমী পুত্র শব্দটির অর্থ হল গৌতমীর ছেলে। গৌতম ও বশিষ্ঠের স্ত্রীলিঙ্গ হল গৌতমী এবং বসিথি। তারা উভয়েই বৈদিক ঋষি ছিলেন, যাদের নামানুযায়ী গোত্রের নামকরণ হয়।

রাজা গৌতমী — পুত্র সিরি - সাতকর্ণী

রাজা বসিথি — পুত্র (সামি) - সিরি - পুলুমারি

রাজা গৌতমী — পুত্র সামি - সিরি-যন-সাতকর্ণী

রাজা মাধারী — পুত্র স্বামী - শক সেন

রাজা বসিথি — পুত্র ছতরপন - সাতকর্ণী

রাজা হরিতি — পুত্র বিন হুকদ চতুকুলানন্দ - সাতকমান্ব

রাজা গৌতমী — পুত্র সিরি - বিজয়া - সাতকর্ণী

➲ এখানে কতজন গৌতমী পুত্র এবং কতজন বসিথি (বিকল্প বানান বসথি) পুত্রের নাম রয়েছে?

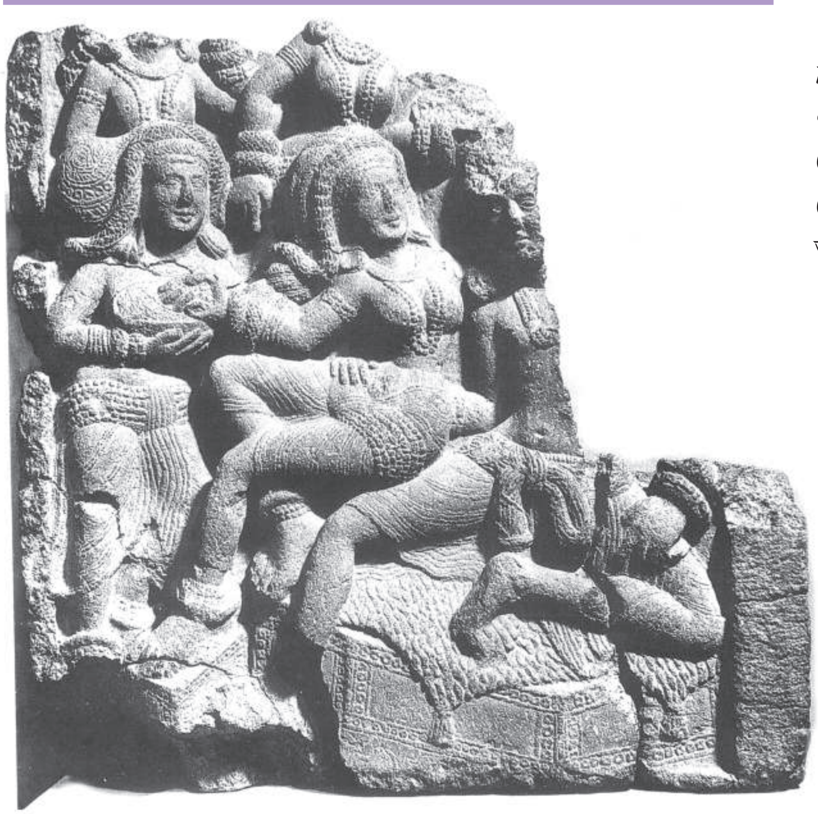

চিত্র 3.3
এক সাতবাহন রাজা এবং তার পত্নী।
বৌদ্ধ ভিক্ষুদের জন্য দান করা একটি গুহার দেওয়ালে খোদিত এক শাসকের দুষ্প্রাপ্য ভাস্কর্যগুলোর মধ্যে একটি চিত্র।

উপনিষদে মাতৃনাম

বৃহদারণ্যক উপনিষদ হল প্রাচীন উপনিষদগুলোর মধ্যে অন্যতম (চতুর্থ অধ্যায়ে দেখো), যাতে রয়েছে গুরু শিষ্যের ধারাবাহিক প্রজন্মের তালিকা, যাদের মধ্যে অনেককেই মাতার নামে অভিহিত করা হয়েছিল।

উৎস 5

এক মায়ের পরামর্শ

মহাভারতে বর্ণিত আছে যখন কৌরব ও পাণ্ডবদের মধ্যে যুদ্ধ অবশ্যম্ভাবী হয়ে উঠে তখন গান্ধারী তার জ্যেষ্ঠ পুত্র দুর্যোধনকে যুদ্ধ না করার অন্তিম আবেদন করেন :

শান্তি প্রতিষ্ঠা করে তুমি তোমার পিতা, আমাকে এবং তোমার শুভাকাঙ্ক্ষীদের সম্মান জানাবে ... জ্ঞানী ব্যক্তি নিজের ইন্দ্রিয়গুলো নিয়ন্ত্রণে রাখে এবং তিনি নিজ রাজ্যকেও রক্ষা করেন। লোভ এবং ক্রোধ একজন ব্যক্তিকে তার উন্নয়ন থেকে দূরে সরিয়ে রাখে। এই দুই শত্রুকে পরাজিত করে রাজা সমস্ত পৃথিবী জয় করতে পারে ... হে আমার পুত্র ! তুমি জ্ঞানী এবং ধীর পাণ্ডবদের সাথে আনন্দে এই পৃথিবী উপভোগ কর ... যুদ্ধের দ্বারা কোনো কিছু শুভ হয় না, না আইন কানুন (ধর্ম) এবং লাভ (অর্থ), সুখও দূরে সরে যায়, যুদ্ধের শেষে জয় হবে এটি জরুরী নয় ... যুদ্ধের মানসিকতা পরিত্যাগ করো। দুর্যোধন এই পরামর্শ শোনে নি এবং লড়াই করে হেরে যায়।

➲ প্রারম্ভিক ভারতীয় সমাজে মাতৃজাতিকে কী নজরে দেখা হত তার একটি ধারণা কি এই উদ্ধৃতাংশে পাওয়া যায়?

➲ আলোচনা করো...

বর্তমানে শিশুদের নামকরণ কীভাবে হয়ে থাকে? এই অধ্যায়ে আলোচিত নামকরণ পদ্ধতির সাথে বর্তমান পদ্ধতিগুলো কীরূপ সদৃশ অথবা ভিন্ন ?

গ্রহণ করত এবং সমগোত্রীয় সদস্যদের মধ্যে বিবাহ হত না।

এই নিয়মটি সাধারণভাবে অনুসরণ করা হত কিনা এটা দেখার জন্য পুরুষ ও মহিলাদের নামের বিচার করা হত সেগুলো মাঝে মধ্যে তাদের গোত্র থেকে উদ্ভূত ছিল। এই নামগুলো শক্তিশালী শাসক বংশ যেমন সাতবাহনদের কাছ থেকে পাওয়া যায়, যারা পশ্চিম ভারত ও দক্ষিণ ভারতের কিছু অংশে শাসন করত (আনুমানিক খ্রিস্ট পূর্ব দ্বিতীয় শতক হতে খ্রিস্টীয় দ্বিতীয় শতক পর্যন্ত)। সাতবাহনদের কিছু শিলালিপি খুঁজে পাওয়া গেছে যার দ্বারা ঐতিহাসিকগণ পারিবারিক বন্ধনের সন্ধান করতে সমর্থ হয়েছেন যার মধ্যে বিবাহ বন্ধনও রয়েছে। বেশ কিছু সাতবাহন রাজার একাধিক স্ত্রী ছিল। সাতবাহন রাজাদের সাথে বিবাহে আবদ্ধ মহিলাদের নামের বিশ্লেষণ এই তথ্যকেই ইঙ্গিত করে যে তাদের নাম গৌতম এবং বশিষ্ঠ গোত্র থেকে উদ্ভূত, যা ছিল তাদের পিতার গোত্র। এটা থেকে স্পষ্ট যে, বিবাহের পরও নিজের স্বামীর গোত্র গ্রহণ না করে তারা পিতার গোত্র অপরিবর্তিত রেখে দিয়েছিল। যা নাকি ব্রাহ্মণ্য রীতিনীতির পরিপন্থী। এটা আরও স্পষ্ট যে এদের মধ্যে কোনো কোনো মহিলা একই গোত্রের অন্তর্গত ছিল। এটাও স্পষ্ট যে এই ধরনের বিবাহ ব্রাহ্মণীয় গ্রন্থগুলোতে সুপারিশ করা অসবর্ণ বিবাহের পরিপন্থী ছিল।

সম্ভবত উপমহাদেশের অন্যান্য অংশে তারতম্য ছিল। তবে এখনও সুনির্দিষ্ট বিবরণ পাওয়া সম্ভবপর হয় নি।

2.5 মায়েরা কি গুরুত্বপূর্ণ ছিলেন?

আমরা দেখেছি সাতবাহন রাজারা মাতৃনাম (মাতার নাম থেকে উদ্ভূত) দ্বারা পরিচিতি লাভ করেছিলেন। যদিও এটা ইঙ্গিত করে যে মায়েরা গুরুত্বপূর্ণ

চিত্র 3.4

একটি যুদ্ধের দৃশ্য

অহিচ্ছত্রের (উত্তর প্রদেশ) একটি মন্দিরের প্রাচীরে উৎকীর্ণ আনুমানিক পঞ্চম শতাব্দীর পোড়ামাটির একটি ভাস্কর্য। 'মহাভারত'-এর সবচেয়ে প্রাচীন চিত্রিত মূর্তির মধ্যে একটি।

ছিলেন। তথাপি কোনো সিদ্ধান্তে পৌঁছানোর আগে আমাদের সতর্কতা অবলম্বন করা প্রয়োজন। সাতবাহন রাজাদের ক্ষেত্রে আমরা লক্ষ করেছি যে সিংহাসনের উত্তরাধিকার সাধারণত পিতৃগোত্রস্থ অনুযায়ী হত।

3. সামাজিক বৈষম্য : বর্ণ ব্যবস্থা গণ্ডীর ভিতরে এবং বাইরে

সম্ভবত তোমরা জাত শব্দটির সাথে পরিচিত, যা সামাজিক শ্রেণিসমূহের একটি পরিকাঠামোকে নির্দেশ করে। ধর্মসূত্র এবং ধর্মশাস্ত্রে এই আদর্শ ব্যবস্থার উল্লেখ রয়েছে। ব্রাহ্মণরা দাবি করত যে দৈবাদেশ মূলে ওই সমাজব্যবস্থায় তারা প্রথম স্থানে ছিল। শূদ্র এবং 'অস্পৃশ্য'দেরকে সমাজের নিচের স্তরে রাখা হয়েছিল। এই ব্যবস্থায় সামাজিক অবস্থান জন্মানুসারে নির্ধারিত করা হত।

3.1 'সঠিক' জীবিকা

ধর্মসূত্র এবং ধর্মশাস্ত্রে চার শ্রেণি বা বর্ণের আদর্শ 'জীবিকার' সঙ্গো যুক্ত কিছু নিয়ম রয়েছে। ব্রাহ্মণদের কাজ ছিল অধ্যয়ন করা, বেদ শিক্ষা দান, যজ্ঞানুষ্ঠান করা এবং করানো এবং দান দেওয়া ও গ্রহণ করা। ক্ষত্রিয়দের কাজ ছিল যুদ্ধ করা, মানুষকে সুরক্ষা প্রদান করা, ন্যায় বিচার তদারকি করা, বেদ অধ্যয়ন, যজ্ঞানুষ্ঠান করানো এবং দান দক্ষিণা করা, এগুলোর মধ্যে শেষ তিনটি কার্য বৈশ্যদের উপর ন্যস্ত ছিল। সেই সাথে তারা কৃষিকাজ, মেষপালন এবং ব্যবসা বাণিজ্য করত। শূদ্রদের মাত্র একটি জীবিকাই ছিল — ঐ তিন 'উচ্চ' বর্ণের সেবা করা। এই নিয়মগুলো পালনের জন্য ব্রাহ্মণেরা দুই তিনটি কৌশল প্রয়োগ করেছিল। প্রথমত, আমরা যা একটু আগেই দেখেছি তারা বলত যে বর্ণ ব্যবস্থা ছিল ঈশ্বর সৃষ্ট। দ্বিতীয়ত, তারা এই নিয়মগুলো নিজ রাজ্যে অনুসরণ করার জন্য শাসকদের উপদেশ দিত। তৃতীয়ত, তারা জনগণকে এটা বোঝানোর চেষ্টা করাত যে সামাজিক মর্যাদা জন্ম দ্বারা নির্ধারিত ছিল। যদিও ব্যাপারটি সর্বদা সহজ ছিল না। এই বিধান অনুসারে মহাভারতের এবং অন্যান্য গ্রন্থে বর্ণিত কাহিনির মাধ্যমে তারা এই উপদেশগুলোকে সুদৃঢ় করত।

3.2 অক্ষত্রিয় নৃপতিগণ

শাস্ত্র অনুসারে কেবল ক্ষত্রিয়রাই রাজা হতে পারবে। কিন্তু অনেক গুরুত্বপূর্ণ রাজবংশের উৎপত্তি সম্ভবত অন্য বর্ণ থেকে হয়েছিল। মৌর্যরা একটি বিশাল সাম্রাজ্য শাসন করেছিল, তাদের সামাজিক প্রেক্ষাপট ঘিরে বিতর্ক রয়েছে। পরবর্তীকালে বৌদ্ধ গ্রন্থগুলো থেকে জানা যায় যে তারা ক্ষত্রিয় ছিল, কিন্তু ব্রাহ্মণীয় শাস্ত্র তাদেরকে 'নিম্ন' জাতি বলে বর্ণনা করেছিল। মৌর্যদের উত্তরাধিকারী শুঙ্গা এবং কণ্বরাও ব্রাহ্মণ ছিল। বস্তুত রাজনৈতিক ক্ষমতা এমন

উৎস 6

এক দৈব ব্যবস্থা ?

তাদের দাবী প্রমাণ করার জন্য ব্রাহ্মণেরা প্রায়ই ঋগ্‌বেদে উল্লিখিত শ্লোক ও স্তবগান করতেন যা 'পুরুষসুক্ত' নামে পরিচিত। যাহাতে আদি মানবের বলিদানের কথা বর্ণনা করা আছে। চার বর্ণ সমেত বিশ্বের সকল উপাদান এই পুরুষদের শরীর থেকে উদ্‌গত হয়েছে। ব্রাহ্মণরা ছিল তার মুখ, ক্ষত্রিয়রা তার বাহু থেকে উদ্ভুত। তার উরু থেকে বৈশ্য এবং তার পা থেকে শূদ্রের জন্ম হয়েছে।

➲ ব্রাহ্মণেরা কেন এই শ্লোকগুলো প্রায়শই উচ্চারণ করত বলে তোমরা মনে কর?

উৎস 7

"যথাযথ" সামাজিক ভূমিকা

মহাভারতের আদি পর্বে একটি কাহিনি রয়েছে :

একদা দ্রোণ নামক জনৈক ব্রাহ্মণ, যিনি কুরু বংশের রাজকুমারদের ধনুর্বিদ্যা শেখাতেন, তাঁর নিকট একলব্য নামে এক শিকারী সম্প্রদায়ের বনবাসী নিষাদ এসেছিল। ধর্ম সম্পর্কে জ্ঞাত দ্রোণ, তাকে শিষ্য হিসাবে গ্রহণ করতে অস্বীকার করেন। ফলস্বরূপ একলব্য বনে ফিরে, সেখানে মাটি দিয়ে দ্রোণের এক প্রতিমূর্তি তৈরি করে এবং তাকে গুরু মেনে নিজেই অনুশীলন করতে থাকে। সময়ের সাথে সাথে সে ধনুর্বিদ্যায় খুব দক্ষতা অর্জন করে। একদিন কুরু রাজকুমাররা কুকুর নিয়ে শিকারে বের হয়, ঘন বনে বিচরণ করতে করতে একলব্যের সন্নিকটে এসে পড়ে। যখন কুকুরটি কাল হরিণের চামড়া দিয়ে জড়ানো, শরীর নোংরা শক্ত দলায় পরিণত হওয়া নিষাদের ঘ্রাণ পায় তখন সে ঘেউ ঘেউ করতে থাকে। তখন ক্রুদ্ধ হয়ে একলব্য কুকুরটির মুখে সাতটি তীর ছুঁড়ে। যখন কুকুরটি পাণ্ডবদের কাছে ফিরে আসে তখন তারা তীরন্দাজির এই অদ্ভুত দৃশ্য দেখে অবাক হয়ে যায়। তারা একলব্যকে খুঁজে বের করে, যে নিজেকে দ্রোণের শিষ্য বলে পরিচয় দেয়। একদা দ্রোণ তার প্রিয় শিষ্য অর্জুনকে বলেছিলেন যে তাঁর সকল শিষ্যের মধ্যে সে অপ্রতিদ্বন্দ্বী হবে। অর্জুন দ্রোণকে এই প্রতিজ্ঞার কথা মনে করিয়ে দেয়। দ্রোণ একলব্যের কাছে যান, সে তৎক্ষণাৎ দ্রোণকে গুরু মেনে প্রণাম করে। যখন দ্রোণ তার ডান হাতের বৃদ্ধাঙ্গুলটি গুরুদক্ষিণা হিসাবে দাবি করেন, তখন একলব্য দ্বিধাহীনভাবে নিজের আঙ্গুল কেটে দিয়ে দেয়। কিন্তু তারপর একলব্য তার অবশিষ্ট আঙ্গুল দিয়ে পূর্বের মতো দ্রুত তীর চালাতে অসমর্থ হয়। এভাবে দ্রোণ তাঁর দেওয়া কথার পালন করেন : ধনুর্বির্দ্যায় অর্জুনের চেয়ে আর কেউ পারদর্শী ছিল না।

➲ এই ধরনের কাহিনি দ্বারা নিষাদদের কোন্ ধরনের বার্তা দেওয়া হয় বলে তোমরা মনে কর?
ক্ষত্রিয়দের তা থেকে কী বার্তা দেওয়া হয়?
তোমরা কি মনে কর ধনুর্বিদ্যা শিক্ষা দেওয়ার সময় একজন ব্রাহ্মণ হিসাবে দ্রোণ ধর্মসূত্রকে অনুসরণ করেছিলেন?

ব্যক্তিদের জন্যই উন্মুক্ত ছিল যারা সৈন্যসামন্ত এবং অর্থবলের সামর্থ অর্জন করতে পারত এবং জন্মগতভাবে ক্ষত্রিয় হওয়ার উপর খুব কমই নির্ভরশীল ছিল।

অন্যান্য শাসকবর্গ যেমন-শক যারা মধ্য এশিয়া থেকে এসেছিল ব্রাহ্মণরা তাদের ম্লেচ্ছ, বর্বর এবং বর্হিদেশীয় বলে গণ্য করত। যদিও সংস্কৃত ভাষায় খোদাই করা শিলালিপি থেকে জানা যায় যে শক্‌দের সবচেয়ে শক্তিশালী রাজা রুদ্রদমন (আনুমানিক খ্রিস্টপূর্ব দ্বিতীয় শতাব্দী) কীভাবে সুদর্শন সরোবর পুনর্নির্মাণ করেন। এর থেকে ধারণা পাওয়া যায় যে শক্তিশালী ম্লেচ্ছরা সাংস্কৃতিক প্রথার সাথে পরিচিত ছিল।

মজার ব্যাপার হল যে সাতবাহন বংশের শ্রেষ্ঠ রাজা গৌতমী-পুত্র-সিরি-সাতকর্ণী নিজেকে এক অনন্য ব্রাহ্মণ (একা ব্রাহ্মণ) এবং

ক্ষত্রিয়দের দর্প চূর্ণকারী বলে দাবি করেন। তিনি আরও দাবি করেন যে, চতুবর্ণের সদস্যদের মধ্যে বিবাহ সম্বন্ধ করতে তিনিই বাধা দেন। একই সময়ে তিনি রুদ্রদমনের পরিবারের সাথে বিবাহ সম্পর্ক স্থাপন করেন।

তোমরা এই উদাহরণে দেখতে পেয়েছ যে, জাতপাত ব্যবস্থার মধ্যে সমন্বয় সাধন ছিল একটি জটিল প্রক্রিয়া। সাতবাহন রাজারা নিজেদের ব্রাহ্মণ বলে দাবি করত, অথচ ব্রাহ্মণদের মতে রাজা হতে গেলে ক্ষত্রিয় হতে হবে। তারা চতুবর্ণ ব্যবস্থার পৃষ্ঠপোষকতা করত। কিন্তু তারা ঐ সমস্ত লোকদের সাথেও বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপন করে, যারা ঐ বর্ণ ব্যবস্থার বাইরে ছিল। আমরা লক্ষ করেছি যে, তারা ব্রাহ্মণ শাস্ত্রে সুপারিশকৃত বহির্বিবাহের পরিবর্তে অন্তর্বিবাহ রীতি অনুসরণ করত।

3.3 *জাতি* এবং সামাজিক গতিশীলতা :

বিভিন্ন গ্রন্থে সামাজিক শ্রেণিবিন্যাস প্রসঙ্গে এই জটিলতাগুলো অন্য একটি পরিভাষায় প্রতিফলিত হয়েছে - যা হল জাতি। ব্রাহ্মণ্য তত্ত্ব অনুসারে বর্ণের মতো জাতিও জন্ম দ্বারা নির্ধারিত হত। কিন্তু বর্ণের সংখ্যা চারটিতেই সীমাবদ্ধ ছিল। আর জাতির সংখ্যার কোনো সীমাবদ্ধতা ছিল না। বস্তুত যখনই ব্রাহ্মণীয় কর্তৃপক্ষ কোনো নতুন গোষ্ঠীর সম্মুখীন হত, উদাহরণস্বরূপ বনবাসী নিষাদগণ অথবা বিভিন্ন পেশায় যুক্ত লোকদের নামকরণ করতে চাইত যেমন স্বর্ণকার যাদের সহজেই এই চতুবর্ণ প্রথার অন্তর্ভুক্ত করা যেত না, তাদের জাতি হিসাবে শ্রেণিভুক্ত করত। এই বিভিন্ন ধরণের জাতিভুক্ত লোকদের যারা একই জীবিকা অথবা একই ব্যবসার সাথে যুক্ত ছিল তারা মাঝে মধ্যে ব্যবসায়িক সংঘ বা শ্রেণি গঠন করত।

আমরা খুব কমই এই ধরনের লিখিত তথ্য পাই যেখানে এই গোষ্ঠীগুলোর বিবরণ রয়েছে। তবে এর কিছু ব্যতিক্রমও রয়েছে। একটি আকর্ষণীয় শিলালিপি (আনুমানিক খ্রিস্টীয় পঞ্চম শতকে) মান্দাসোরে (মধ্যপ্রদেশ) পাওয়া গেছে। এতে রেশম বয়ন শিল্পীদের এক শ্রেণির বর্ণনা রয়েছে, যারা মূলত লতাতে (গুজরাট) বসবাস করত, সেখান থেকে তারা মান্দাসোরে চলে আসে, যা তৎকালীন সময়ে দশপুর নামে পরিচিত ছিল। এর থেকে জানা যায় এই কঠিন যাত্রা তারা তাদের সন্তান ও আত্মীয় স্বজনদের নিয়ে সম্পন্ন করে। তারা সেখানকার রাজার মহিমার কথা শুনতে পেয়েছিল এবং তাঁর রাজ্যে বসতি স্থাপন করতে চেয়েছিল।

এই শিলালিপি জটিল সামাজিক প্রক্রিয়ার একটি মনোরম আভাস দেয় এবং সংঘ বা শ্রেণির প্রকৃতি সম্পর্কে অন্তর্দৃষ্টি প্রদান করে। যদিও শ্রেণির সদস্যতা শিল্প বিশেষজ্ঞতার উপর নির্ভর করত। তবুও কিছু সদস্য অন্য পেশার সাথে যুক্ত হত। শিলালিপি থেকে এটাও জানা যায় যে সদস্যরা একের অধিক জীবিকায় অংশগ্রহণ করত — তারা সম্মিলিতভাবে শিল্প থেকে অর্জিত ধনকে সূর্য দেবতার সম্মান প্রদর্শনে জমকালো মন্দির বানানোর কাজে ব্যয় করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছিল।

চিত্র 3.5
রূপার মুদ্রায় চিত্রিত শক রাজা, আনুমানিক চতুর্থ শতাব্দীর

ব্যবসায়ীদের অবস্থা

সংস্কৃত গ্রন্থ এবং শিলালিপিতে ব্যবসায়ীদেরকে 'বণিক' নামে আখ্যায়িত করা হয়েছে। তবে শাস্ত্রে ব্যবসা বাণিজ্যকে বৈশ্যদের একটি জীবিকা বলা হয়েছে। শূদ্রক রচিত 'মৃচ্ছকটিকম' (আনুমানিক খ্রিস্টীয় চতুর্থ শতাব্দীর) নাটকে এর চেয়েও অধিক জটিল পরিস্থিতি সুস্পষ্টভাবে লক্ষ করা যায়। এখানে নায়ক চরিত্র চারু দত্তকে ব্রাহ্মণ এবং সার্থবাহ বা ব্যবসায়ী বলে বর্ণনা করা হয়েছে। পঞ্চম শতাব্দীর এক শিলালিপি থেকে জানা যায় যে, দুই ক্ষত্রিয় বণিক ভাই, একটি মন্দির নির্মাণের জন্য অর্থপ্রদান করেছিল।

3.4 চারবর্ণের বাইরে : সমন্বয়সাধন

উপমহাদেশের বৈচিত্রতার দরুণ সেখানে সর্বদাই এমন কিছু লোক ছিল এবং আজও রয়েছে যাদের সামাজিক রীতিনীতির উপর ব্রাহ্মণীয় বিচারধারার কোনো প্রভাব পড়ে নি। যখন কোনো সংস্কৃত গ্রন্থে তাদের কথা উল্লেখ থাকত তখন তাদের অদ্ভুত, অসভ্য এবং পশু সদৃশ বলে বর্ণনা করা হত। উদাহরণস্বরূপ বনবাসীগণ যাদের অস্তিত্ব রক্ষার গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম ছিল শিকার ও ফলমূল সংগ্রহ করা। নিষাদগণ হল এর একটি উদাহরণ, একলব্যকে যাদের অন্তর্গত বলে ধরে নেওয়া হয়।

যাযাবর পশুপালক সম্প্রদায়কেও সন্দেহের দৃষ্টিতে দেখা হত। কেননা তাদেরকে সহজে স্থায়ী কৃষি বিশেষজ্ঞ শ্রেণির পর্যায়ে রাখা যেত না। অনেক সময় অসংস্কৃতি ভাষী লোকদের ম্লেচ্ছ আখ্যা দিয়ে হেয় প্রতিপন্ন করা হত।

উৎস ৪

রেশম বয়ন শিল্পীরা কী করেছিল?

নিম্নের উদ্ধৃতাংশটি সংস্কৃতের একটি শিলালিপি থেকে নেওয়া হয়েছে:

কেউ কেউ শ্রুতিমধুর সংগীতের সাথে গভীরভাবে যুক্ত; অন্যরা একশ উত্তম জীবনী রচনার জন্য গর্বিত (লেখক হিসাবে), এভাবে তারা অনেক সুন্দর কাহিনির সাথে ভালোভাবে পরিচিত; (অন্যরা), বিনম্রতার সাথে। উত্তম ধর্মীয় আলোচনায় নিমজ্জিত; ... কেউ কেউ নিজস্ব ধর্মীয় আচার আচরণের উৎকর্ষে পৌঁছায়। অন্যদের মতো যারা ছিল স্ব-অধিষ্ঠিতকারী, জ্যোতির্বিদ্যার (বৈদিক) জ্ঞানকে আয়ত্ত্ব করা হয়েছিল; এবং অন্যরা যুদ্ধক্ষেত্রে নির্ভীক, এমনকি আজও শত্রুদের বলপূর্বক ক্ষতিসাধন করে।

➲ তোমরা কি মনে কর যে, রেশম বয়ন শিল্পীরা তাদের জন্য শাস্ত্র মতে নির্ধারিত পেশার অনুকরণ করেছিল?

তবু এদের মধ্যে চিন্তাধারা ও বিশ্বাসের আদান প্রদান হত। মহাভারতের কিছু কিছু কিছু কাহিনিতে এই সম্পর্কের প্রকৃতিটি স্পষ্ট হয়েছে।

3.5 চারবর্ণের বাইরে
অধীনতা এবং মতবিরোধ

ব্রাহ্মণেরা কিছু লোকদের বর্ণ ব্যবস্থার বাইরের বলে বিবেচনা করত। পাশাপাশি তারা সমাজে কিছু শ্রেণিকে 'অস্পৃশ্য' ঘোষিত করে সামাজিক বৈষম্যকে আরো বেশি তীব্র করে তুলে। ব্রাহ্মণদের ধারণা ছিল যে কিছু নির্দিষ্ট ক্রিয়াকলাপ যেগুলো ধর্মীয় অনুষ্ঠানের সাথে যুক্ত সেগুলো ছিল পবিত্র। যারা নিজেদের পবিত্র বলে মনে করত তারা অস্পৃশ্যদের থেকে আহার গ্রহণে অস্বীকার করত। পবিত্রতার ঠিক বিপরীত কিছু কার্যাবলি ছিল যেগুলোকে 'অপবিত্র' বলে গণ্য হত। মৃতদেহ ও মৃত প্রাণীর দেহ সামলানো এগুলোর

অন্তর্গত। যারা এগুলো সম্পাদন করত তাদের চণ্ডাল বলা হত এবং সমাজ ব্যবস্থায় তাদের স্থান ছিল সর্বনিম্নে। সমাজে উচ্চ শ্রেণি বলে দাবী করা লোকেরা চণ্ডালদের স্পর্শ কিংবা কোনো কোনো ক্ষেত্রে তাদের দর্শনও

উৎস 9

ব্যাঘ্র সদৃশ স্বামী

মহাভারতের আদি পর্ব থেকে নেওয়া একটি কাহিনির সারাংশ :

পাণ্ডবরা বনে পালিয়ে গিয়েছিল। তারা ক্লান্ত হয়ে ঘুমিয়ে পড়ল; কেবল দ্বিতীয় পাণ্ডব ভীম, যিনি নিজের পরাক্রমের জন্য প্রসিদ্ধ ছিলেন, তিনি পাহারা দিচ্ছিলেন। পাণ্ডবদের গন্ধ পেয়ে তাদের ধরে আনার জন্য এক নরখাদক রাক্ষস তার বোন হিড়িম্বাকে পাঠায়। হিড়িম্বা ভীমের প্রেমে পড়ে যায়, সুন্দরী রমনীর বেশ ধরে তাকে বিয়ে করার প্রস্তাব দেয়। সে প্রত্যাখ্যান করে। এর মধ্যে রাক্ষস সেখানে পৌঁছায় এবং ভীমকে মল্লযুদ্ধের জন্য আহ্বান জানায়, ভীম তার আহ্বান গ্রহণ করে এবং তাকে হত্যা করে। অন্য পাণ্ডবরা হৈচৈ শুনে জেগে উঠে। হিড়িম্বা নিজের পরিচয় দেয় এবং ভীমের প্রতি তার ভালোবাসা সম্পর্কে অবগত করায়। সে কুন্তিকে বলে "হে দয়ালু দেবী, আমি আমার বন্ধু, ধর্ম এবং আত্মীয় পরিজনদের পরিত্যাগ করেছি এবং তোমার ব্যাঘ্র সদৃশ পুত্রকে স্বামী হিসাবে গ্রহণ করেছি ... যদিও আপনি আমাকে বোকা ভাবতে পারেন। অথবা আপনার অনুগত দাসী, মহান দেবী আমাকে আপনার সাথে নিয়ে চলুন, আপনার পুত্রবধূ হওয়ার অনুমতি দিন।" শেষ পর্যন্ত যুধিষ্ঠির এই শর্তে বিবাহে রাজী হয় যে সারাদিন তারা একসাথে সময় কাটাবে এবং রাত্রিবেলা ভীম আবার ফিরে আসবে। এই দম্পতি সারাদিন বিশ্ব ঘুরে বেড়ায়। নির্দিষ্ট সময়ে হিড়িম্বা ঘটোৎকচ নামে এক পুত্রের জন্ম দেয়। তারপর মাতা ও পুত্র পাণ্ডবদের ত্যাগ করে। ঘটোৎকচ প্রতিশ্রুতি দেয় যখন পাণ্ডবদের তার দরকার হবে তখন আবার সে ফিরে আসবে।

অনেক ঐতিহাসিকরা মনে করেন রাক্ষস তাদেরকেই বলা হত যাদের আচার আচরণ ব্রাহ্মণীয় গ্রন্থে উল্লিখিত আচার আচরণ থেকে পৃথক ছিল।

➲ এই সারাংশ থেকে সমস্ত আচার আচরণ খুঁজে বের কর যেগুলো অব্রাহ্মণীয় বলে মনে হয়।

'অপবিত্র' বলে মনে করত।

মনুস্মৃতিতে চণ্ডালদের 'কর্তব্য' নির্দেশ করা আছে। তাদের গ্রামের বাইরে বাস করতে হত, তারা পরিত্যক্ত বাসনপত্র ব্যবহার করত এবং মৃতব্যক্তির বস্ত্র পরিধান করত ও লোহার অলঙ্কার ব্যবহার করত। তারা রাত্রিবেলা গ্রাম ও শহরে চলাফেরা করতে পারত না। যেসব মৃতদেহের কোনো আত্মীয় পরিজন থাকত না তাদের অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়া তারাই সম্পাদন করত। অনেক পরে চিন

থেকে আগত বৌদ্ধ ভিক্ষু ফা-হিয়েন (পঞ্চম শতাব্দীতে) লিখেছেন যে অস্পৃশ্যদের রাস্তায় চলার সময় করতালি দিতে হত। যাতে অন্য লোকেরা তাদের দর্শন এড়িয়ে চলাচল করতে পারে। অন্য চৈনিক পরিব্রাজক হিউয়েন সাঙ (সপ্তম শতাব্দীতে) পর্যবেক্ষণ করেছিলেন যে মৃতদেহ সৎকারক এবং ঝাড়ুদাররা শহরের বাইরে বসবাস করতে বাধ্য হত।

অব্রাহ্মণীয় গ্রন্থে বর্ণিত চন্ডালদের জীবন বিশ্লেষণ করে ঐতিহাসিকরা এটা জানার চেষ্টা করেছেন যে চণ্ডালরা শাস্ত্রে নির্ধারিত নিম্ন জীবনযাপনকে গ্রহণ করেছিল কিনা। কোনো কোনো সময় এই সমস্ত বর্ণনাগুলোর সাথে ব্রাহ্মণীয় গ্রন্থের বর্ণনার মিল পাওয়া যায়। কিন্তু সেখানে ভিন্ন রকম সামাজিক বাস্তবতার ইঙ্গিত খুব কমই পাওয়া যায়।

4. জন্মই সম্পদ এবং পদমর্যাদার একমাত্র মাপকাঠি নয়

চিত্র 3.6
ভিক্ষা প্রার্থনাকারী এক ভিক্ষুকের প্রতিকৃতি, আনুমানিক খ্রিস্টপূর্ব তৃতীয় শতকের একটি পাথরের খোদাইকৃত ভাস্কর্য (গান্ধার)

যদি তোমরা দ্বিতীয় অধ্যায়ে বর্ণিত অর্থনৈতিক সম্পর্কের কথা মনে কর তাহলে বুঝতে পারবে যে, দাস, ভূমিহীন কৃষি শ্রমিক, শিকারী, জেলে, পশুপালক, কৃষক গ্রাম প্রধান, শিল্পী, বণিক এবং রাজা - সবাই এরা উপমহাদেশের বিভিন্ন অংশে সামাজিক ভূমিকা গ্রহণকারী হিসেবে উদিত হন। আর্থিক সম্পদের উপর তাদের কতটুকু নিয়ন্ত্রণ ছিলো তার উপর নির্ভর করেই তাদের সামাজিক অবস্থান নির্ধারিত হত। এখানে আমরা কিছু নির্দিষ্ট পরিস্থিতিতে সম্পদ আহরণ তথা ব্যবহারের সামাজিক প্রভাবগুলো খতিয়ে দেখবো।

4.1 সম্পত্তির উপর লিঙ্গাভিত্তিক অধিকার

চলো, আমরা মহাভারতের একটি সমালোচিত উপাখ্যানের কথা বিবেচনা করি। কৌরব এবং পাণ্ডবদের মধ্যে দীর্ঘকাল ধরে চলে আসা দ্বন্দ্বে দুর্যোধন যুধিষ্ঠিরকে পাশা খেলায় আমন্ত্রণ জানায়। দুর্যোধনের প্রতারণায় যুধিষ্ঠির পাশা খেলায় পরাজিত হয়ে নিজের স্বর্ণ, হাতি, রথ, দাসদাসী, সৈন্যবাহিনী, রাজকোষ, রাজ্য তথা তাদের প্রজাদের সম্পত্তি, তাঁর সব ভাই এবং শেষে নিজেকেও হারান। শেষপর্যন্ত নিজেদের সহপত্নী দ্রৌপদীকে বাজি ধরেন এবং তাকেও হারান।

উৎস- *10*

চণ্ডালরূপে বোধিসত্ত্ব

চণ্ডালরা কি তাদের সমাজব্যবস্থার সর্বনিম্ন স্তরে ঠেলে নামিয়ে দেওয়ার বিরোধিতা করেছিল? নিম্নে দেওয়া কাহিনিটি পড়ো, যা পালি ভাষায় রচিত মাতঙ্গ জাতক থেকে গৃহীত। যেখানে বোধিসত্ত্ব (বুদ্ধের একটি পূর্বজন্ম) একজন চণ্ডাল হিসাবে বর্ণিত :

একদা বোধিসত্ত্ব বেনারস শহরের বাইরে এক চণ্ডালের পুত্ররূপে জন্মেছিলেন এবং তাঁর নামকরণ করা হয় মাতঙ্গ। একদিন তিনি কোনো কাজের জন্য শহরে গিয়েছিলেন। সেখানে এক ব্যবসায়ীর মেয়ে দিশ্থ মাঙ্গলিকার সাথে তার সাক্ষাত হয়। যখন মেয়েটি তাকে দেখতে পায় তখনই চিৎকার করে বলতে থাকে ‘আমি কিছু অশুভ দেখতে পেয়েছি’ এবং এটা বলে তার চোখ ধুয়ে নেয়। মেয়েটির ক্রুদ্ধ ভৃত্যরা মাতঙ্গাকে মারধোর করে। এর প্রতিবাদে মাতঙ্গা মেয়েটির পিতার বাড়ির দরজার সামনে গিয়ে শুয়ে পড়ে। সপ্তম দিনের মাথায় মেয়েটির ঘরের লোকরা মেয়েটিকে তার কাছে নিয়ে যায়। মেয়েটি উপবাসী মাতঙ্গাকে নিয়ে চণ্ডাল বস্তিতে চলে যায়। ঘরে ফিরে এসে মাতঙ্গা সংসার ত্যাগ করার সিদ্ধান্ত নেয়। আধ্যাত্মিক শক্তি অর্জনের পর সে বেনারসে ফিরে যায় এবং দিশ্থকে বিয়ে করে। মাণ্ডব্যকুমার নামে তাদের একটি পুত্র সন্তানের জন্ম হয়। সে তিন প্রকার বেদ অধ্যয়ন করে এবং বড়ো হওয়ার পর প্রত্যেকদিন সে 16,000 ব্রাহ্মণকে ভোজন করায়।

একদিন মাতঙ্গা ছেড়াকাপড় পরিধান করে, মাটির ভিক্ষাপাত্র হাতে নিয়ে নিজের পুত্রের দ্বারে আসে এবং খাদ্য ভিক্ষা করে। মাণ্ডব্য উত্তর দেয় যে সে দেখতে অনেকটা অচ্ছুত লোকের মতো এবং ভিক্ষা পাওয়ার অযোগ্য; ভোজন শুধু ব্রাহ্মণদের জন্য, মাতঙ্গা বলে, “যারা জন্ম নিয়ে গর্ব করে তারা মূর্খ এবং তারা উপহার পাওয়ার যোগ্য নয়। যারা অপরাধমুক্ত তারাই দান পাওয়ার যোগ্য”। মাণ্ডব্য ক্রুদ্ধ হয়ে লোকটিকে বাইরে ছুঁড়ে ফেলার জন্য তার ভৃত্যদের আদেশ দেয়। মাতঙ্গা অদৃশ্য হয়ে যান। দিশ্থ মাঙ্গলিকা এই ঘটনা জানতে পেরে সে ক্ষমা প্রার্থনা চাইতে মাতঙ্গোর পিছন পিছন চলে আসে। মাতঙ্গা দিশ্থকে তার বাটি থেকে ভোজনের অবশিষ্ট অংশ নিয়ে মাণ্ডব্য এবং ব্রাহ্মণদের দিয়ে দিতে বলেন ...

➲ কাহিনি থেকে ঐ সমস্ত উপাদানগুলো সনাক্ত করার চেষ্টা করো যেগুলো থেকে বোঝা যায় যে কাহিনিটি মাতঙ্গের পরিপ্রেক্ষিতে রচিত হয়েছে।

➲ আলোচনা করো...

এই অধ্যায়ে উল্লিখিত উৎসগুলোর মধ্যে কোন্‌গুলো ইঙ্গিত করে যে লোকেরা ব্রাহ্মণদের নির্দেশিত পেশাগুলো অনুসরণ করত? কোন্ উৎসগুলো অন্যান্য সম্ভাবনার ইঙ্গিত দেয়?

উৎস *11*

দ্রৌপদীর প্রশ্ন

এমনটা বলা হয়ে থাকে যে, দ্রৌপদী যুধিষ্ঠিরকে এই প্রশ্ন করেছিলেন যে, জুয়া খেলায় তাকে নিয়ে বাজি ধরার পূর্বে উনি নিজেকেই হারিয়ে ফেলেছিলেন কিনা। এই প্রশ্নের উত্তরে দুটি ভিন্ন ভিন্ন মত প্রকাশ করা হয়।

প্রথমত, যদিও যুধিষ্ঠির আগেই নিজে হেরে গিয়ে থাকেন তবুও তিনি নিজের পত্নিকে বাজি ধরতে পারেন, যেহেতু পত্নির উপর পতির নিয়ন্ত্রণ সবসময়ই থাকে।

দ্বিতীয়টি হল যে - একজন দাসত্ব স্বীকার করা পুরুষ লোক (যেমনটা নাকি সে সময় যুধিষ্ঠির ছিলেন) অন্য কাউকে নিয়ে বাজী ধরতে পারেন না।

এর কোনো সমাধান পাওয়া যায়নি। শেষপর্যন্ত, ধৃতরাষ্ট্র পঞ্চ-পাণ্ডব সহ দ্রৌপদীকে তাদের ব্যক্তিগত স্বাধীনতা ফিরিয়ে দেন।

➲ তুমি কি এটা মনে কর যে, এই উপাখ্যানে এটাই বলা হয়েছে যে, পত্নীদের তাদের স্বামীদের নিজস্ব সম্পত্তি হিসেবে মানা যায়?

এই গল্পে বর্ণিত সম্পত্তির মালিকানা স্বত্ত্ব নিয়ে সৃষ্টি হওয়া সমস্যা (উৎস-11) ধর্মসূত্র এবং ধর্মশাস্ত্রেও তুলে ধরা হয়েছে। মনুস্মৃতি অনুসারে মাতাপিতার মৃত্যুর পর পিতৃসম্পত্তি সকল পুত্রের মধ্যে সমভাবে বণ্টন করা উচিত। এদের মধ্যে জ্যেষ্ঠ্যপুত্র সম্পত্তির একটি বিশেষ অংশ লাভের অধিকারী ছিল। মহিলারা এই সম্পদ বা সম্পত্তির দাবি জানাতে পারত না।

যদিও নারীরা বিবাহের সময় পাওয়া উপহার সামগ্রী স্ত্রীধন (আক্ষরিক অর্থে মহিলাদের সম্পত্তি) হিসেবে নিজেদের অধিকারে রাখতে পারতো। পরবর্তীকালে এই সম্পত্তি তাদের সন্তানরা উত্তরাধিকারসূত্রে পেয়ে যেতো-যার উপর তাদের স্বামীদের কোনোও অধিকার ছিল না। কিন্তু একই সাথে 'মনুস্মৃতি' পত্নীদের নিজ স্বামীর অনুমতি ছাড়া পারিবারিক সম্পত্তি অথবা নিজেদের বহুমূল্য দ্রব্যাদির গুপ্ত সঞ্চয়ের বিরুদ্ধে সতর্ক করে দিয়েছিল।

তোমরা বিত্তশালী মহিলা যেমন-বাকাটক (Vakataka) রাণী প্রভাবতী গুপ্ত (দ্বিতীয় অধ্যায়ে বর্ণিত) সম্পর্কে পড়েছ। যদিও অধিকতর সাক্ষ্য - শিলালিপি এবং সাহিত্যিক - এই ব্যাপারে আলোকপাত করে যে, সাধারণত জমি এবং অর্থ সম্পদের উপর শুধুমাত্র পুরুষদের নিয়ন্ত্রণ ছিল। অন্যদিকে বলতে গেলে পুরুষ এবং মহিলাদের মধ্যে সামাজিক বৈষম্য - সম্পত্তি বা সম্পদের উপর তাদের নিয়ন্ত্রণের ভিন্নতার কারণে অধিক প্রখর হয়ে ওঠে।

4.2 বর্ণ এবং সম্পত্তির অধিকার

ব্রাহ্মণ্য গ্রন্থ অনুসারে সম্পদের উপর অধিকার নিয়ন্ত্রণের আর একটি নির্ণায়ক ভিত্তি (লিঙ্গ ভিত্তি ছাড়াও) ছিল বর্ণ। আমরা পূর্বে দেখেছি যে, শূদ্রদের জন্য একমাত্র জীবিকা ছিল দাসত্ব বা গোলামি। অন্যদিকে অপর তিন উচ্চবর্ণের পুরুষদের জন্য বিভিন্ন প্রকার জীবিকা বেছে নেওয়ার স্বাধীনতা ছিল। যদি এইসব বিধান প্রকৃতই বাস্তবায়িত করা হত তবে ব্রাহ্মণ এবং ক্ষত্রিয়বর্ণের পুরুষরাই সম্পদশালী হতে পারতো। এই তথ্যের সাথে সামাজিক বাস্তবিকতার অনেকটা মিল খুঁজে পাওয়া যায়। সাহিত্যিক পরম্পরায় পুরোহিত এবং রাজাদের বর্ণনার মিল পাওয়া যায়, যেখানে রাজাকে সবসময় অধিকতর ধনী হিসেবে বর্ণনা করা হত। পুরোহিতদের সাধারণত: ধনী হিসেবে দেখানো হত। যদিও মাঝে মধ্যে দরিদ্র ব্রাহ্মণের বর্ণনাও খুঁজে পাওয়া যেত।

অন্য এক স্তরে, যদিও সমাজের ব্রাহ্মণ্য দৃষ্টিভঙ্গিকে ধর্মসূত্র এবং ধর্মশাস্ত্রে বিধিবদ্ধ করা হয় তবুও অপরদিকে অন্যান্য পরম্পরায় বর্ণভেদ প্রথার সমালোচনাও বিকশিত হতে থাকে। এগুলোর মধ্যে কিছু সবচেয়ে বেশি পরিচিত সমালোচনা প্রারম্ভিক বৌদ্ধধর্ম (খ্রিস্টপূর্ব ষষ্ঠ শতাব্দী হতে; চতুর্থ অধ্যায় দেখো) বিকশিত হয়। বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীরা মেনে নিয়েছিলেন যে, সমাজে বৈষম্য রয়েছে কিন্তু এগুলোর কোনোটাই স্বাভাবিক বা অনমনীয় নয়। তারা জন্মের ভিত্তিতে সামাজিক প্রতিষ্ঠার ব্যাপারটিকেও অস্বীকার করে।

উৎস 12

পুরুষ ও মহিলারা কীভাবে সম্পত্তি অর্জন করতে পারত ?

মনুস্মৃতি বলে যে, পুরুষদের জন্য সম্পদ অর্জন করার সাতটি পদ্ধতি রয়েছে। যথা - উত্তরাধিকার সূত্রে, খোঁজ করে, ক্রয় করে, জয় করে, বিনিয়োগ করে, কর্মের মাধ্যমে এবং সৎ লোকের কাছ থেকে উপহার স্বীকার করে।

মহিলাদের জন্য সম্পদ অর্জন করার ছয়টি পদ্ধতি আছে। যথা - অগ্নির সম্মুখে (বিয়ের সময়) প্রাপ্ত সম্পদ, স্নেহের প্রতীকরূপে প্রাপ্ত সম্পদ এবং তাদের ভাই বা পিতামাতার কাছ থেকে পাওয়া উপহার। এর পরেও পরবর্তীকালে তারা অন্যান্য উপহার বা তাদের স্নেহাসক্ত স্বামীর বা পতির কাছ থেকে পাওয়া উপহারের মাধ্যমেও সম্পদ অর্জন করতে পারতো।

➲ পুরুষ এবং মহিলারা কীভাবে সম্পদ অর্জন করতে পারতো এর তুলনা করো এবং এদের পার্থক্য দেখাও।

4.3 একটি বিকল্প সামাজিক চিত্র : সম্পদের অংশীদারিত্ব

এখন পর্যন্ত আমরা ওইসব পরিস্থিতির পরীক্ষা করে আসছি যেখানে জনগণ নিজস্ব সম্পত্তির উপর ভিত্তি করে সামাজিক মর্যাদা দাবি করতো অথবা তাদের সেই মর্যাদা দেওয়া হত। যদিও সমাজে অন্যান্য সম্ভাবনা বা পরিস্থিতিও বিদ্যমান ছিল যেখানে মুক্তমনা বা উদার ব্যক্তিদের সম্মান করা হতো। অন্যদিকে কৃপণ ব্যক্তি অথবা যারা শুধুমাত্র নিজেদের জন্য ধন-সম্পদ সঞ্চয় করতো তাদের হেয় বা তুচ্ছ জ্ঞান করা হত। প্রাচীন তামিলকম (Tamilakam) এমন এক ক্ষেত্র ছিল যেখানে এই ধরনের মূল্যবোধকে লালন করা হত। যেমনটা আমরা পূর্বে পড়েছি (দ্বিতীয় অধ্যায়ে) প্রায় 2,000 বছর আগে বেশ কিছু মহাজনপদ (Chiefdom) ছিল। মহাজন বা প্রধানরা তাদের গুণগান বা প্রশংসাকারী কবিদের পৃষ্ঠপোষক ছিল। তামিল ভাষার সঙ্গাম সাহিত্য সংকলনে কবিতাগুলো প্রায়শই সামাজিক ও আর্থিক সম্পর্কের উপর আলোকপাত করে এবং এগুলো এটাও সুপারিশ করে যে, যদিও সমাজে ধনী ও দরিদ্রের মধ্যে বৈষম্য ছিল — তবুও যারা সম্পদের নিয়ন্ত্রক ছিল — তাদের থেকে এটাই আশা করা হত যে, তারা সেই সম্পদের ভাগ অন্যদেরও দেবে।

5. সামাজিক বৈষম্যের ব্যাখ্যা : একটি সামাজিক চুক্তি

বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীরা সমাজে প্রচলিত বৈষম্যগুলো সম্পর্কে একটা বিকল্প ধারণা গঠন করেন এবং এই সামাজিক দ্বন্দ্বগুলোর নিয়ন্ত্রণ করার সংস্থানও করে। সূত্রপিটক নামক গ্রন্থে একটি প্রচলিত ধারণার বর্ণনা রয়েছে, যাতে বলা হয়েছে যে, শুরুতে মানবজাতি প্রকৃতপক্ষে সম্পূর্ণভাবে পরিপূর্ণতা পায়নি, এমনকি গাছ-গাছালির জগৎও সম্পূর্ণরূপে বিকশিত হয়নি। সকল প্রকার জীব সকল-শান্ত পরিবেশে শান্তিতে বসবাস করতো এবং তাদের প্রত্যেক বেলার খাওয়া-দাওয়ার জন্য যতটা প্রয়োজন ঠিক ততটাই তারা প্রকৃতি হতে গ্রহণ করতো।

উৎস 13

বিত্তশালী শূদ্র

এই কাহিনিটি পালি ভাষায় রচিত এবং বৌদ্ধগ্রন্থ "মাঝ্মিমা নিকায়া" (*Majjhima Nikaya*) থেকে নেওয়া, যেখানে অবন্তিপুত্ত নামে এক রাজা এবং কাচ্চানা নামে বুদ্ধের এক শিষ্যের মধ্যে হওয়া কথোপকথনের অংশ বর্ণনা করা হয়েছে। যদিও এটি আক্ষরিক অর্থে সত্যি নাও হতে পারে। তবুও এতে বর্ণ ব্যবস্থার প্রতি বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীদের মনোভাব ব্যক্ত হয়েছে।

অবন্তিপুত্ত কাচ্চানের কাছে জানতে চান যে, ব্রাহ্মণদের এই চিন্তাধারার ব্যাপারে উনার মতামত কী, যে ব্রাহ্মণরাই সর্বশ্রেষ্ঠ বর্ণের লোক আর অন্য বর্ণের লোকেরা নীচু শ্রেণির; যে ব্রাহ্মণরা শ্বেতবর্ণের আর অন্য জাতের লোকেরা কৃষ্ণ বর্ণের; যে অব্রাহ্মণরা নয় কেবলমাত্র ব্রাহ্মণরাই পবিত্র; যে, ব্রাহ্মণরা স্বয়ং ব্রহ্মার পুত্র, যারা নাকি তাঁর মুখ থেকে জন্মগ্রহণ করেছে এবং উনার দ্বারাই সৃষ্ট তথা ব্রহ্মারই উত্তরাধিকারী।

উত্তরে কাচ্চান বলে : "আচ্ছা, যদি শূদ্ররা বিত্তবান হতো ... তবে কি অন্য কোনো শূদ্র ... অথবা ক্ষত্রিয় বা একজন ব্রাহ্মণ অথবা একজন বৈশ্য ... তার সাথে বিনীতভাবে কথা বলতো ?"

প্রত্যুত্তরে অবন্তিপুত্ত বলেন যে, যদি একজন শূদ্রের কাছে ধনসম্পত্তি অথবা শস্য অথবা স্বর্ণ বা রূপা থাকতো তবে সে অন্য কোনো শূদ্রকে নিজের অনুগত ভৃত্য হিসেবে রাখতে পারতো - যে তারও আগে ঘুম থেকে উঠতো আর তারপরে বিশ্রাম নিতো, তার সকল আদেশ মানতো আর তার সাথে নম্রভাবে ব্যবহার করতো অথবা সে কোনোও ক্ষত্রিয় অথবা ব্রাহ্মণ বা কোনো বৈশ্যকে তার অনুগত ভৃত্য হিসেবে রাখতে পারতো।

কাচ্চান জিজ্ঞাসা করল : "যদি এমনটাই হয় তবে এই চারটি বর্ণই কি একেবারেই সমান নয়?

অবন্তিপুত্ত স্বীকার করে নেন যে, এদিক দিয়ে বিচার করলে এই চার বর্ণের মধ্যে কোনোও পার্থক্য নেই।

➲ অবন্তিপুত্তের প্রথম বক্তব্যটি আরো একবার পড়ো। এতে এমন কোন্ ধারণাটি রয়েছে যা ব্রাহ্মণ্য সাহিত্য থেকে নেওয়া ? তুমি কি এগুলোর মধ্যে কোনও ধারণার উৎস খুঁজে বের করতে পারবে?
এই গ্রন্থ অনুসারে সামাজিক বৈষম্যের কী ব্যাখ্যা দেওয়া চলে?

যদিও ধীরে ধীরে মানুষ লোভী, প্রতিহিংসা পরায়ণ এবং প্রবঞ্চক হয়ে ওঠার এই সুব্যবস্থা ক্রমশঃ ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। এই পরিস্থিতিতে তারা এটা ভেবে অবাক হয় : "আমরা কি এমন মানুষ নির্বাচন করতে পারি যে, যেখানে রাগ করা উচিত সেই ব্যাপারে রাগ করবে, যা নিয়ে তিরস্কার বা ভৎসর্না করা উচিত তাকে তিরস্কার বা ভর্ৎসনা করবে এবং যাকে তাড়িয়ে দেওয়া বা নির্বাসিত করা উচিত তাকে তাড়িয়ে দেবে? এর বিনিময়ে আমরা তাকে চাল (rice) দেবো ... সবার দ্বারা মনোনীত হওয়ার কারণে ওই ব্যক্তি 'মহাসম্মতা' (*mahasammata*) নামে পরিচিত হবেন।"

এ থেকে এটাই জানা যায় যে, রাজার পদ জনগণের দ্বারা নির্বাচনের উপর নির্ভর করতো। আর এই সেবার বিনিময়ে জনগণ রাজাকে 'কর' দিত। এর সাথে এটাও জানা যায় যে, আর্থিক ও সামাজিক সম্পর্ক তৈরির কাজে মানবগোষ্ঠীর বিশেষ ভূমিকা ছিল। এর জন্য একটি তাৎপর্যও রয়েছে।

উদাহরণস্বরূপ বলা চলে, যদি মানুষ স্বয়ং উপরোক্ত নিয়ম বা ধারা সৃষ্টির জন্য দায়ী ছিল তবে ভবিষ্যতে এর পরিবর্তনও তারা করতে পারতো।

উৎস 14

উদারমনা দরিদ্র মহাজন

এই রচনাটি পুরনারুরু (*Puranaruru*) থেকে উদ্ধৃত-যা তামিল সঙ্গম সাহিত্যের একটি কাব্য সংকলন (আনুমানিক খ্রিস্টীয় প্রথম শতাব্দীতে)। এতে এক কবি তার পৃষ্ঠপোষক সম্পর্কে অন্য কবিদের সামনে নিম্নলিখিত বর্ণনা করেন :

তাঁর (অর্থাৎ তার পৃষ্ঠপোষক) নিকট অপরের জন্য প্রতিদিন খরচ করার মতো ধনসম্পদ নেই।

কিন্তু তাঁর মন এতও ছোটো নয় যে, নিজের কাছে কিছু নেই বলে কাউকে ফিরিয়ে দেন !

...

তিনি ইরন্তাইয়ে (একটা জায়গা) বাস করেন এবং উদার। তিনি কবিদের ক্ষুধার শত্রু!

যদি তুমি নিজের দরিদ্রতা থেকে মুক্ত পেতে চাও, তবে আমার সাথে এসো, সেই সকল কবি - যাদের ঠোঁট খুবই দক্ষ।

যদি আমরা আমাদের ক্ষুধায় ক্ষীণ হয়ে যাওয়া বুকের পাঁজর দেখিয়ে তার কাছে প্রার্থনা করি, তবে তিনি গ্রামের কামারের কাছে যাবেন —

এবং ঐ শক্তিশালী হাতওয়ালা লোকটিকে বলবেন :

"যুদ্ধের জন্য আমাকে একটা লম্বা বল্লম বানিয়ে দাও - যার ফলাটি হবে একেবারে সোজা।"

➲ সর্দার বা দলপতিকে উদারমনা হতে কবি কি ধরনের পন্থা অবলম্বন করেন?
ধনসম্পদ অর্জন করার জন্য মহাজনরা কী করবে বলে ধরে নেওয়া হতো --- যাতে সেই প্রাপ্ত ধন-সম্পদ হতে কিছুটা কবিদের দিয়ে দেওয়া যায়?

➲ আলোচনা করো...

বর্তমান সমাজে সামাজিক সম্পর্কগুলো কীভাবে পরিচালিত হয়? এগুলোর সাথে অতীতকালের সম্পর্কের ধরনের কোনো মিল বা পার্থক্য রয়েছে কি?

চিত্র 3.7
অন্ধ্রপ্রদেশের অমরাবতীতে পাওয়া এক মহাজন এবং তার অনুগামীর পাথরের মূর্তি, যা তৈরি হয় খ্রিস্টীয় দ্বিতীয় শতাব্দীতে।

➲ মহাজন এবং তার অনুগামীর মধ্যে পার্থক্যকে মূর্তিকার কীভাবে দেখিয়েছেন?

6. গ্রন্থের ব্যবহার
মহাভারত এবং ঐতিহাসিকগণ

এই অধ্যায়ে উদ্ধৃত উৎসগুলোর প্রতি যদি তোমরা আরেকবার দৃষ্টি দাও তবে তোমরা লক্ষ করবে যে, গ্রন্থ নিয়ে বিশ্লেষণ করার সময় ঐতিহাসিকরা বিভিন্ন উপাদানের বিবেচনা করেন। তারা পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেন যে, ওইগুলো প্রাকৃত, পালি বা তামিল ভাষার মতো সাধারণ লোকেদের ব্যবহৃত ভাষায় রচিত, নাকি সংস্কৃত ভাষায় রচিত-যা ছিল শুধুমাত্র পুরোহিত তথা সমাজের উচ্চশ্রেণির ব্যবহার্য্য ভাষা। গ্রন্থগুলো কী প্রকারের সেটাও ঐতিহাসিকগণ বিবেচনা করতেন। সেগুলো কী মন্ত্র ছিল - যা কিনা পূজা বা অনুষ্ঠান বিশেষজ্ঞরা শিখতো এবং উচ্চারণ করতো অথবা সেগুলো কি গল্প ছিলো - যা লোকে পড়তে এবং শুনতে পারতো এবং আকর্ষণীয় হলে পরবর্তীকালে অন্যদেরও শুনাতে পারতো? পাশাপাশি তাঁরা লেখকদের সম্পর্কে জানতে চেষ্টা করেন - যাদের দৃষ্টিকোণ এবং চিন্তাধারা ওই গ্রন্থগুলোকে রূপদান করেছিল। এরই সাথে ওই গ্রন্থের শ্রোতাদেরও (*audience*) ঐতিহাসিকগণ পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেন - যাদের কৌতুহল বা আগ্রহের কথা মাথায় রেখে লেখকগণ গ্রন্থ রচনা করতেন। তারা ওই সকল গ্রন্থ, রচনা বা সংকলনের সম্ভাব্য তারিখ এবং স্থান সুনিশ্চিত করার চেষ্টা করে থাকেন। এসমস্ত ব্যাপারে মূল্যায়ন করার পরেই ঐতিহাসিকগণ যে-কোনো গ্রন্থের বিষয়বস্তু ঐতিহাসিক গুরুত্ব বা তাৎপর্য বুঝতে চেষ্টা করেন। তোমরা কল্পনা করতে পারো যে, মহাভারতের মতো এক বিশাল এবং জটিল গ্রন্থের ক্ষেত্রে এটি কি ধরনের কঠিন কাজ ছিল!

6.1 ভাষা এবং বিষয়বস্তু (Language and content)

চলো আমরা গ্রন্থটির ভাষার দিকে নজর দেই। মহাভারতের যে সংস্করণ বা অনুবাদ আমরা এখানে বিবেচনা করছি- তা সংস্কৃত ভাষায় লেখা (যদিও অন্যান্য ভাষাতেও এর সংস্করণ রয়েছে)। যদিও মহাভারতে ব্যবহৃত সংস্কৃত ভাষা দ্বিতীয় অধ্যায়ে আলোচিত বেদ অথবা প্রশস্তিতে ব্যবহৃত সংস্কৃত ভাষার চেয়ে অনেকটাই সরল। সম্ভবত, এর ফলেই গ্রন্থটি ব্যাপকভাবে বোঝা সম্ভবপর হয়েছে।

ঐতিহাসিকগণ এই গ্রন্থটির বর্তমান বিষয়বস্তুকে দুটি মুখ্য অংশে ভাগ করেন। যে অংশে গল্প বা কাহিনি রয়েছে তার নাম দেওয়া হয়েছে 'আখ্যান' (*narrative*) এবং যে অংশে সামাজিক নিয়মকানুন সম্পর্কে উপদেশ দেওয়া হয়েছে তাকে নীতিশিক্ষামূলক বা উপদেশাত্মক (*didactic*) অংশ বলা হয়েছে, যদিও এই দুই অংশের বিভাজন নিশ্ছিদ্র নয়। উপদেশমূলক অংশে গল্প বা কাহিনিও রয়েছে এবং আখ্যানগুলো প্রায়শই কোনো না কোনো সামাজিক বার্তা বহন করে। সাধারণত ঐতিহাসিকরা এই ব্যাপারে একমত যে, মহাভারত ছিল মূলত নাটকীয় তথা চলমান কাহিনি এবং উপদেশাত্মক অংশটি সম্ভবত

পরবর্তীকালে জুড়ে দেওয়া হয়।

মজার ব্যাপার হল - প্রারম্ভিক সংস্কৃত ঐতিহ্যে মহাভারতকে একটি 'ইতিহাস' হিসেবে বর্ণনা করা হয়েছে। যার আক্ষরিক অর্থ হল — "এমনটাই ছিল" - যার কারণে একে সাধারণত ইতিহাস হিসেবে অনুবাদ করা হয়ে থাকে। সত্যিই কি এমন কোনো যুদ্ধ হয়েছিল - যা মহাভারতে বর্ণিত হয়েছে? এ ব্যাপারে আমরা নিশ্চিত নই। কোনো কোনো ঐতিহাসিক মনে করেন যে, স্বজাতি বা ভাইয়ে ভাইয়ে সংঘটিত কোনো দ্বন্দ্ব বা যুদ্ধ মহাভারতে বর্ণিত হয়েছিল, অন্যরা এটা দেখান যে, এই যুদ্ধের কোনো সমর্থনযোগ্য প্রমাণ নেই।

6.2 লেখক (গণ) এবং তারিখ

এই গ্রন্থটি কে রচনা করেন? এই প্রশ্নের বেশ কয়েকটি উত্তর রয়েছে। সম্ভবত, মূল কাহিনিটি রচনা করেছিল রথচালক বা সারথি কবিরা - যারা 'সূত' নামে পরিচিত ছিল। সাধারণত তারা ক্ষত্রিয় যোদ্ধাদের সাথে যুদ্ধক্ষেত্রে যেতো এবং তাদের বিজয় গাথা এবং অন্যান্য কৃতিত্বকে সম্মান জানিয়ে কবিতা রচনা করত। তাদের রচিত কবিতাগুলো লোকমুখে প্রচারিত হত। পরবর্তীকালে খ্রিস্টপূর্ব পঞ্চম শতাব্দী হতে ব্রাহ্মণেরা এই গল্প নিজেদের অধিকারে নিয়ে নেয় এবং একে লিখিত রূপদান করে। ওই সময় হতেই 'কুরু' এবং 'পাঞ্চালের' মতো মহাজনপদগুলো ধীরে ধীরে রাজ্যে পরিণত হচ্ছিল যেগুলোর আশে-পাশেই এই মহাকাব্যের কাহিনি ঘুরপাক খায়। নতুন রাজারা কি নিজেদের ইতিহাসকে আরোও বেশি নিয়ম অনুসারে নথিভুক্ত তথা সংরক্ষণ করতে চেয়েছিলেন? এটাও সম্ভব যে এসকল নতুন রাজ্য স্থাপনের সময় প্রান্ত উথাল-পাথাল হত। প্রায়শই এর সাথে নতুন নতুন নিয়মকানুন পুরনো সামাজিক মূল্যবোধের স্থান দখল করত। যেগুলোর প্রতিফলন মহাভারতের

উপদেশাত্মক (Didactic) বলতে এমন কিছু বোঝায়, যা নির্দেশ দানের উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হয়।

চিত্র 3.8

যুদ্ধক্ষেত্রে কৃষ্ণ অর্জুনকে উপদেশ দিচ্ছেন :

চিত্রটি আঠারশ শতাব্দীতে আঁকা। সম্ভবত মহাভারতের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ উপদেশমূলক অংশ হল ভগবৎগীতা। যাতে রয়েছে অর্জুনকে দেওয়া শ্রীকৃষ্ণের উপদেশাবলি। এই দৃশ্যটি চিত্র এবং ভাস্কর্যে অসংখ্যবার বর্ণিত হয়েছে।

গল্পের কিছু কিছু অংশে দেখতে পাওয়া যায়।

খ্রিস্টপূর্ব প্রায় 200 সাল থেকে 200 খ্রিস্টাব্দের মাঝামাঝি সময়ে আমরা এই গ্রন্থের রচনাকালের অন্য একটি পর্যায় দেখতে পাই। এটা এমন একটা সময় ছিল যখন বিষ্নুদেবতার আরাধনা গুরুত্বের সাথে বেড়ে চলছিল। এই মহাকাব্যের অন্য এক গুরুত্বপূর্ণ চরিত্র ছিল কৃষ্ন, যাকে বিষ্নুর রূপ হিসেবে বর্ণনা করা হচ্ছিল। পরবর্তীকালে আনুমানিক 200 থেকে 400 খ্রিস্টাব্দের মাঝামাঝি সময়ে মনুস্মৃতির অনুরূপ এক বৃহৎ উপদেশমূলক অংশ মহাভারতের সাথে জুড়ে দেওয়া হয়েছিল।

বি.বি.লাল এখানে বাসস্থানের পাঁচটি স্তরের প্রমাণ বা সাক্ষ্য খুঁজে পান। এগুলোর মধ্যে দ্বিতীয় এবং তৃতীয় স্তরটি আমাদের আকর্ষিত করে। দ্বিতীয় স্তরে (খ্রিস্টপূর্ব আনুমানিক বার থেকে সপ্তম শতাব্দী) পাওয়া ঘরগুলো সম্পর্কে শ্রীলাল বলেন : "যে সকল পরিসরে খনন কার্য সম্পন্ন হয়েছে, এর মধ্যে গৃহ নির্মাণের কোনো নির্দিষ্ট পরিকল্পনা খুঁজে পাওয়া যায়নি। কিন্তু যথাযথ কাঁচা মাটির দেওয়াল এবং কাঁচা ইট পাওয়া গেছে, নলখাগড়ার লক্ষনীয় ছাপযুক্ত মাটির প্রলেপ বা পলেস্তরার খোঁজ এই ব্যাপারে ইঙ্গিত করে যে, কিছু কিছু ঘরের দেওয়াল ছিল নলখাগড়ার তৈরি এবং এগুলোর উপর মাটির

চিত্র 3.9
লিপিকার - ভগবান গনেশ
ঐতিহ্য অনুযায়ী মহর্ষি ব্যাস এই গ্রন্থটিকে গনেশের দ্বারা রচনা করান। এই চিত্রটি মহাভারতের একটি ফারসী অনুবাদ (1740-50-এর কাছাকাছি সময়ে) থেকে নেওয়া।

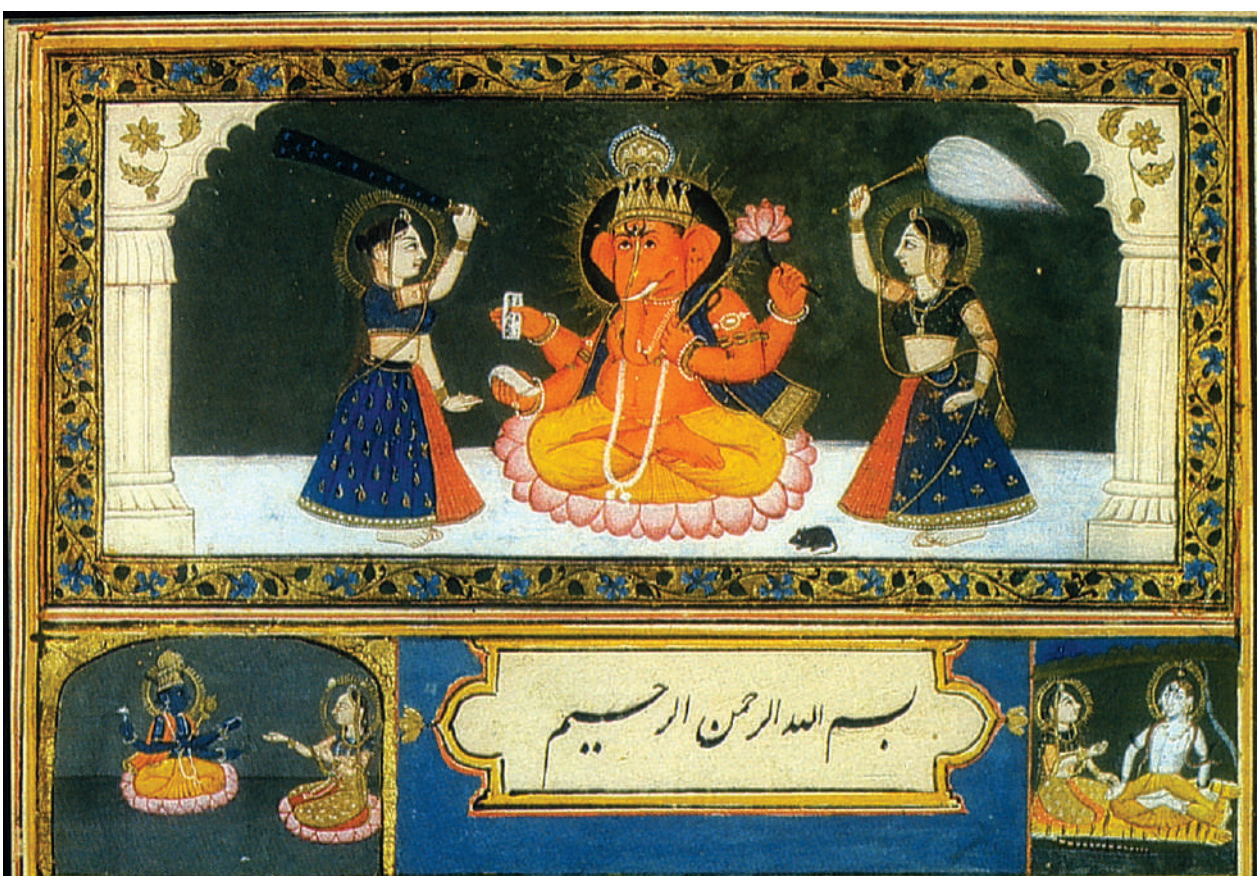

প্রলেপ লাগানো হত।” তৃতীয় স্তর (খ্রিস্টপূর্ব আনুমানিক ষষ্ঠ থেকে তৃতীয় শতাব্দী সময়কালে) সম্পর্কে শ্রীলাল বলেন যে, “এই সময়ের ঘরগুলো কাঁচা ইট এবং পোঁড়া ইটের তৈরি ছিল। পরিত্যক্ত জল নিকাশীর জন্য শোষক পাত্র তথা ইটের তৈরি নর্দমা ব্যবহৃত হত। পোড়ামাটির বলয় নির্মিত কূপ পানীয় জলের উৎস এবং ময়লা নিষ্কাশনী গর্ত সম্ভবত এই উভয় কাজেই ব্যবহৃত হত।”

এই সকল সংযুক্তির ফলে এই মহাকাব্য যেখানে শুরুর দিকে সম্ভবত 1000 এরও কম শ্লোক ছিল - তা বেড়ে প্রায় 10000 শ্লোকে গিয়ে দাঁড়ায়। ঐতিহ্যগতভাবে এই বৃহদাকার রচনাটির রচয়িতা হিসেবে ঋষি ব্যাসকে মানা হয়ে থাকে।

6.3 মিলনের খোঁজে

অন্যান্য বৃহৎ মহাকাব্যের মতো মহাভারতেও যুদ্ধ, অরণ্য, রাজপ্রাসাদ এবং বসতির বিবিধ বর্ণনা রয়েছে। 1951-52 খ্রিস্টাব্দে পুরাতাত্ত্বিক বি.বি.লাল মিরাটের (উত্তরপ্রদেশ) হস্তিনাপুর নামক গ্রামে খননকার্য চালান। এটাই কি সেই হস্তিনাপুর গ্রাম - যার কথা এই মহাকাব্যে রয়েছে? যদিও নামের এই সাদৃশ্য কাকতালীয় ব্যাপারও হতে পারে। কিন্তু গঙ্গানদীর উপরের দোয়াব অঞ্চলে এই পুরাতাত্ত্বিক অঞ্চলের অবস্থান যেখানে কুরুরাজ্যও অবস্থিত ছিলো, এটা এর প্রতি ইঙ্গিত করে যে, এই অঞ্চলটি হয়তো বা মহাকাব্যে বর্ণিত কৌরবদের রাজধানী ছিল।

এই নগরের বিবরণ কি এই মহাকাব্যের মূল আখ্যানের পরে (খ্রিস্টপূর্ব ষষ্ঠ শতাব্দীর পরে) অর্থাৎ যখন এই অঞ্চলে নগরের বৃদ্ধি ঘটে সেই সময়েই সংযোজিত হয়েছিল? অথবা, এটি কি কেবল কবিদের অলীক কল্পনা ছিল, যা অন্য কোনো ধরনের সাক্ষ্য প্রমাণের সাথে তুলনা করে যাচাই করা সম্ভব নয়?

অন্য একটি উদাহরণ বিবেচনা করো। মহাভারতের সবচেয়ে বেশি বিতর্কিত উপকথাগুলোর মধ্যে একটি হল পঞ্চপাণ্ডবদের সাথে দ্রৌপদীর বিবাহ। এটি বহুপতি বিবাহের উদাহরণ যা মহাভারতের কাহিনির কেন্দ্রীয় অংশ। মহাভারতের যে অংশে এর বর্ণনা রয়েছে - যদি আমরা সেটা পরীক্ষা করি তবে দেখা যাবে যে, স্পষ্টতই লেখক (গণ) এই ঘটনাটিকে বিভিন্নভাবে বর্ণনা করার চেষ্টা করেছিলেন।

বর্তমান ঐতিহাসিকগণ বলেন যে, গ্রন্থকার (গণ) এর দ্বারা বহুপতি (polyandrous) বিবাহের সম্পর্কের বর্ণনা এই বিষয়ের প্রতি ইঙ্গিত দেয় যে, সম্ভবতঃ এই প্রথা অভিজাত বর্গের মধ্যে কোনো এক কালে লক্ষণীয়ভাবে বিদ্যমান ছিল। কিন্তু এরই সাথে এই উপাখ্যানের (উৎস-16) এত রকম ব্যাখ্যা এটাই বোঝায় যে, ওই ব্রাহ্মণদের মধ্যে বহুপতি ব্যবস্থা ধীরে ধীরে জনপ্রিয়তা হারাতে থাকে যারা কয়েক শতাব্দী ধরে পুনরায় কাজ করে গ্রন্থটির বিকাশ সাধন করেন।

উৎস 15

হস্তিনাপুর

মহাভারতের আদি পর্বে এই নগরের বর্ণনা নিম্নলিখিতভাবে করা হয়েছে :

এই নগরটি সমুদ্রের মতো, যা শ'য়ে শ'য়ে সুউচ্চ প্রাসাদে পূর্ণ। এদের সিংহদ্বার, তোরণ এবং সুউচ্চ চূঁড়া মেঘের মতো ছেয়ে আছে। এটা ইন্দ্রদেবের নগরীর মতো জাঁকজমকপূর্ণ।

➲ তোমরা কি মনে করো যে, প্রত্নতত্ত্ববিদ শ্রীলাল মহাভারতে বর্ণিত হস্তিনাপুরের বর্ণনার সাথে এর মিল খুঁজে পেয়েছেন?

চিত্র 3.10
হস্তিনাপুরে খনন কার্যে পাওয়া একটি দেওয়ালের চিত্র।

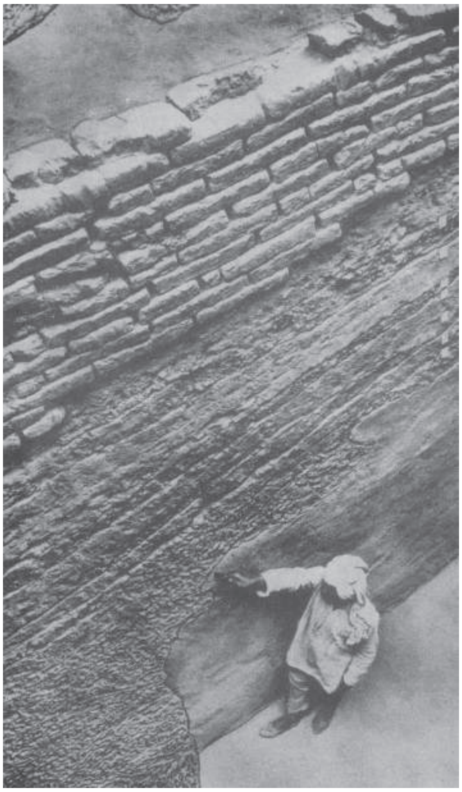

কোনো কোনো ঐতিহাসিক এই তথ্য দেন যে, যদিও ব্রাহ্মণ্য দৃষ্টিভঙ্গিতে বহুপতি প্রথা হয়তো অস্বাভাবিক বা অবাঞ্ছিত ছিল তবুও হিমালয় অঞ্চলে এর প্রচলন ছিল (এবং এখনও আছে)। অন্যদের মতে যুদ্ধকালীন সময়ে মহিলাদের অভাব দেখা দেওয়ার কারণে হয়তো বা এই বহুপতি প্রথা চালু হয়ে থাকতে পারে, অন্যভাবে বলতে গেলে সঙ্কটকালীন পরিস্থিতির মোকাবিলায় একে গ্রহণ করা হয়।

শুরুর দিকের কিছু সূত্র অনুসারে, বহুপতি প্রথা বিবাহের একমাত্র বা সবচেয়ে বেশি গ্রহণযোগ্য পদ্ধতি ছিল না, তবে কী কারণে গ্রন্থকার (গণ) এই প্রথাটিকে মহাভারতের কেন্দ্রীয় চরিত্রগুলোর সাথে সংযুক্ত করেন? আমাদের একথা মনে রাখা দরকার যে, সৃজনাত্মক সাহিত্যের নিজস্ব বর্ণনা

উৎস 16

দ্রৌপদীর বিবাহ

পাঞ্চালের রাজা দ্রৌপদ এক স্বয়ম্ভর সভার আয়োজন করেন, যেখানে এই শর্ত রাখা হয় যে, তির ধনুক দিয়ে সফলভাবে লক্ষ্যভেদ করতে পারলে বিজেতাকে তাঁর কন্যা দ্রৌপদীর সাথে বিবাহ করার জন্য বেছে নেওয়া হবে। এই প্রতিযোগিতায় অর্জুন লক্ষ্যভেদে সক্ষম হন এবং দ্রৌপদী তাঁর গলায় বরমালা পরিয়ে দেন। এর পরে পাণ্ডবগণ দ্রৌপদীকে নিয়ে মাতা কুন্তীর কাছে ফিরে আসে। তাদের নিজ চোখে না দেখেই কুন্তী বলে দেন যে, তাঁরা যা পেয়েছে - তা যেন নিজেদের মধ্যে ভাগাভাগি করে নেয়। দ্রৌপদীকে দেখার পর কুন্তীর ভুল ভাঙ্গো। কিন্তু তাঁর আদেশ অমান্য করা সম্ভব ছিল না। অনেক আলাপ আলোচনার পর যুধিষ্ঠির এই সিদ্ধান্তে উপনিত হন যে, দ্রৌপদী তাদের পাঁচ ভাইয়েরই পত্নী হবেন।

কিন্তু দ্রৌপদী একথা জানতে পারে এর প্রতিবাদ করেন। যদিও মহর্ষি ব্যাস তাঁর কাছে যান এবং তাঁকে বলেন যে, বাস্তবে পাণ্ডবরা ইন্দ্রের অবতার এবং তাঁর পত্নী দ্রৌপদী রূপে পুনর্জন্ম লাভ করেছেন এবং তাদের মিলন পূর্ব নির্ধারিত ছিল।

মহর্ষি ব্যাস এটাও বলেন যে, একবার এক যুবতী মহিলা পতিলাভের জন্য শিবঠাকুরের নিকট প্রর্থনা করেন এবং প্রবল কৌতুহলের ফলে একবারের জায়গায় পাঁচবার প্রার্থনা করে। এই মহিলাই দ্রৌপদী হিসেবে পুর্নজন্মলাভ করেছেন এবং শিবঠাকুর তার প্রার্থনা পূরণ করেন। এইসব কাহিনি দ্বারা সন্তুষ্ট হয়ে দ্রৌপদী এই বিবাহে সম্মতি দেন।

➲ গ্রন্থাকার (গণ) একটিমাত্র উপাখ্যানের জন্য তিন-তিনটি ব্যাখ্যা কেন দিয়েছিলেন বলে তুমি মনে কর?

বা আখ্যানমূলক প্রয়োজনীয়তা রয়েছে এবং বস্তুত এগুলো সমাজের বাস্তবচিত্রের প্রতিফলন ঘটায় না।

7. একটি গতিশীল গ্রন্থ (A Dynamic Text)

মহাভারতের বিকাশ সংস্কৃত সংস্করণের সাথে থেমে থাকেনি। কয়েক শতাব্দী ধরে এই মহাকাব্য বিভিন্ন জনসাধারণ ও সম্প্রদায়ের মধ্যে কথোপকথনের দ্বারা এবং এই গ্রন্থের মাধ্যমে বিভিন্ন ভাষায় লেখা হতে থাকে। বিভিন্ন অঞ্চলে উদ্ভব হওয়া অথবা নির্দিষ্ট লোকজনের মধ্যে প্রচলিত বেশ কিছু কাহিনি এই মহাকাব্যের অন্তর্ভুক্ত হয়ে পড়ে। এরই সাথে এই মহাকাব্যের মুখ্য কাহিনিকে বিভিন্নভাবে ব্যাখ্যা করা হতে থাকে। মহাকাব্যের বিভিন্ন উপাখ্যানকে ভাস্কর্য এবং চিত্রের মাধ্যমে বর্ণনা করা হয়। এই মহাকাব্য নাটক, নৃত্যকলা এবং অন্যান্য ধরনের বর্ণনা এসব প্রদর্শনমূলক কলার এক ব্যাপক সুযোগ প্রদান করে।

অধিকাংশ পুনর্কথন বা পুনর্ব্যাখ্যায় এই মহাকাব্যের মূল বর্ণনাকে সৃজনাত্মক রূপে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। চলো আমরা এমনই একটি উদাহরণের দিকে তাকাই যা মহাভারত থেকে নেওয়া হয়েছে। এই উপাখ্যানের রূপান্তর করেছেন সমসাময়িক বাংলা লেখিকা মহাশ্বেতাদেবী, যিনি সমস্ত ধরনের শোষণ এবং নিপীড়নের বিরুদ্ধে গড়ে উঠা প্রতিবাদের জন্য বিশেষ পরিচিত। এই উদাহরণে তিনি মহাভারতের মূল কাহিনির অন্য একটি সম্ভাব্য বিকল্পের খোঁজ করেছেন এবং ওইসব প্রশ্নের দিকে নজর দিয়েছেন - যেগুলোর ব্যাপারে গ্রন্থটির সংস্কৃত অনুবাদ বা সংকলন নীরব ভূমিকা নিয়েছিল।

দুর্যোধন যেভাবে পাণ্ডবদের বিশেষভাবে নির্মিত গৃহে থাকার জন্য নিমন্ত্রণ করে এনে পুড়িয়ে মেরে ফেলার পরিকল্পনা করেছিল - সংস্কৃত গ্রন্থে এর বর্ণনা রয়েছে। দুর্যোধনের পরিকল্পনা জানতে পেরে পাণ্ডবরা বেড়িয়ে যাবার জন্য আগে থেকেই একটি সুড়ঙ্গা খুঁড়ে রাখে। এরপর কুন্তী একটি মহাভোজের আয়োজন করেন। নিমন্ত্রিতদের অধিকাংশই ছিল ব্রাহ্মণ, তবে এদের সাথে পাঁচ সন্তান সহ একজন নিষাদী মহিলাও ছিল। ব্রাহ্মণরা চলে যাওয়ার পর ভোজন ও মদ্যপান শেষে তারা তৃপ্ত হয়ে ঘুমিয়ে পড়লে পাণ্ডবরা জতুগৃহে আগুন লাগিয়ে সরে যায়। পরে ওই নিষাদী মহিলা সহ পাঁচপুত্রের মৃতদেহ উদ্ধার হলে সবাই এটাই মনে করে যে, পাণ্ডবরা মারা গেছেন।

“কুন্তী ও নিষাদী” শীর্ষক ছোটোগল্পে মহাশ্বেতাদেবী তাঁর বর্ণনা সেখান থেকে শুরু করেন যেখানে মহাভারতে ওই ঘটনার পরিসমাপ্তি ঘটে। তাঁর গল্পের প্রেক্ষাপট ছিল একটি অরণ্য, সেখানে মহাভারতের যুদ্ধের পরে কুন্তী বসবাস করতে শুরু করেন। নিজের অতীত নিয়ে ভাববার জন্য কুন্তীর কাছে এমন প্রচুর সময় এবং প্রায়শই তিনি প্রকৃতির প্রতীক স্বরূপ এই পৃথিবীর সাথে কথা বলে নিজের অসফলতাগুলো স্বীকার করেন। প্রতিদিন উনি ওইসব নিষাদ

➲ আলোচনা করো...

এই অধ্যায়ে মহাভারতের বিভিন্ন উদ্ধৃতিগুলো আরও একবার পড়ো। এগুলোর প্রত্যেকটি বিষয় বাস্তবে সত্যি হতে পারে কিনা — এ নিয়ে আলোচনা করো। এগুলো হতে মহাকাব্যের রচয়িতা, পাঠক অথবা শ্রোতাদের সম্পর্কে আমরা কী জানতে পারি?

লোকেদের দেখেন - যারা লাকড়ি, মধু, কন্দ এবং মূল সংগ্রহের জন্য সেখানে আসত। এদের মধ্যে এক নিষাদী মহিলা প্রায়শই পৃথিবীর সাথে কথা বলার সময় কুন্তীর কথা শুনত।

একদিন পরিবেশটা কেমন জানি হয়ে গেল! সব জন্তু-জানোয়ার জঙ্গল ছেড়ে পালিয়ে যাচ্ছিল। কুন্তী দেখলেন যে, ওই নিষাদী মহিলা তাঁর দিকে তাকিয়ে আছে. ওই মহিলা কুন্তীকে জিজ্ঞেস করল যে, ওই জতুগৃহের কথা তাঁর এখনও মনে আছে কিনা — একথা শুনে তিনি চমকে যান। কুন্তী উত্তর দেন যে, কুন্তীর কি ওই নিষাদী মহিলা এবং তার পাঁচ পুত্রের কথা মনে আছে? এবং তাদের যে মদ্যপান করানো হয় এবং সবাই তাতে অজ্ঞান হয়ে যায় যার ফাঁকে কুন্তী তার পাঁচ পুত্র সহ পালিয়ে বাঁচেন? তুমিই কি সেই নিষাদী মহিলা? - কুন্তী জানতে চান। জবাবে নিষাদী মহিলা বলেন, যে মহিলা জতুগৃহে পুড়ে মারা গিয়েছিল সে ছিল তার শাশুড়ি। সে আরও বলে যে, কুন্তী তাঁর অতীত বর্ণনা করার সময়ে সেই হারিয়ে যাওয়া ছয়টি নিষ্পাপ প্রাণের কথা একবারও মনে করেননি। কারণ কুন্তী পাঁচপুত্র সহ নিজেকে বাঁচাতে চেয়েছিলেন। তাদের এই কথা বলায় আগুনের শিখা ক্রমশ এগিয়ে আসতে থাকে। নিষাদী মহিলা প্রাণ বাঁচাতে পালিয়ে যায়। কিন্তু কুন্তী যেখানে দাঁড়িয়েছিলেন সেখানেই থেকে যান।

সময়পঞ্জি 1
গ্রন্থ সম্পর্কিত মুখ্য ঐতিহ্যসমূহ

আনুমানিক 500 খ্রিস্টপূর্বাব্দ	পাণিনির অষ্টাধ্যায়ী, এটি একটি সংস্কৃত ব্যাকরণ
আনুমানিক 500-200 খ্রিস্টপূর্বাব্দ	মুখ্য ধর্মসূত্র সমূহ (সংস্কৃত ভাষায়)
আনুমানিক 500-100 খ্রিস্টপূর্বাব্দ	পালি ভাষায় রচিত ত্রিপিটক সহ শুরুর দিকের বৌদ্ধগ্রন্থ সমূহ।
আনুমানিক 500 খ্রিস্টপূর্বাব্দ হতে 400 খ্রিস্টাব্দ	রামায়ণ এবং মহাভারত (সংস্কৃত ভাষায়)
আনুমানিক 200 খ্রিস্টপূর্বাব্দ হতে 200 খ্রিস্টাব্দ	মনুস্মৃতি (সংস্কৃত ভাষায়); তামিল সঙ্গাম সাহিত্য রচনা এবং সংকলন।
আনুমানিক 100 খ্রিস্টাব্দ	চরক এবং শুস্রুত সংহিতা, আয়ুর্বেদ শাস্ত্র নিয়ে রচিত গ্রন্থসমূহ (সংস্কৃত ভাষায়)
আনুমানিক 200 খ্রিস্টাব্দ হতে	পুরানের সংকলন (সংস্কৃত ভাষায়)
আনুমানিক 300 খ্রিস্টাব্দ	ভরতের 'নাট্যশাস্ত্র', এটি নাট্যকলার উপর লেখা একটি গ্রন্থ (সংস্কৃত ভাষায়)
আনুমানিক 300-600 খ্রিস্টাব্দ	অন্যান্য ধর্মশাস্ত্রসমূহ (সংস্কৃত ভাষায়)
আনুমানিক 400-500 খ্রিস্টাব্দ	কালিদাসের সাহিত্যকর্ম সহ সংস্কৃত নাটকসমূহ; আর্যভট্ট এবং বরাহমিহিরের জ্যোর্তিবিজ্ঞান ও গণিত সম্পর্কিত গ্রন্থ। (সংস্কৃত ভাষায় রচিত); জৈন গ্রন্থের সংকলন (প্রাকৃত ভাষায়)

সময়পঞ্জি 2
মহাভারতের অধ্যয়নের বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনাসমূহ

বিংশ শতাব্দী

1919-66	মহাভারতের সমালোচনামূলক সংস্করণের (Critical Edition) প্রস্তুতি এবং প্রকাশন
1973	জে.এ.বি. ভন বুইটেনেন দ্বারা সমালোচনামূলক সংস্করণের ইংরেজী অনুবাদ; 1978 খ্রিস্টাব্দে উনার মৃত্যুর পরে এই কাজ অসম্পূর্ণ থেকে যায়।

উত্তর দাও (100-150 শব্দের মধ্যে)

1. অভিজাত শ্রেণির মধ্যে পিতৃগোত্র বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ হওয়ার কারণ ব্যাখ্যা করো।

2. শুরুর দিকের রাজ্যগুলোর শাসকগণ কী নিশ্চিতরূপে ক্ষত্রিয়ই ছিল — এ নিয়ে আলোচনা করো।

3. দ্রোণ, হিড়িম্বা এবং মাতঙ্গের কাহিনিতে যেসব ধর্ম বা নিয়মকানুনের উল্লেখ রয়েছে সেগুলোর মধ্যে তুলনা করে পার্থক্য নিরূপণ করো।

4. সামাজিক চুক্তি সম্পর্কিত বৌদ্ধ মতবাদ সমাজ সম্পর্কে পুরুষ-সুক্ত হতে উদ্ভূত ব্রাহ্মণ্য চিন্তাধারা থেকে কীভাবে ভিন্ন ছিল ?

5. মহাভারত থেকে নেওয়া নিম্নলিখিত উদ্ধৃতাংশে জ্যেষ্ঠ্য পাণ্ডব যুধিষ্ঠির, সঞ্জয় নামক দূতের সাথে কথা বলছেন :

   > সঞ্জয়, ধৃতরাষ্ট্রের গৃহের সমস্ত ব্রাহ্মণ এবং প্রধান পুরোহিতকে আমার সশ্রদ্ধ শুভেচ্ছা জানাবেন, আমি গুরু দ্রোণের সামনে মাথা নত করে প্রণাম করি ... আমি কৃপাচার্য্যের চরণ স্পর্শ করছি... (এবং) কুরু বংশের পিতামহ ভীষ্মকেও আমি বৃদ্ধ রাজার (ধৃতরাষ্ট্র) সামনে মাথা নত করে সম্মান জানাই। আমি তাঁর পুত্র দুর্যোধন এবং তার ছোটো ভাইদের শুভেচ্ছা জানাই এবং তাদের স্বাস্থ্যের খোঁজখবর নিই ... অন্যান্য সকল তরুণ কৌরব যোদ্ধা - যারা আমাদের ভ্রাতা, পুত্র বা প্রপৌত্র — তাদেরও শুভেচ্ছা জানাই ... সর্বোপরি জ্ঞানী বিদূরকেও (যিনি এক দাসী মহিলার গর্ভ থেকে জন্মগ্রহণ করেন) সম্মান জানাই - যিনি আমাদের নিকট মাতা এবং পিতার মতো ... আমি মাথা নত করে সম্মান জানাই ওই সকল বয়স্কা মহিলাদের - যারা আমাদের মাতা হিসেবে পরিচিত, যারা আমাদের পত্নী - তাদের আপনি বলবেন, “আশা করি তারা সবাই সুরক্ষিত রয়েছে” ... আমার পক্ষ থেকে আমাদের সমস্ত কুলবধূ - যারা ভাল পরিবারে জন্মগ্রহণ করেছেন এবং সন্তানদের, মা দের শুভেচ্ছা জানাবেন। আমাদের কন্যাদের আলিঙ্গন করবেন ... আমাদের সুন্দরী, সুগন্ধিত এবং সুন্দর পোশাক পরিহিতা গণিকাদেরও শুভেচ্ছা জানাবেন। দাসী এবং তাদের সন্তানদের তথা বয়স্ক, বিকলাঙ্গ এবং অসহায়দেরও শুভেচ্ছা জানাবেন।

   কীসের উপর ভিত্তি করে উপরোক্ত সূচী তৈরি করা হয়েছে — তা খুঁজে বের করতে চেস্টা করো, বয়স, লিঙ্গ, সম্পর্ক প্রভৃতির নিরিখে। এখানে কি আর কোনো ভিত্তি রয়েছে ? প্রতিটি শ্রেণিকে একটি নির্দিষ্ট স্থানে কেন রাখা হয়েছে তা ব্যাখ্যা করো।

নিম্নলিখিতগুলোর উপর টীকা লিখ : (500 শব্দের মধ্যে)

6. ভারতীয় সাহিত্যের একজন বিখ্যাত ঐতিহাসিক মাউরিস উইন্টারনিট্জ মহাভারত সম্পর্কে লেখেন : "শুধুমাত্র এই কারণে যে, মহাভারত এক সম্পূর্ণ সাহিত্যের প্রতিনিধিত্ব করে ... এবং এতে এত বেশি এবং এত বিভিন্ন ধরনের বস্তু রয়েছে ... (এটি) ভারতীয়দের আত্মার অত্যন্ত গভীরে দেখার অর্ন্তদৃষ্টি প্রদান করে" — তাঁর কথাগুলো নিয়ে আলোচনা করো।

7. আলোচনা করো যে, মহাভারত কি শুধুমাত্র কোনো একজন লেখকের রচনা হতে পারে?

8. শুরুর দিকের সমাজগুলোতে লিঙ্গবৈষম্য কতটা গুরুত্বপূর্ণ ছিল? — উত্তরের স্বপক্ষে যুক্তি দেখাও।

9. যে সমস্ত সাক্ষ্য প্রমাণ থেকে এটা বোঝা যায় যে, বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক বা আত্মীয়তা এবং বিবাহ সম্পর্কে ব্রাহ্মণদের নির্দেশ সর্বত্র অনুসরণ করা হয়নি — সেগুলো আলোচনা করো।

মানচিত্রের কাজ

10. দ্বিতীয় অধ্যায়ে দেওয়া মানচিত্র 1-এর সাথে এই অধ্যায়ে দেওয়া মানচিত্রের তুলনা করো : কুরু-পাঞ্চাল এলাকার কাছে অবস্থিত মহাজনপদগুলোর তালিকা তৈরি করো।

প্রকল্প (যে-কোনো একটি)

11. অন্যান্য ভাষায় লেখা মহাভারতের পুন:কথনগুলো খুঁজে বের করো। এই অধ্যায়ে বর্ণিত মহাভারতের যে-কোনো দুটি উপাখ্যান ওই ভিন্ন ভিন্ন ভাষার মহাভারতে যেভাবে বর্ণিত হয়েছে — এগুলোর মধ্যে মিল এবং পার্থক্য দেখিয়ে বিস্তৃত আলোচনা করো।

12. কল্পনা করো যে তুমি একজন লেখক। তোমার নিজস্ব পছন্দের পরিপ্রেক্ষিতে একলব্যের কাহিনিকে পুনরায় লিখো :

যদি তোমরা আরও জানতে চাও তবে নীচের বইগুলো পড়তে পারো :

Uma Chakravarti. 2006.
Everyday Lives, Everyday Histories.
Tulika, New Delhi.

Irawati Karve. 1968.
Kinship Organisation in India.
Asia Publishing House, Bombay.

R.S. Sharma. 1983.
Perspectives in Social and Economic History of Early India.
Munshiram Manoharlal, New Delhi.

V.S. Sukthankar. 1957.
On the Meaning of the Mahabharata. Asiatic Society of Bombay, Bombay.

Romila Thapar. 2000.
Cultural Pasts: Essays in Early Indian History. Oxford University Press, New Delhi.

আরোও অধিক তথ্যের জন্য তোমরা নিম্নলিখিত ওয়েবসাইট দেখতে পারো:
http://bombay.indology.info/mahabharata/statement.html

বিষয়বস্তু চতুর্থ

চিন্তাবিদ, বিশ্বাস এবং ইমারতসমূহ

সাংস্কৃতিক বিকাশ

(আনুমানিক 600 খ্রিস্ট পূর্বাব্দ থেকে 600 খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত)

চিত্র 4.1
সাঁচীর একটি ভাস্কর্য

এই অধ্যায়ে আমরা এক হাজার বছরের সুদীর্ঘ ইতিহাসের মাধ্যমে দার্শনিকগণ এবং তাঁরা যে পৃথিবীতে বাস করতেন সেই পৃথিবীকে জানার ব্যাপারে তাদের প্রচেষ্টাগুলো সম্পর্কে জানব। আমরা এটাও দেখব যে, তাদের ধারণাগুলো কীভাবে মৌখিক এবং লিখিত গ্রন্থ হিসাবে সংগৃহীত হওয়ার পাশাপাশি স্থাপত্য এবং ভাস্কর্যের মাধ্যমে অভিব্যক্ত হয়। এগুলো মানুষের উপর এইসব চিন্তাবিদ্‌দের স্থায়ী প্রভাবের পরিচায়ক। যখন আমরা বৌদ্ধধর্মের উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করব, এটা স্মরণে রাখা দরকার যে, এই ঐতিহ্য এককভাবে বিকাশ লাভ করেনি — সেখানে অপরাপর অনেক ঐতিহ্য ছিল যেগুলো প্রত্যেকেই একে অপরের সঙ্গে বাদ-বিবাদ এবং মত বিনিময় করত।

এই রোমাঞ্চকর চিন্তাধারা ও বিশ্বাসের জগৎকে পুনর্নির্মাণ করার জন্য ইতিহাস রচয়িতাগণ যে উৎসগুলো ব্যবহার করেন তার মধ্যে বৌদ্ধ, জৈন এবং ব্রাহ্মণ ধর্মগ্রন্থের পাশাপাশি স্মৃতিস্তম্ভ এবং শিলালিপির মতো বড়ো এবং চিত্তাকর্ষক বস্তুও অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। ঐ সময়ের সবচেয়ে সুরক্ষিত স্মৃতি স্তম্ভগুলোর মধ্যে অন্যতম হল সাঁচীর স্তূপ যা এই অধ্যায়ের প্রধান কেন্দ্রবিন্দু।

চিত্র 4.2
শাহজেহান বেগম

1. এক নজরে সাঁচী

ঊনবিংশ শতাব্দীতে সাঁচী

ভোপাল রাজ্যের অন্তর্গত সাঁচী কানাখেরায় সবচেয়ে চমৎকার ভবনগুলো রয়েছে, এটি ভোপাল থেকে 20 মাইল উত্তর-পুর্বে পাহাড়ের উপরে অবস্থিত একটি ছোট্ট গ্রাম যা আমরা গতকাল দর্শন করলাম। আমরা পাথরের ভাস্কর্য এবং অনেক বুদ্ধ মূর্তি এবং একটি প্রাচীন তোরণদ্বার পরিদর্শন করলাম .... এই ধ্বংসাবশেষগুলো ইউরোপীয় ভদ্রলোকদের মনে মহা আগ্রহের সৃষ্টি করেছে বলে মনে হয়। মেজর আলেকজান্ডার কানিংহাম বেশ কয়েক সপ্তাহ এই এলাকায় বসবাস করে এই ধ্বংসাবশেষগুলো সযত্নে নিরীক্ষণ করেন। তিনি এই জায়গার চিত্র অঙ্কন করেন, শিলালিপির পাঠোদ্ধার করেন এবং এই গম্বুজগুলো খোদাই করেন। তাঁর পরীক্ষা নিরীক্ষার ফলাফলকে তিনি একটি ইংরেজি বইয়ে বর্ণনা করেন ....

ভোপালের নবাব (শাসনকাল 1868-1901), শাহজেহান বেগমের আত্মজীবনী তাজ-উল-ইকবাল তারিখ ভোপাল (ভোপালের একটি ইতিহাস) থেকে নেওয়া। গ্রন্থটি 1876 সালে এইচ. ডি. বারস্টো কর্তৃক অনূদিত।

ঊনবিংশ শতাব্দীর ইউরোপীয়রা সাঁচীর স্তূপের প্রতি খুবই আগ্রহী ছিল। বস্তুত ফরাসিরা শাহজাহান বেগমের কাছে সাঁচীর সবচেয়ে সংরক্ষিত পূর্বদিকের তোরণদ্বারকে ফ্রান্সের জাদুঘরে প্রদর্শন করার জন্য নিয়ে যাওয়ার অনুমতি চেয়েছিল। কিছু সময়ের জন্য ইংরেজরাও এরকমই অনুরোধ করেছিল। কিন্তু সৌভাগ্যবশত ফরাসি এবং ইংরেজ উভয়ই এই তোরণদ্বারের সযত্নে প্লাস্টার করা নির্মিত প্রতিকৃতিগুলো নিয়ে সন্তুষ্ট হয় যার ফলে আসল তোরণদ্বারটি ভোপাল রাজ্যের অঙ্গ হিসাবে নিজের জায়গাতেই থেকে যায়।

ভোপাল রাজ্যের শাসকগণ, শাহজেহান বেগম এবং তাঁর উত্তরাধিকারী সুলতান জেহান বেগম এই প্রাচীন স্থলের সংরক্ষণের জন্য অর্থ ব্যয় করেন। তাই এটা আশ্চর্যের নয় যে, জন্ মার্শাল সাঁচীর উপর লেখা তাঁর মূল্যবান গ্রন্থগুলো সুলতান জেহানকে উৎসর্গ করেন। সুলতান জেহান সেখানকার জাদুঘরের পাশাপাশি সেই অতিথিশালা নির্মাণের জন্য অর্থ ব্যয় করেন যেখানে থেকে জন মার্শাল এই গ্রন্থগুলো লিখেছিলেন। তিনি গ্রন্থগুলো প্রকাশের জন্যও অর্থের যোগান দিয়েছিলেন। সুতরাং স্তূপ চত্বরের রক্ষা পাওয়ার ঘটনাটি কোনো ছোটোখাটো ব্যাপার নয় বরং বিচক্ষণ সিদ্ধান্তের কারণে সম্ভব হয়েছে। সৌভাগ্যবশত এই স্থলটি রেলপথের ঠিকাদার, নির্মাতা এবং যারা ইউরোপের জাদুঘরে নিয়ে যাওয়ার জন্য একে খুঁজে বের করার জন্য চেষ্টা করছিল তাদের নজর এড়িয়ে যায়। সাঁচীর মতো এক গুরুত্বপূর্ণ বৌদ্ধ কেন্দ্রের আবিষ্কার প্রারম্ভিক বৌদ্ধ ধর্ম সম্পর্কে আমাদের ধারণায় বিরাট পরিবর্তন নিয়ে আসে। আজ এই স্থান ভারতের প্রত্নতাত্ত্বিক জরিপ বিভাগের প্রধান প্রত্নতাত্ত্বিক স্থান হিসাবে সফল পুনর্নির্মাণ এবং সংরক্ষণের সাক্ষ্য বহন করছে।

চিত্র 4.3
সাঁচীর মহান স্তূপ
যদি তুমি ট্রেনে দিল্লি থেকে ভোপাল ভ্রমণ কর, তবে তুমি পাহাড়ের চূড়ায় রাজকীয় স্তূপ চত্বরকে দেখবে। যদি তুমি গার্ডকে অনুরোধ কর তবে সে সাঁচীর ছোট্ট স্টেশনে দুই মিনিটের জন্য ট্রেন থামাবে - যা সেখানে নেমে যাওয়ার জন্য যথেষ্ট সময়। যেইমাত্র তুমি পাহাড়ের উপর উঠবে স্তূপগুলো দেখতে পাবে যার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল একটি বিশাল ঢিবি এবং পঞ্চম শতাব্দীতে তৈরি মন্দির সহ অপর স্মৃতি সৌধগুলো।

➲ আলোচনা করো...

শাহজেহান বেগমের বর্ণনার সঙ্গে চিত্র 4.3-এর তুলনা করো। কী কী সাদৃশ্য এবং বৈসাদৃশ্য তুমি দেখতে পাও?

কিন্তু এই স্মৃতি সৌধের তাৎপর্য কী? এই স্তূপ কেন তৈরি করা হয়েছিল এবং এর মধ্যে কী ছিল? এর চারদিকে কেন পাথরের প্রাচীর রয়েছে? কে এই চত্বর তৈরি করেছে এবং কেই বা এই স্তূপ নির্মাণের জন্য অর্থ ব্যয় করেছে? এটা কখন "আবিষ্কৃত" হয়েছিল? পুস্তক, ভাস্কর্য, স্থাপত্য এবং লিপির মিলিত তথ্য থেকে আমরা সাঁচীর চিত্তাকর্ষক কাহিনির উন্মোচন করতে পারি। চলো আমরা প্রাক্ বৌদ্ধ ধর্মের ঐতিহ্যের পটভূমির খোঁজ শুরু করি।

2. পটভূমি : যজ্ঞ এবং বিতর্ক

খ্রিস্টপূর্ব সহস্রাব্দের প্রথমার্ধকে বিশ্ব ইতিহাসের সন্ধিক্ষণ হিসাবে গণ্য করা হয় : এই সময় ইরানে জরাথুস্ত্র, চিনে কং জি, গ্রিসে সক্রেটিস, প্লেটো এবং অ্যারিস্টটল এবং ভারতে অন্য অনেকের মধ্যে মহাবীর এবং গৌতম বুদ্ধের মতো মহান চিন্তাবিদ্‌দের আবির্ভাব ঘটেছিল। তাঁরা জীবনের অস্তিত্বের রহস্যকে এবং মানুষ ও সৃষ্টির মধ্যে সম্পর্ককে জানার চেষ্টা করেন। সেই সময় গাঙ্গেয় উপত্যকায় নতুন নতুন রাজ্য এবং নগরের উত্থান ঘটে এবং সামাজিক ও অর্থনৈতিক জীবনে বিভিন্ন ধরনের পরিবর্তন চলে আসে (অধ্যায় 2 এবং 3)। এই চিন্তাবিদ্‌গণ এইসব পরিবর্তিত পরিস্থিতিকে বোঝায় চেষ্টা করেছিলেন।

2.1 যজ্ঞের ঐতিহ্য

খ্রি. পূ. 1500 থেকে খ্রি. পূ. 1000 এই সময়কালে সংকলিত ঋগ্বেদ থেকে জানা যায় যে, প্রাক্ বৈদিক ঐতিহ্যসহ চিন্তা, ধর্মীয় বিশ্বাস এবং রীতিনীতিগুলো প্রাচীনকাল থেকেই চলে আসছিল। ঋগ্বেদে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে বিভিন্ন দেবতার, বিশেষ করে অগ্নি, ইন্দ্র, সোমদেবের স্তবগান। যজ্ঞের সময় এই স্তবগুলো গাওয়া হত যেখানে মানুষ গবাদি পশু, পুত্র, সুস্বাস্থ্য, দীর্ঘায়ু প্রভৃতি লাভের জন্য প্রার্থনা করত। প্রথমদিকে যজ্ঞগুলো সমষ্টিগতভাবে করা হত।

পরবর্তী সময় (আনুমানিক 1000 থেকে 500 খ্রি. পূর্বাব্দে) পরিবারের কর্তা, পারিবারিক কল্যাণের জন্য কিছু কিছু যজ্ঞ করতেন। রাজসূয় এবং অশ্বমেধের মতো বড়ো ধরনের যজ্ঞগুলো সর্দার অথবা রাজারা করতেন। এই অনুষ্ঠানগুলোর জন্য তাঁদের ব্রাহ্মণ পুরোহিতদের উপর নির্ভর করতে হত।

2.2 নতুন জিজ্ঞাসা

উপনিষদ্‌গুলোতে (খ্রিস্টপূর্ব ষষ্ঠ শতাব্দী থেকে) পাওয়া বিভিন্ন ধারণা

উৎস 1

অগ্নিদেবের কাছে প্রার্থনা

এখানে ঋগ্বেদ থেকে নেওয়া দুটি শ্লোক রয়েছে যেখানে অগ্নিদেবকে আহ্বান করা হয়েছে; যাঁকে প্রায়শই যজ্ঞের অগ্নি রূপে দেখা হত। যজ্ঞের আগুনে কোনো কিছু উৎসর্গ করা হত যাতে অন্যান্য দেবতাদের কাছে পৌঁছায় : হে শক্তিশালী দেবতা ! আমাদের এই আহুতি দেবতাদের কাছে পৌঁছে দিন, হে জ্ঞানী আপনি তো মহান দাতা। হে পুরোহিত আমাদের অফুরন্ত খাদ্য প্রদান করুন।

হে অগ্নি, যিনি আপনার উপাসনা করেন তাঁকে চিরদিনের জন্য আপনি চমৎকার গাভী প্রদান করেন। আমাদের এক পুত্র সন্তান দিন যে আমাদের বংশকে এগিয়ে নিয়ে যাবে...

এই ধরনের শ্লোক 'বৈদিক সংস্কৃত' নামে পরিচিত বিশেষ ধরনের সংস্কৃতে রচিত হয়েছিল। এগুলো পুরোহিত পরিবারের লোকদের মৌখিকভাবে শেখানো হত।

➲ যজ্ঞের উদ্দেশ্যগুলোর তালিকা তৈরি করো।

থেকে জানা যায় যে, মানুষ জীবনের অর্থ, মৃত্যুর পর জীবনের সম্ভাবনা এবং পুনর্জন্ম সম্পর্কে জানার জন্য উৎসুক ছিল। পুনর্জন্ম কি অতীতের কর্মের ফল? এইসব ব্যাপারে গভীরভাবে তর্ক-বিতর্ক হত। মনীষীগণ চরম সত্যের প্রকৃতিকে উপলব্ধি এবং প্রকাশে মগ্ন ছিলেন। বৈদিক ঐতিহ্যের বাইরে কিছু দার্শনিক এই প্রশ্ন ছুড়ে দেন যে, চরম সত্য একটাই হয় কিনা। মানুষ যাগযজ্ঞের তাৎপর্য নিয়ে জল্পনা করতে শুরু করে।

2.3 তর্ক-বিতর্ক এবং আলোচনা

আমরা বৌদ্ধ গ্রন্থগুলো থেকে প্রাণবন্ত আলোচনা এবং তর্ক-বিতর্কের আভাস পাই যেখানে 64টি সম্প্রদায় অথবা মতবাদ বিদ্যমান ছিল। শিক্ষাগুরুগণ এক স্থান থেকে অন্যস্থানে যাত্রা করে নিজেদের দর্শন অথবা বিশ্ব সম্পর্কে নিজেদের জ্ঞান পরস্পর পরস্পরকে কিংবা সাধারণ লোকদের বোঝানোর চেষ্টা করতেন। বিতর্কগুলো কুটাগারাশালায় — যার আক্ষরিক অর্থ তীক্ষ্ণ ছাদযুক্ত কুঁড়েঘর — অথবা বনে সম্পন্ন হত যেখানে ভ্রাম্যমাণ ভিক্ষাজীবী সন্ন্যাসীগণ কিছু সময়ের জন্য অবস্থান করতেন। যদি একজন দার্শনিক তাঁর প্রতিপক্ষের কোনো একজনকে যুক্তি তর্ক দিয়ে বোঝাতে সক্ষম হতেন তবে তাঁর অনুগামীরাও ওই দার্শনিকের শিষ্যে পরিণত হত। সুতরাং, সময়ের সাথে সাথে যে-কোনো বিশেষ সম্প্রদায়ের সমর্থনে হ্রাস বৃদ্ধি ঘটত।

এই শিক্ষাগুরুগণের মধ্যে মহাবীর এবং বুদ্ধসহ অনেকেই বেদের প্রাধান্য নিয়ে প্রশ্ন উত্থাপন করেন। তাঁরা ব্যক্তিগত সত্তার উপরও গুরুত্ব আরোপ করে বলেন যে, জীবনের দুঃখ থেকে মুক্তি পাওয়ার চেষ্টা প্রত্যেক মানুষ নিজে করতে পারে। এই ধারণা ব্রাহ্মণ্যবাদ থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন ছিল। আমরা দেখেছি ব্রাহ্মণ্যবাদে মনে করা হত যে, কোনো ব্যক্তির অস্তিত্ব তার জাতি কিংবা লিঙ্গ দ্বারা নির্ধারিত হত।

উৎস 2

উপনিষদের কিছু শ্লোক

আনুমানিক খ্রি. পূর্ব ষষ্ঠ শতাব্দীতে সংস্কৃত ভাষায় রচিত ছান্দোগ্য উপনিষদ থেকে নেওয়া দুটি শ্লোক এখানে দেওয়া হল :

আত্মার প্রকৃতি

আমার হৃদয়ের এই আত্মা, ধান অথবা বার্লি অথবা সরিষা অথবা বাজরা অথবা বাজরার বীজের শাঁস থেকেও ছোটো। আমার হৃদয়ের এই সত্তা পৃথিবী থেকেও বিশাল, মহাকাশ থেকেও বিস্তৃত, স্বর্গ থেকেও মহান এবং এই বিশ্বের সব কিছু থেকেও বড়ো।

সত্যিকারের যজ্ঞ

এটা (বায়ু) যা প্রবাহিত হয়, নিশ্চয়ই একটি যজ্ঞ ... প্রবাহিত হওয়ার সময় এটা সমস্ত কিছুকে পবিত্র করে; তাই এটা সত্যিই একটা যজ্ঞ।

বৌদ্ধ গ্রন্থগুলোকে কীভাবে তৈরি এবং সংরক্ষিত করা হত

বুদ্ধ (এবং অন্যান্য শিক্ষাগুরুগণ) আলোচনা এবং বিতর্কের মাধ্যমে মৌখিকভাবে শিক্ষা দান করতেন। পুরুষ এবং মহিলারা (সম্ভবত শিশুরাও) এইসব আলোচনাগুলোতে উপস্থিত থাকত এবং তারা যা শ্রবণ করত তা নিয়ে পুনরায় আলোচনা করত। বুদ্ধদেবের উপদেশগুলো তাঁর জীবদ্দশায় লিপিবদ্ধ করা হয়নি। বুদ্ধদেবের মৃত্যুর পর (আনুমানিক খ্রিস্টপূর্ব পঞ্চম থেকে চতুর্থ শতাব্দী) তাঁর প্রদত্ত উপদেশগুলো বেসালীতে (বর্তমান বিহারে অবস্থিত বৈশালীর পালি ভাষার নাম) "বয়োজ্যেষ্ঠ" অথবা বয়স্ক ভিক্ষুদের এক সভায় তাঁর শিষ্যদের দ্বারা সংকলিত হয়। এই সংকলনগুলো 'ত্রিপিটক' নামে পরিচিত — আক্ষরিক অর্থ, বিভিন্ন ধরনের গ্রন্থকে রাখার জন্য তিনটি ঝুড়ি। এই সংকলনগুলো প্রথমে মুখে মুখে ঘুরত। পরবর্তী সময় এগুলোকে লিখিত রূপ দেওয়া হয় এবং এগুলোর দৈর্ঘ্যের পাশাপাশি বিষয়বস্তু অনুসারে শ্রেণিবিভাগ করা হয়।

যারা সংঘ অথবা ধর্মীয় আদেশ শুনত তাদের জন্য নিয়ম কানুন বিনয় পিটকে অন্তর্ভুক্ত ছিল। বুদ্ধের উপদেশগুলো সূত্র পিটকে অন্তর্ভুক্ত ছিল এবং দার্শনিক বিষয়গুলো নিয়েই অভিধম্ম পিটক রচিত। প্রত্যেক পিটকের মধ্যে অনেকগুলো পৃথক পৃথক গ্রন্থ রয়েছে। পরবর্তীকালে বৌদ্ধ পন্ডিতগণ এই গ্রন্থগুলোর উপর আলোচনা লিপিবদ্ধ করেন।

যখন বৌদ্ধ ধর্ম শ্রীলঙ্কার মতো নতুন অঞ্চলে বিস্তৃত হয়, তখন দ্বীপবংশ (আক্ষরিক অর্থ দ্বীপের ইতিহাস) এবং মহাবংশের (মহান ইতিহাস) মতো গ্রন্থগুলো লেখা হয়, যেখানে বৌদ্ধ ধর্মের আঞ্চলিক ইতিহাসগুলো অন্তর্ভুক্ত ছিল। এগুলোর মধ্যে অনেক রচনায় বুদ্ধের জীবনী লেখা হয়েছে। সবচেয়ে পুরোনো কিছু পুস্তক পালি ভাষায় লিখিত, পরবর্তী সময় বেশ কিছু সংস্কৃত ভাষায় রচিত হয়।

যখন বৌদ্ধ ধর্ম পূর্ব এশিয়ায় ছড়িয়ে পড়ে তখন ফা হিয়েন (Fa Xian) এবং হিউয়েন সাঙ (Xuan Zang)-এর মতো তীর্থযাত্রীগণ বৌদ্ধ গ্রন্থের খোঁজে চিন থেকে ভারতে আসেন। এই গ্রন্থগুলোকে তাঁরা নিজেদের দেশে নিয়ে যান, যেখানে পন্ডিতগণ এগুলোর অনুবাদ করেন। ভারতীয় বৌদ্ধ ধর্মগুরুগণও দূর দূরান্ত অঞ্চলগুলোতে ভ্রমণ করেন। বুদ্ধদেবের উপদেশগুলোকে প্রচার করার জন্য তারা কিছু গ্রন্থ সঙ্গে নিয়ে গিয়েছিলেন।

কয়েক শতাব্দী ধরে বৌদ্ধ পাণ্ডুলিপিগুলো এশিয়ার বিভিন্ন প্রান্তে অবস্থিত মঠগুলোতে সংরক্ষিত ছিল। পালি, সংস্কৃত, চিনা এবং তিব্বতীয় গ্রন্থ থেকে আধুনিক অনুবাদগুলো করা হয়েছে।

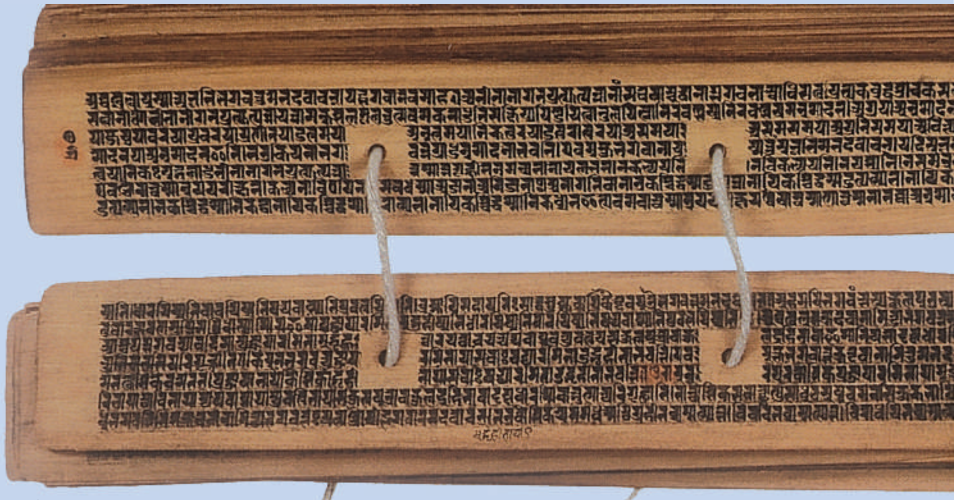

চিত্র 4.4
আনুমানিক দ্বাদশ শতাব্দীতে সংস্কৃত ভাষায় লিখিত একটি বৌদ্ধ পাণ্ডুলিপি

উৎস 3

অদৃষ্টবাদী এবং বস্তুবাদী ?

নিম্নের উদ্ধৃতাংশটি সূত্রপিটক থেকে নেওয়া, যেখানে মগধের রাজা অজাতশত্রু এবং বুদ্ধদেবের মধ্যে কথোপকথনের বর্ণনা রয়েছে :

একদা রাজা অজাতশত্রু বুদ্ধদেবের সঙ্গে দেখা করেন এবং মাক্ষালি গোসালা নামক অপর একজন শিক্ষাগুরু তাঁকে যা বলেছিলেন, তা বর্ণনা করেন :

"যদিও বুদ্ধিমান লোক আশা করেন যে, এই সদ্‌গুণ দ্বারা ... এই প্রায়শ্চিত্ত দ্বারা আমি কর্ম অর্জন করব ... এবং মূর্খও এই একই ধরনের কাজ করে ধীরে ধীরে কর্ম মুক্তির আশা করে; কিন্তু তাদের কেউই এতে সফল হয় না। সুখ এবং দুঃখ পূর্ব নির্ধারিত পরিমাপ অনুসারে প্রাপ্ত হয়; একে সংসারে (পুনর্জন্ম) বদলানো যায় না। একে কমানো কিংবা বাড়ানো যায় না ... ঠিক যেরকম সুতার গোলককে ছুঁড়ে দিলে তার পূর্ণদৈর্ঘ্য পর্যন্ত গড়িয়ে গড়িয়ে যায়, ঠিক সেরকমভাবে মূর্খ এবং বুদ্ধিমান লোক পূর্ব নির্ধারিত পথে এগিয়ে যাবে এবং দুঃখের পরিসমাপ্তি ঘটাবে।

অজিত কেশকম্বলিন্ নামে একজন দার্শনিক বলেন :

"হে রাজা ! দান অথবা যজ্ঞ অথবা উৎসর্গ বলে কোনো বস্তু নেই ... এই জন্ম অথবা পরজন্ম বলে কোনো কিছু নেই ...

মানবদেহ চারটি উপাদান নিয়ে গঠিত। যখন সে মারা যায় তার মধ্যে পার্থিব অংশটা পৃথিবীতে, তরল অংশ জলে, তাপ আগুনে, বায়বীয় অংশ বাতাসে মিশে যায় এবং চেতনা মহাকাশে বিলীন হয়ে যায় ....

দান দক্ষিণার কথা মূর্খদের মতবাদ, একটি শূন্য গর্ভ মিথ্যা ... মূর্খ অথবা জ্ঞানী উভয়ই ধ্বংস এবং বিনষ্ট হয়। মৃত্যুর পর তাদের কেউই বেঁচে থাকে না।"

প্রথমোক্ত শিক্ষাগুরু 'আজীবিক' ঐতিহ্যের অন্তর্গত ছিলেন। তাঁরা প্রায়শই অদৃষ্টবাদী হিসাবে বর্ণিত হয়ে আসছেন : তাঁরা বিশ্বাস করেন যে, পৃথিবীতে সব কিছুই পূর্ব নির্ধারিত। দ্বিতীয় শিক্ষাগুরু 'লোকায়ত' ঐতিহ্যের অন্তর্গত ছিলেন, যাঁদেরকে সাধারণত বস্তুবাদী হিসাবে বর্ণনা করা হয়ে থাকে। লোকায়তদের গ্রন্থগুলো নষ্ট হয়ে গিয়েছে, আমরা অপরাপর ঐতিহ্যগুলো থেকেই এগুলো সম্পর্কে জানতে পারি।

➲ তুমি কি মনে করো এই সব ব্যক্তিদের অদৃষ্টবাদী অথবা জড়বাদী হিসাবে বর্ণনা করা যুক্তিযুক্ত ?

➲ আলোচনা করো...

যখন কোনো গ্রন্থ পাওয়া যায় না অথবা কোনো কারণে নষ্ট হয়ে যায় তখন এই পরিস্থিতিতে চিন্তাধারা এবং বিশ্বাসের ইতিহাস পুনর্গঠন করার ক্ষেত্রে কী কী সমস্যার সম্মুখীন হতে হয় ?

চিত্র 4.5
মথুরা থেকে প্রাপ্ত একজন তীর্থঙ্করের মূর্তি যার সময়কাল আনুমানিক খ্রিস্টীয় তৃতীয় শতাব্দী।
উৎস 4

৩. পার্থিব সুখ ছাড়িয়ে (BEYOND WORLDLY PLEASURE) মহাবীরের বাণী

খ্রিস্টপূর্ব ষষ্ঠ শতাব্দীতে বর্ধমান, যিনি পরবর্তীকালে মহাবীর নামে পরিচিত তাঁর জন্মের পূর্বেই উত্তর ভারতে জৈনদের মূল দর্শনের অস্তিত্ব ছিল। জৈন ঐতিহ্য অনুসারে মহাবীরের পূর্বে 23 জন শিক্ষাগুরু বা 'তীর্থঙ্কর' ছিলেন যারা পুরুষ এবং মহিলাদের জীবন নদের অপর পাড়ে পৌঁছাতে পথ প্রদর্শন করেন।

জৈন ধর্মের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ধারণা হল যে, সমগ্র বিশ্ব প্রাণবন্ত এমনকি পাথর, শিলা এবং জলেরও জীবন রয়েছে। জীবের প্রতি অহিংসা (আঘাত না করা) বিশেষত: মানুষ, প্রাণী, উদ্ভিদ এবং কীটপতঙ্গকে আঘাত না করা জৈন দর্শনের মুখ্য বিষয়। বস্তুত অহিংস নীতির উপরই জৈন ধর্মে জোর দেওয়া হয় এবং এটা সামগ্রিকভাবে ভারতীয় চিন্তাধারায় প্রভাব বিস্তার করেছে। জৈন উপদেশ অনুসারে জন্ম এবং পুনর্জন্মের চক্র কর্মের দ্বারা নির্ধারিত। কর্মের চক্র থেকে মুক্তি পেতে কঠোর তপস্যা এবং প্রায়শ্চিত্তের দরকার। এটা অর্জন করা যেতে পারে কেবলমাত্র সংসারকে ত্যাগের মাধ্যমেই। তাই মুক্তির জন্য মঠে বাস করা অনিবার্য নিয়মে পরিণত হয়। জৈন সাধু এবং সন্ন্যাসিনীগণ পাঁচটি ব্রত পালন করতেন : হত্যা না করা, চুরি না করা এবং মিথ্যা কথা বলা থেকে বিরত থাকা; ব্রহ্মচর্য পালন করা এবং সম্পদ সংগ্রহ করা থেকে দূরে থাকা।

রাজপ্রাসাদের বাইরের দুনিয়া

ঠিক যেভাবে বুদ্ধের বাণীগুলো তাঁর শিষ্যদের দ্বারা সংকলিত হয় সেভাবেই মহাবীরের বাণীগুলোও তাঁর শিষ্যদের দ্বারা নথিভুক্ত হয়। এইগুলো প্রায়ই গল্পের আকারে লিখিত যা সাধারণ মানুষকে আকর্ষণ করত। এখানে "উত্তরাধ্যায়ন সূত্র" নামক একটি প্রাকৃত গ্রন্থ থেকে একটি উদাহরণ নেওয়া হয়েছে। এতে কমলাবতী নামক একজন রাণি তাঁর স্বামীকে সন্ন্যাস নেওয়ার জন্য প্ররোচিত করেন :

যদি সম্পূর্ণ বিশ্ব এবং এর সব কোষাগার আপনার হয় তবুও আপনি সন্তুষ্ট হবেন না, এইসব আপনাকে রক্ষা করতে পারবে না। হে রাজন, যখন আপনার মৃত্যু হবে, সমস্ত কিছু পেছনে পড়ে থাকবে তখন আর কিছুই নয়, শুধুমাত্র ধর্মই আপনাকে রক্ষা করবে। একটি পাখি যেরকম খাঁচাকে ঘৃণা করে, সেরকমই আমিও এই জগৎকে ঘৃণা করি। আমি সন্তানহীন, কামনাহীন, মোহহীন এবং ঘৃণাহীন একজন সন্ন্যাসিনী হিসাবে বেঁচে থাকতে চাই ...

যারা সুখ ভোগ করে একে ত্যাগ করেছে, তারা বাতাসের মতো ভ্রমণ করে এবং যেখানে খুশি উন্মুক্তভাবে পাখির মতো উড়ে চলে যায় ....

আপনার বিশাল রাজ্যকে ত্যাগ করুন ... ইন্দ্রিয় সুখ পরিত্যাগ করুন, আসক্তিহীন ও সম্পদহীন হন, এরপর তেজময় হয়ে ঘোর তপস্যা করুন ...

➲ রাণির দ্বারা উত্থাপিত যুক্তিগুলোর মধ্যে কোন্‌টি তোমাকে বেশি প্রভাবিত করে?

3.1 জৈন ধর্মের প্রসার

জৈন ধর্ম ভারতের অনেক জায়গায় ধীরে ধীরে ছড়িয়ে পড়ে। বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীদের মতো জৈন পন্ডিতগণ প্রাকৃত, সংস্কৃত এবং তামিল-এর মতো বিভিন্ন ভাষায় সাহিত্য সম্পদ সৃষ্টি করেন। শত শত বছর ধরে মন্দিরের সঙ্গে সন্নিবিষ্ট গ্রন্থাগারে এই গ্রন্থগুলোর পাণ্ডুলিপিগুলো সযত্নে সংরক্ষিত ছিল।

ধর্মীয় ঐতিহ্যগুলোর সঙ্গে যুক্ত সবচেয়ে প্রাচীন পাথরের মূর্তিগুলো জৈন তীর্থঙ্করদের উপাসকদের দ্বারা নির্মিত হয় এবং এগুলো উপমহাদেশের বিভিন্ন স্থান থেকে পুনরুদ্ধার করা হয়েছে।

➲ আলোচনা করো...

একবিংশ শতাব্দীতে অহিংসা কি প্রাসঙ্গিক?

চিত্র 4.6
চতুর্দশ শতাব্দীর একটি জৈন পাণ্ডুলিপি থেকে নেওয়া একটি পৃষ্ঠা।

➲ তুমি কি এই লিপির পরিচয় জানো?

4. বুদ্ধ এবং জ্ঞানের খোঁজ

বুদ্ধ ওই সময়ের সবচেয়ে প্রভাবশালী শিক্ষাগুরুদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন। শত শত বছর ধরে তাঁর বাণী উপমহাদেশ জুড়ে এবং এরপরে উপমহাদেশের বাইরে মধ্য এশিয়া হয়ে চিন, কোরিয়া এবং জাপান এবং শ্রীলঙ্কা হয়ে সমুদ্র পেরিয়ে মায়ানমার থাইল্যান্ড এবং ইন্দোনেশিয়ায় ছড়িয়ে পড়ে।

কীভাবে আমরা বুদ্ধের প্রদত্ত শিক্ষাগুলো সম্পর্কে জানি? এগুলো পূর্বে উল্লিখিত বৌদ্ধ গ্রন্থগুলোর সযত্নে সম্পাদনা, অনুবাদ এবং ব্যাখ্যার দ্বারা পুনর্গঠিত হয়েছে। ঐতিহাসিকগণ মহাপুরুষদের জীবনী থেকেও তাঁর জীবনকে বিস্তারিতভাবে পুনর্নির্মাণ করার চেষ্টা করেন। এগুলোর মধ্যে অনেক গ্রন্থ বুদ্ধের জীবনকালের ন্যূনতম এক শতাব্দী পর লেখা হয়েছে। এগুলোর দ্বারা এই মহান শিক্ষাগুরুর স্মৃতিগুলোকে সংরক্ষণের চেষ্টা করা হয়েছিল। এই ঐতিহ্যগুলো অনুসারে সিদ্ধার্থ (বুদ্ধের শৈশবের নাম) ছিলেন শাক্য বংশের রাজার পুত্র। তাঁকে জীবনের কঠোর বাস্তবতা থেকে দূরে রাজপ্রাসাদের প্রাচুর্যের মধ্যে লালন-পালন করা হয়। একদিন তিনি তাঁর সারথিকে শহরে নিয়ে যাওয়ার জন্য রাজি করান। তাঁর প্রথম

চরিত (*Hagiography*) হল কোনো একজন সন্ন্যাসী কিংবা ধর্মীয় গুরুর জীবনী। চরিতগুলো প্রায়শই সন্ন্যাসীদের কৃতিত্বকে প্রশংসা করে এবং এগুলো আক্ষরিক অর্থে সবসময় নিখুঁত নাও হতে পারে। এগুলো খুবই গুরুত্বপূর্ণ কারণ এগুলো থেকে ওই বিশেষ ঐতিহ্যের অনুগামীদের বিশ্বাস সম্পর্কে আমরা জানতে পারি।

বাইরের জগৎ যাত্রাটি ছিল মানসিকভাবে খুবই পীড়াদায়ক। সেখানে যখন সিদ্ধার্থ একজন বৃদ্ধলোক, একজন অসুস্থ লোক এবং একটি মৃতদেহ দেখেন, তখন তিনি মর্মাহত হন। সেই মুহূর্তে তিনি উপলব্ধি করেন যে, মানব শরীরের ক্ষয় এবং ধ্বংস অনিবার্য। একজন গৃহহীন ভিক্ষাজীবী সন্ন্যাসীকে দেখে সিদ্ধার্থের মনে হল যে, ওই সন্ন্যাসী বার্ধক্য, রোগ এবং মৃত্যুর সাথে লড়াই করে শেষ পর্যন্ত শান্তি খুঁজে পেয়েছে। সিদ্ধার্থ স্থির করলেন যে, তিনিও একই পথ অনুসরণ করবেন। এরপর শীঘ্রই তিনি রাজপ্রাসাদ ছেড়ে চলে যান এবং তাঁর নিজস্ব সত্যের খোঁজে বেরিয়ে পড়েন।

সিদ্ধার্থ অনেক পথের সন্ধান করেন যার মধ্যে ছিল শারীরিক কৃচ্ছ সাধন, যা তাঁকে মৃত্যুর দোরগোড়ায় পৌঁছে দিয়েছিল। এই চরম পথ ত্যাগ করে তিনি অনেকদিন ধরে ধ্যানমগ্ন হন এবং শেষ পর্যন্ত বোধিসত্ত্ব লাভ করেন। এরপর তিনি বুদ্ধ অথবা মহা জ্ঞানী হিসাবে পরিচিত হন। পরবর্তী জীবনে তিনি ধম্ম অর্থাৎ সৎ জীবনের শিক্ষা দেন।

চিত্র 4.7
অমরাবতীর (অন্ধ্রপ্রদেশ) এক ভাস্কর্য (প্রায় 200 খ্রি.পূ.) যেখানে বুদ্ধকে রাজপ্রাসাদ ছেড়ে যেতে দেখানো হয়েছে।

➲ আলোচনা করো...
যদি তুমি বুদ্ধের জীবন সম্পর্কে না জেনে থাকো তবে কি তুমি ভাস্কর্য দেখে বলতে পারবে এটা কী বর্ণনা করে?

5. বুদ্ধের উপদেশগুলো

বুদ্ধের উপদেশগুলোকে প্রধানত সুত্র পিটকে প্রাপ্ত কাহিনিগুলো থেকে নেওয়া হয়েছে। যদিও কিছু কাহিনিতে তাঁর অলৌকিক ক্ষমতার বর্ণনা করা হয়েছে, তথাপি অন্যগুলো থেকে বোঝা যায় বুদ্ধ অলৌকিক ক্ষমতা দেখানোর পরিবর্তে মানুষকে যুক্তিতর্ক এবং পরামর্শের মাধ্যমে বোঝানোর চেষ্টা করেন। উদাহরণস্বরূপ যখন একজন শোকার্ত মহিলা তাঁর মৃত সন্তানকে নিয়ে বুদ্ধের কাছে আসেন, তখন তিনি মহিলাকে তার ছেলের জীবন ফিরিয়ে দেবার পরিবর্তে মৃত্যুর অবশ্যম্ভাবিতা সম্পর্কে সহৃদয়ভাবে বোঝান। এই কাহিনিগুলো সাধারণ মানুষের কথ্য ভাষায় বর্ণিত হয় যাতে এগুলো সহজেই বোঝা যায়।

বৌদ্ধ দর্শন অনুসারে এই বিশ্ব ক্ষণস্থায়ী (অনিক্কা) এবং অনবরত পরিবর্তনশীল; এটা আত্মাহীনও (অনাত্তা) বটে, যেহেতু এখানে কোনো কিছুই স্থায়ী অথবা শাশ্বত নয়। এই ক্ষণস্থায়ী পৃথিবীতে মানব জীবন দুঃখময়। কঠোর তপস্যা এবং ভোগপরায়ণতার মধ্যে সংযমের পথ অনুসরণ করেই মানুষ দুঃখের দুনিয়া থেকে মুক্তি পেতে পারে। প্রারম্ভিক বৌদ্ধ ধর্ম বিশ্বাসে ভগবানের অস্তিত্ব ছিল কি ছিল না এই বিষয়টি অপ্রাসঙ্গিক ছিল।

উৎস 5

ব্যবহারিক জীবনে বৌদ্ধধর্ম

উদ্ধৃতাংশটি সূত্র পিটক থেকে নেওয়া এবং এখানে বুদ্ধদেব সিগালা নামক একজন বিত্তবান গৃহকর্তাকে উপদেশ দিচ্ছেন :

প্রভুর দ্বারা তাঁর চাকর এবং কর্মচারীদের পাঁচ রকমভাবে দেখাশোনা করা উচিত ... ক্ষমতা অনুসারে তাদের কাজের দায়িত্ব অর্পন করে, তাদের খাদ্য এবং মজুরি সরবরাহ করে, অসুস্থতায় তাদের তত্ত্বাবধান করে; তাদের সঙ্গে সুস্বাদু খাদ্য ভাগ করে এবং সময়ে সময়ে তাদের ছুটি মঞ্জুর করে ...

কোনো বংশের লোকদের পাঁচরকমভাবে শ্রমণদের (যাঁরা সংসার ত্যাগ করেছেন) এবং ব্রাহ্মণদের প্রয়োজনগুলো দেখাশোনা করা উচিত : কাজে, কথায় এবং মনে স্নেহ দ্বারা, তাদের জন্য দরজা খোলা রেখে এবং তাদের পার্থিব চাহিদার যোগান দিয়ে।

সিগালাকেও তার পিতামাতা, শিক্ষক এবং স্ত্রীর সঙ্গে কীভাবে ব্যবহার করতে হবে এ সম্পর্কে একই ধরনের উপদেশ দেওয়া হয়।

➲ পিতামাতা, শিক্ষক এবং পত্নীর ব্যাপারে কী উপদেশ দেওয়া যেতে পারে, সে ব্যাপারে বল।

➲ **আলোচনা করো...**

বুদ্ধের সিগালার প্রতি উপদেশের সঙ্গে অশোকের তাঁর প্রজাদের (অধ্যায়-2) প্রতি দেওয়া উপদেশের তুলনা করো। তুমি কি কোনো সাদৃশ্য এবং বৈসাদৃশ্য লক্ষ কর?

বুদ্ধ মনে করতেন যে, এই সামাজিক বিশ্ব ভগবান নয়, মানুষেরই সৃষ্টি। তাই তিনি রাজাদের এবং গৃহপতিদের (অধ্যায় 2 দেখো) মানবিক এবং নৈতিক হবার পরামর্শ দিয়েছিলেন। এটা প্রত্যাশিত ছিল যে, ব্যক্তিগত প্রচেষ্টা সামাজিক সম্পর্ককে পরিবর্তন করতে পারে।

বুদ্ধ পুনর্জন্মের চক্র থেকে মুক্তি পাওয়ার উপায় হিসাবে ব্যক্তিগত গুণ এবং ধর্মীয় ক্রিয়াকলাপের উপর জোর দেন। তিনি মনে করতেন যে, আত্মোপলব্ধি ও নির্বাণ লাভ হল মানুষের মধ্যে নিহিত অহং ও আকাঙ্ক্ষা দমন করার যথার্থ উপায়। এভাবে সংসার ত্যাগীদের দুঃখকষ্টের চক্র থেকে মুক্তি ঘটে। বৌদ্ধ ঐতিহ্য অনুসারে তাঁর অনুগামীদের প্রতি সর্বশেষ বাণীগুলো হল : তোমরা নিজেরাই জ্যোতি হও যেহেতু তোমাদের সবাইকেই নিজেদের মুক্তির রাস্তা নিজেদেরই খুঁজতে হবে।

6. বুদ্ধের অনুগামীবৃন্দ

শীঘ্রই বুদ্ধের শিষ্যগণের একটি দল আত্মপ্রকাশ করে এবং তিনি একটি সংঘ স্থাপন করেন। এই সংঘটি সন্ন্যাসীদের একটি সংস্থা ছিল যারা নিজেরাও ধম্মের শিক্ষকে পরিণত হন। এইসব ভিক্ষুগণ সাধারণ জীবনযাপন করতেন। বেঁচে থাকার জন্য শুধুমাত্র প্রয়োজনীয় জিনিসগুলোই তাঁদের পুঁজি ছিল, যেমন উপাসকদের কাছ থেকে দিনে একবার খাদ্য গ্রহণ করার জন্য একটি বাটি। যেহেতু তাঁরা ভিক্ষার উপর নির্ভর করে বেঁচে থাকতেন তাই তাঁরা ভিক্ষু নামে পরিচিত ছিলেন।

শুরুতে শুধুমাত্র পুরুষরাই সংঘে থাকার অনুমতি প্রাপ্ত ছিল কিন্তু পরে মহিলাদেরও অন্তর্ভুক্ত করা হয়। বৌদ্ধ গ্রন্থ অনুসারে এটা আনন্দ নামে বুদ্ধের প্রিয়তম শিষ্যদের মধ্যে অন্যতম একজনের মধ্যস্থতায় সম্ভব হয়েছিল যিনি মহিলাদের সংঘে প্রবেশের পক্ষে বুদ্ধকে বুঝিয়েছিলেন। বুদ্ধের পালক মাতা মহা প্রজাপতি গৌতমী ছিলেন প্রথম মহিলা যিনি ভিক্ষুণী হিসাবে নিযুক্ত হন। সংঘে যোগদানকারী অনেক মহিলা ধম্মের উপদেষ্টায় পরিণত হন এবং পরবর্তী সময় 'থেরী'তে অর্থাৎ নির্বাণ লাভকারী মহিলা হিসাবে সম্মানিত হন।

বুদ্ধের অনুগামীগণ বিভিন্ন সামাজিক গোষ্ঠী থেকে আসে। তাদের মধ্যে রাজা, সম্পদশালী ব্যক্তি, গৃহপতি এবং সাধারণ দীন-দরিদ্র : শ্রমিক, ক্রীতদাস এবং শিল্পকারগণ অন্তর্ভুক্ত ছিল। একবার সংঘে প্রবেশ করলে সবাইকেই সমান গণ্য করা হত কারণ ভিক্ষু এবং ভিক্ষুণীতে পরিণত হবার পর তাদের নিজেদের পুরোনো সামাজিক পরিচয় ত্যাগ করতে হত। সংঘের অভ্যন্তরীণ কাজকর্ম 'গণ' এবং 'সংঘ'গুলোর উপর নির্ভরশীল যেখানে আলোচনার মাধ্যমে ঐক্য গড়ে ওঠত। যদি সেটা ব্যর্থ হয়, তবে বিষয়টির উপর ভোটাভুটির মাধ্যমে সিদ্ধান্তগুলো গৃহীত হত।

উৎস 6

থেরী গাঁথা

এটি বৌদ্ধ গ্রন্থসূত্র পিটকের অংশ যা ভিক্ষুণীদের দ্বারা রচিত পদ্য সংকলন। এর মাধ্যমে নারীদের সামাজিক এবং আধ্যাত্মিক অভিজ্ঞতার ব্যাপারে জানা যায়। পুন্না নামের এক দাসী অথবা চাকরানি তার প্রভুর বাড়ির কাজের জন্য প্রতিদিন সকালবেলায় জল আনার জন্য নদীতে যেত। সেখানে সে প্রতিদিন একজন ব্রাহ্মণকে স্নান করতে দেখত। একদিন সকালে সে তার সঙ্গে কথা বলল। নিম্নলিখিত পদ্যটি পুন্নার দ্বারা রচিত, যেখানে ব্রাহ্মণের সঙ্গে তার কথোপকথন লিপিবদ্ধ রয়েছে :

আমি একজন জলবাহিকা :
এমনকি শীতকালেও
আমি সবসময় জলে নামি
শাস্তির ভয়ে
কিংবা উচ্চশ্রেণির মহিলাদের কটু বাক্যের ভয়ে।
সুতরাং, হে ব্রাহ্মণ তোমার কীসের ভয়,
যে কারণে তুমি জলে নাম
(যদিও) তোমার দেহের অঙ্গ তীব্র ঠাণ্ডায় কাঁপছে?
ব্রাহ্মণ উত্তর দিলেন :
অশুভকে প্রতিরোধ করতে আমি ভালো কাজ করছি;
যুবা অথবা বৃদ্ধ যে কেউ
যে খারাপ কিছু করেছে
জলের স্পর্শে তার পাপ মুক্তি ঘটে
পুন্না বলল :
এটা আপনাকে কে বলল
যে, জলে স্নান করার মাধ্যমে অশুভ শক্তি থেকে আপনি মুক্ত পাবেন?
এরকম হলে সমস্ত ব্যাঙ এবং কচ্ছপ
স্বর্গে যেত এবং সেই সঙ্গে জলের সাপ এবং কুমিরও।
(পরিবর্তে) ওই কাজ করা থেকে নিজেকে বিরত রাখুন
যার ভয়ে
আপনি জলে নামেন।
হে ব্রাহ্মণ এখন থামুন।
ঠাণ্ডা থেকে আপনার শরীরকে বাঁচান ...

➲ বুদ্ধের কোন্ শিক্ষাগুলো এই রচনায় পাওয়া যায়?

চিত্র 4.8
জলবাহিকা একজন মহিলা, মথুরা, আনুমানিক খ্রিস্টীয় তৃতীয় শতাব্দী

উৎস 7

ভিক্ষু ও ভিক্ষুণীদের জন্য নিয়ম

এগুলো বিনয় পিটকে পাওয়া কিছু নিয়ম :

কোনো একজন ভিক্ষু একটি নতুন কম্বল তৈরি করলে তা ন্যূনতম ছয় বৎসর রাখতে হয়। যদি ছয় বৎসরের আগে সে অপর একটি নতুন কম্বল তৈরি করে - এতে যদি অন্য ভিক্ষুর অনুমোদন না থাকে, তবে প্রথম কম্বলটি ত্যাগ করুক কিংবা না করুক, একে বাজেয়াপ্ত করা হবে এবং নিজের ভুল স্বীকার করে নিতে হবে।

যদি কোনো একজন ভিক্ষু কোনো একটি পরিবারের বাড়িতে আসেন এবং তাঁকে পিঠা অথবা রান্না করা শস্য পরিবেশন করা হয়, যদি তাঁর ইচ্ছা হয় তবে তিনি দুই বা তিন পূর্ণ বাটি খাবার গ্রহণ করতে পারেন। যদি তিনি তার চাইতে বেশি গ্রহণ করেন তবে তাঁকে এর জন্য ভুল স্বীকার করে নিতে হবে। দুই বা তিন বাটি খাবার গ্রহণ করে আনার পর তাঁকে সেই খাবার ভিক্ষুদের সঙ্গে ভাগ করে নিতে হবে। এখানে এটাই সম্যক আচরণ।

যদি কোনো ভিক্ষু সংঘের কোনো একটি বিহারে বসবাস করে থাকেন এবং নিজের তৈরি করা বিছানা নিজে অথবা অন্যের দ্বারা না গোছিয়ে প্রস্থান করেন, অথবা বিদায় না নিয়ে চলে যান তবে তাঁকে নিজের ভুল স্বীকার করে নিতে হবে।

➲ তুমি কি বলতে পারো কেন এই নিয়মগুলো তৈরি করা হয়েছিল ?

বৌদ্ধ ধর্ম বুদ্ধের জীবদ্দশায় এবং তাঁর মৃত্যুর পরে খুব দ্রুত প্রসারিত হয়। কারণ মানুষ সমকালীন ধর্মীয় রীতিনীতিগুলোর প্রতি অসন্তুষ্ট ছিল এবং তাদের চারদিকে দ্রুত ঘটে চলা সামাজিক পরিবর্তনগুলো দ্বারা তারা বিভ্রান্ত হয়ে পড়েছিল। বৌদ্ধ উপদেশগুলোতে জন্মকে কেন্দ্র করে শ্রেষ্ঠত্বের পরিবর্তে যেভাবে ভালো আচরণ এবং মূল্যবোধকে গুরুত্ব দেওয়া হয় তাতে পুরুষ এবং মহিলা এই ধর্মের প্রতি আকৃষ্ট হয়। নিজের থেকে ছোটো এবং দুর্বল লোকদের প্রতি মিত্রতা এবং করুণার ভাবকে গুরুত্ব দেওয়ার আদর্শ অনেক লোককে আকৃষ্ট করে।

➲ আলোচনা করো...

পুন্নার মতো দাসী সংঘে কেন যোগদান করতে চেয়েছিল বলে তোমার মনে হয় ?

7. স্তূপ

আমরা দেখেছি যে বুদ্ধের আদর্শ এবং রীতিনীতিগুলো ব্রাহ্মণ, জৈন এবং অন্য অনেক প্রথার সঙ্গে মত বিনিময়ের মাধ্যমে উঠে আসে। এইসব আদর্শ এবং প্রথাগুলো কিছু কিছু বইয়ে সংরক্ষিত রয়েছে। আমরা পবিত্র স্থানগুলো উঠে আসার প্রক্রিয়াকে দেখে এইরকম মেলবন্ধনকে বুঝতে পারি।

বহু প্রাচীনকাল থেকেই লোকেরা কিছু কিছু স্থানকে পবিত্র বলে মনে করে। যে স্থানগুলোতে বিশেষ গাছ বা অনন্য কিছু পাথর বা বিস্ময়কারী প্রাকৃতিক সৌন্দর্য রয়েছে, সেগুলো পবিত্র স্থলে পরিণত হয়। এরকম কিছু স্থান যেখানে ছোটো ছোটো ঢিবি বা বেদি রয়েছে, কখনও কখনও এগুলোকে 'চৈত্য' বলে বর্ণনা করা হয়।

চিতা থেকে চৈত্য শব্দটা উদ্ভূত যার অর্থ সমাধি স্তম্ভ, বিশদভাবে বললে ঢিবি আকৃতির সমাধি।

বৌদ্ধ সাহিত্যে অনেক চৈত্যের উল্লেখ রয়েছে। এতে বুদ্ধের জীবনের সঙ্গে জড়িত অনেক স্থানের বর্ণনাও রয়েছে — যেখানে তিনি জন্মগ্রহণ (লুম্বিনি) করেন, যেখানে তিনি পরম জ্ঞান (বোধগয়া) লাভ করেছিলেন, যেখানে তিনি প্রথম

উপদেশ (সারনাথ) দিয়েছিলেন এবং যেখানে তিনি নির্বাণ (কুশিনগর) লাভ করেছিলেন। ধীরে ধীরে এই জায়গাগুলো পবিত্রস্থান হিসাবে গণ্য হয়। আমরা জানি যে, বুদ্ধের সময় থেকে প্রায় 200 বছর পর অশোক তাঁর পরিদর্শনের স্মৃতি হিসাবে লুম্বিনিতে একটি স্তম্ভ স্থাপন করেন।

7.1 কেন স্তূপগুলো নির্মাণ করা হয়

এরকম অনেক স্থান রয়েছে যেগুলো পবিত্র বলে গণ্য হত। কারণ বুদ্ধের সঙ্গে জড়িত অবশেষ যেমন তাঁর দেহাবশেষ বা তাঁর ব্যবহৃত অনেক জিনিস সেখানে পুতে রাখা হয়। এ ঢিবিগুলো স্তূপ নামে পরিচিত।

স্তূপ নির্মাণ করার প্রথা প্রাক্ বৌদ্ধ সময়ের হতে পারে। কিন্তু এগুলো বৌদ্ধ ধর্মের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত হয়ে পড়ে। যেহেতু সেগুলোতে এমন ধরনের অবশেষ থাকত যেগুলোকে পবিত্র বলে গণ্য করা হত, ফলে সমগ্র স্তূপ বুদ্ধ অথবা বৌদ্ধধর্মের প্রতীকরূপে প্রতিষ্ঠা লাভ করে। অশোকাবদান নামে একটি বৌদ্ধ গ্রন্থ অনুসারে অশোক বুদ্ধের অবেশষগুলোর অংশ প্রত্যেক গুরুত্বপূর্ণ শহরে বণ্টন করেন এবং এগুলোর উপর স্তূপ নির্মাণ করার নির্দেশ দেন। খ্রিস্টপূর্ব দ্বিতীয় শতাব্দীর মধ্যে ভারহুত, সাঁচী এবং সারনাথ (মানচিত্র-1) সহ অনেক স্থানে স্তূপ নির্মাণ করা হয়।

উৎস 8

কেন স্তূপগুলো নির্মাণ করা হত

উদ্ধৃতাংশটি সূত্র পিটকের অংশ মহাপরি নির্বাণ সূত্র থেকে নেওয়া হয়েছে :

বুদ্ধের পরিনির্বাণ লাভের পূর্ব মুহূর্তে আনন্দ তাঁকে জিজ্ঞেস করেন :

"প্রভু আমরা তথাগতের (বুদ্ধের অপর নাম) অবশেষের কী করব?"

বুদ্ধ উত্তর দিলেন : "তথাগতের অবশেষকে সম্মান দিয়ে নিজেকে বাধা দিও না আনন্দ উৎসাহী হও, নিজের ভালোর দিকে অভিনিবিষ্ট হও।"

কিন্তু পুনরায় জোর দেওয়ার পর বুদ্ধ বললেন : তাদের উচিত রাস্তার চৌমাথায় তথাগতের 'থুপ' (স্তূপের পালি রূপ) স্থাপন করা। যারাই সেখানে মালা এবং সুগন্ধি রাখবে ... বা মাথা নত করবে, অথবা সেখানে মনে শান্তি আনবে, তাদের সবার জন্য সুখ এবং আনন্দ দীর্ঘদিন থাকবে।

➲ চিত্র 4.15 -এর দিকে তাকাও এবং এগুলোর মধ্যে কিছু রীতি রেওয়াজ চিহ্নিত করতে পার কি না দেখো।

7.2 কীভাবে স্তূপগুলো নির্মিত হয়

স্তূপগুলোর রেলিং এবং স্তম্ভগুলোতে পাওয়া লিপিগুলো থেকে জানা যায় এগুলো নির্মাণ এবং সাজসজ্জার জন্য প্রচুর দান-দক্ষিণার কথা জানা যায়। কিছু কিছু দান সাতবাহন-এর মতো রাজারা দিয়েছিলেন ও কিছু কিছু দান শিল্পকার এবং বণিক সঙ্ঘ দিয়েছিল। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায় সাঁচীর তোরণদ্বারের অংশ হাতির দাঁতের শিল্পীদের দান করা অর্থ দিয়ে তৈরি হয়েছিল। শত শত মহিলা এবং পুরুষ যারা তাদের নিজেদের নাম উল্লেখ করেছিল, কখনও কখনও নামের সঙ্গে তারা যেখান থেকে এসেছিল সেই জায়গার নাম, এর পাশাপাশি তাদের পেশা, তাদের আত্মীয় স্বজনদের নাম উল্লেখ করে দান দিয়েছিল। এই স্মৃতিসৌধগুলো তৈরিতে ভিক্ষু এবং ভিক্ষুণীরাও অর্থ দান করেছিলেন।

7.3 স্তূপের গঠন

স্তূপ (একটি সংস্কৃত শব্দ যার অর্থ ঢিবি) মাটির সাধারণ একটি অর্ধবৃত্তাকার ঢিবি হিসাবে এর উৎপত্তি, পরবর্তীকালে একে 'অণ্ড' বলা হয়। ধীরে ধীরে এর গঠন আরও জটিল হয়ে পড়ে, যেখানে গোল এবং চৌকোন আকারের মধ্যে সামঞ্জস্য রাখা হয়। অণ্ডের উপর হারমিকা ছিল, যার গঠন ঝুল বারান্দার মতো যা দেবতাদের ঘরের প্রতীক ছিল। হারমিকা থেকে বেরিয়ে আসা মাস্তুলটি যষ্টি নামে পরিচিত ছিল যার চূড়ায় প্রায়ই একটি ছত্রি বা ছাতা অবস্থান করত। ঢিবির চারদিকে একটি প্রাচীর ছিল, যা পবিত্র স্থানকে সাংসারিক জগৎ থেকে আলাদা করে রাখত।

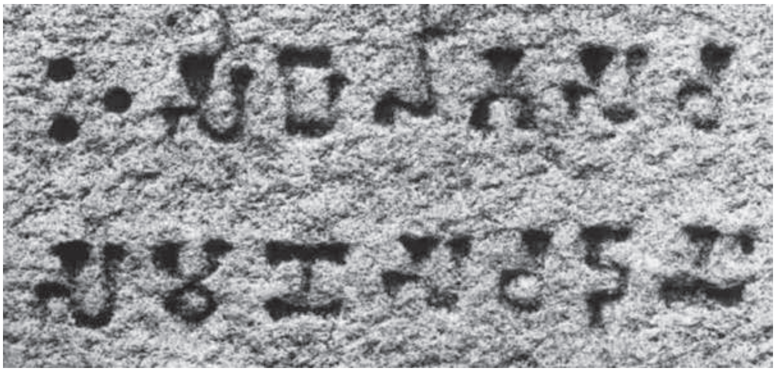

চিত্র 4.9
সাঁচীর এক শপথমূলক শিলালিপি
একই ধরনের শত শত শিলালিপি ভারহুত এবং অমরাবতীতে খুঁজে পাওয়া গিয়েছে।

গোঁড়ার দিকে সাঁচী এবং ভারহুতের স্তূপগুলো কারুকাজহীন সাধারণ ছিল। পাথরের প্রাচীরগুলো বাঁশের অথবা কাঠের বেড়ার অনুরূপ ছিল এবং প্রচুর খোদাই করা কারুকাজ সম্বলিত তোরণদ্বারগুলোকে চারদিকে স্থাপন করা হয়েছিল। উপাসকগণ পূর্বদিকের তোরণদ্বার দিয়ে প্রবেশ করে ঢিবিকে ডানদিকে রেখে ঢিবির চারদিকে ঘড়ির কাঁটার মতো প্রদক্ষিণ করত, যেন তারা আকাশে সূর্যকে অনুকরণ করছে। পরে স্তূপের ঢিবিগুলোকে কুলুঙ্গি দিয়ে বিস্তারিতভাবে খোদাই করা হয় এবং অমরাবতী এবং পেশোয়ারে (পাকিস্তান) অবস্থিত শাহজি-কি-ধেরীর মতো ভাস্কর্যগুলোও খোদাই করা হয়।

➲ আলোচনা করো...
সাঁচীর মহাস্তূপ (চিত্র 4.10 ক) এবং আলোকচিত্রের (চিত্র-4.3) নকশার মধ্যে কী কী সাদৃস্য এবং বৈসাদৃশ্য রয়েছে?

➲ এই ইমারতের কী কী বৈশিষ্ট্য নকশায় সবচেয়ে বেশি স্পষ্ট ? উচ্চস্থান থেকে খুব ভালোভাবে দেখা যায় এমন বৈশিষ্ট্যগুলো কী কী?

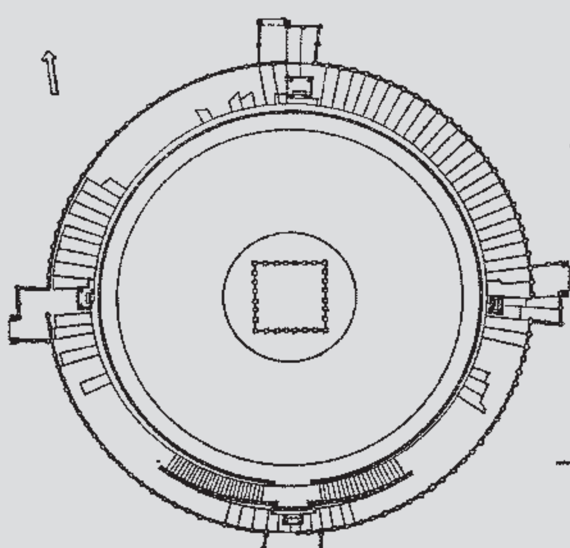

চিত্র 4.10 ক
সাঁচীতে মহাস্তুপের পরিকল্পনা
পরিকল্পনা থেকে একটি ভবনের সমতলীয় চিত্র পাওয়া যায়।

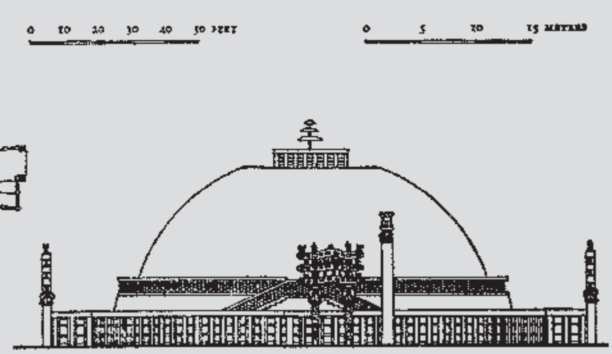

চিত্র 4.10 খ
মহাস্তুপের উচ্চতা
উচ্চতা হল উল্লম্ব দৃশ্য সম্বন্ধীয়।

৪. স্তূপের “আবিষ্কার”

অমরাবতী এবং সাঁচীর নিয়তি

আমরা দেখেছি সব স্তূপেরই নিজস্ব ইতিহাস রয়েছে — এগুলোর মধ্যে কিছু ইতিহাস থেকে আমরা জানতে পারি এই স্তূপগুলো কীভাবে তৈরি হয়েছিল। পাশাপাশি এই স্তূপগুলো কীভাবে আবিষ্কৃত হয়েছে তারও ইতিহাস রয়েছে। এখন আমরা সেগুলোর আবিষ্কার সম্পর্কে আলোচনা করব। 1796 খ্রিস্টাব্দে স্থানীয় এক রাজা মন্দির তৈরি করতে গিয়ে হঠাৎ অমরাবতী স্তূপের অবশিষ্টাংশ খুঁজে পান। তিনি স্তূপের পাথরগুলো ব্যবহার করার সিদ্ধান্ত নেন, তিনি মনে করেছিলেন, এই ছোটো পাহাড়ে সম্ভবত ধনসম্পদ লুকানো থাকতে পারে। কয়েক বছর পর কলিন ম্যাকেনজি নামে (সপ্তম অধ্যায় দেখো) একজন ইংরেজ কর্মচারী এই এলাকাটি পরিদর্শন করেন। যদিও তিনি অনেক ভাস্কর্য পান এবং সেগুলোর বিশদ চিত্র অঙ্কণ করেন, কিন্তু এই প্রতিবেদন কোনোদিনই প্রকাশিত হয়নি।

চিত্র 4.11
সাঁচীর পূর্বদিকের প্রবেশপথ
জীবন্ত ভাস্কর্যটি লক্ষ করো।

1854 খ্রিস্টাব্দে, গুণ্টুরের (অন্ধ্রপ্রদেশ) কমিশনার ওয়াল্টার ইলিয়ট অমরাবতী পরিদর্শন করেন এবং কয়েকটি ভাস্কর্যের নমুনা মাদ্রাজে নিয়ে যান। (এগুলোকে তাঁর নাম অনুসারে ইলিয়ট মার্বেল বলা হয়)। তিনি পশ্চিম দিকের তোরণদ্বারের অবশিষ্টাংশ আবিষ্কার করেন এবং এই সিদ্ধান্তে পৌঁছান যে অমরাবতী ছিল, এখনো পর্যন্ত নির্মিত বৃহত্তম এবং আকর্ষণীয় বৌদ্ধ স্তূপ। 1850 সাল হতে অমরাবতী থেকে প্রাপ্ত উৎকীর্ণ পাথর বিভিন্ন জায়গায় নিয়ে যাওয়া শুরু হয়। যেমন কিছু পাথর কলকাতার এশিয়াটিক সোসাইটি অব বেঙ্গালে নিয়ে যাওয়া হয়, কিছু পাথর মাদ্রাজের ইন্ডিয়া অফিসে আর কিছু পাথর লণ্ডনেও নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। সে সময় কোনো কোনো ইংরেজ আধিকারিকদের উদ্যান অমরাবতীর ভাস্কর্যে সজ্জিত দেখাও অস্বাভাবিক ব্যাপার ছিল না। বস্তুতপক্ষে, এই এলাকার নতুন আধিকারিকরা এভাবেই কিছু কিছু মূর্তি নিয়ে যেতেন এবং যুক্তি দেখান যে, তাদের পূর্বতন আধিকারিকরাও এমনটাই করেছিলেন।

প্রত্নতত্ত্ববিদ এইচ.এইচ. কোলের দৃষ্টিভঙ্গি অন্যদের তুলনায় একটু ভিন্ন ছিল। তিনি লিখেছেন : “এই দেশ হতে প্রাচীন শিল্পের প্রকৃত নিদর্শনগুলো লুট করতে দেওয়া আমার কাছে একটি আত্মঘাতী তথা অসমর্থনযোগ্য নীতি বলে মনে হয়।” তিনি বিশ্বাস

করতেন যে যাদুঘরগুলোতে ভাস্কর্যের প্লাস্টার করা প্রতিকৃতি রাখা উচিত, পক্ষান্তরে আসল ভাস্কর্যগুলো যেখানে পাওয়া গিয়েছিল সেখানেই থাকা উচিত। দুর্ভাগ্যবশত, কোলে অমরাবতীর ক্ষেত্রে নিজের যুক্তি কর্তৃপক্ষকে বোঝাতে সক্ষম হননি, কিন্তু সাঁচীর ক্ষেত্রে যে জায়গায় মূর্তিগুলো পাওয়া গিয়েছিল সেখানেই (*in situ*) তা সংরক্ষণ করে রাখার ব্যাপারে তাঁর অনুরোধ মেনে নেওয়া হয়।

যেখানে অমরাবতী নষ্ট হয়ে গেল সেখানে সাঁচী কীভাবে রক্ষা পেল? হয়তো অমরাবতী অনেকদিন আগে আবিষ্কৃত হয়েছিল। সে সময় পণ্ডিতরা এর গুরুত্ব বুঝতে পারেন নি যে প্রত্নতাত্ত্বিক মূর্তিকে সরিয়ে নিয়ে যাওয়ার বদলে যেখানে সেগুলো পাওয়া গিয়েছিল সেখানেই তা সংরক্ষণ করে রাখা দরকার। 1818 খ্রিস্টাব্দে সাঁচী যখন 'আবিষ্কৃত' হয়, তখনও চারটি তোরণদ্বারের মধ্যে তিনটি দণ্ডায়মান ছিল। তবে চতুর্থ তোরণদ্বারটি সেখানেই শায়িত অবস্থায় ছিল যেখানে এটি পড়েছিল এবং স্তূপটি ভালো অবস্থায় ছিল। তবুও এই তোরণদ্বারকে লণ্ডন অথবা প্যারিসে নিয়ে যাওয়ার প্রস্তাব করা হয়েছিল। অবশেষে, বেশ কয়েকটি কারণে সাঁচী স্তূপ যেমন ছিল তেমনি থেকে যায় এবং আজও এটি দাঁড়িয়ে রয়েছে। অথচ অমরাবতীর মহাচৈত্য এখন কেবলমাত্র একটি খ্যাত ক্ষুদ্র ঢিবি যার পূর্বের গৌরব নষ্ট হয়ে গেছে।

➲ আলোচনা করো...

1 নং অনুচ্ছেদটি আবার পাঠ কর। সাঁচী কীভাবে রক্ষা পেল তার কারণ বর্ণনা করো।

ইন সিটু (*In situ*) মানে সেই স্থানে।

9. ভাস্কর্য

আমরা এইমাত্র পড়লাম কীভাবে স্তূপ থেকে অপসারিত করে মূর্তিগুলোকে ইউরোপে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। এটি ঘটেছে অংশত এই কারণে যে যারা মূর্তিগুলো দেখেছিল তাদের কাছে এগুলো খুব সুন্দর এবং মূল্যবান মনে হয়েছিল, এজন্য তাঁরা এই মূর্তিগুলো নিজেদের কাছে রাখতে চেয়েছিলেন। চলো আমরা এই মূর্তিগুলোকে আরো ভালোভাবে দেখার চেষ্টা করি।

9.1 পাথরে খোদাই করা কাহিনি

তোমরা হয়তো এরকম গল্পকারদের দেখেছ যাদের কাছে চিত্রাঙ্কিত কাপড় বা কাগজ (চারণচিত্র) থাকে। তারা গল্প বলার সময় ছবিগুলো খুলে দেখায়।

4.13 নং চিত্রটি লক্ষ করো। প্রথম দর্শনে মনে হয় ভাস্কর্যটি খড়ের ঘর এবং বৃক্ষের মাধ্যমে একটি গ্রামীণ দৃশ্যকে বর্ণনা করছে। যাইহোক, শিল্প ঐতিহাসিকরা যাঁরা সাঁচীর

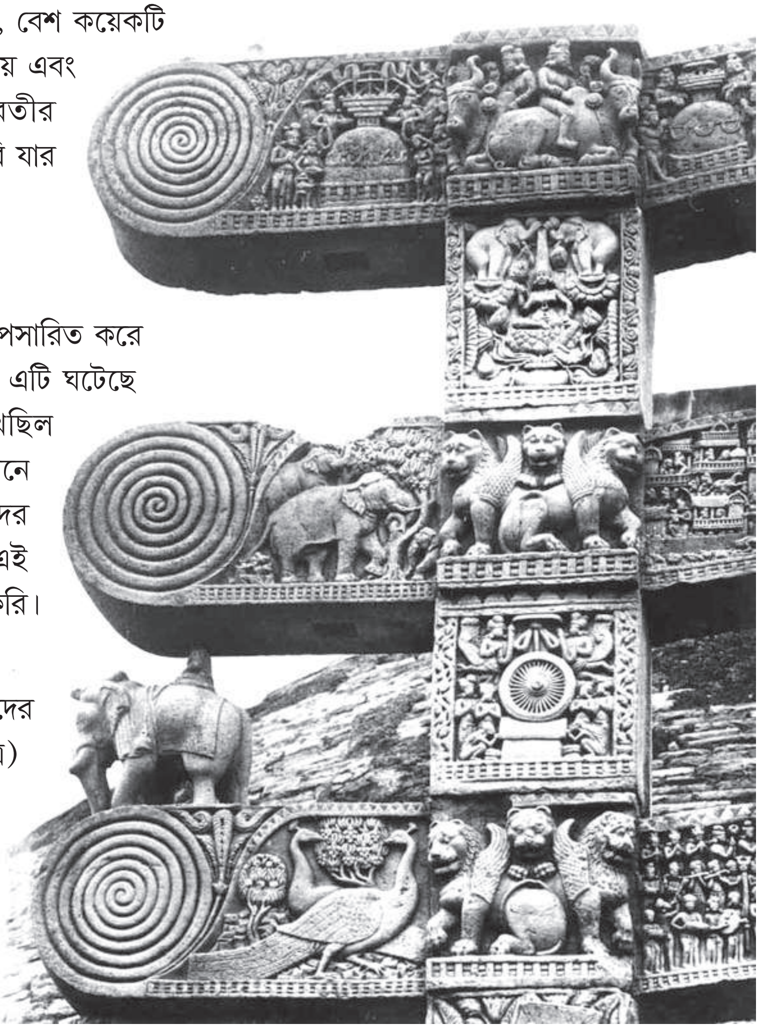

চিত্র 4.12
তোরণদ্বারের একটি অংশ
তোমার কি মনে হয় যে সাঁচির ভাস্করেরা এখানে একটি পটচিত্রের মতো বোঝাতে চেয়েছিলেন?

চিত্র 4.13
উত্তর দিকের তোরণদ্বারের একটি অংশ

ভাস্কর্যটি যত্ন সহকারে অধ্যয়ন করেছিলেন, তাঁরা এটিকে বেসান্তর জাতাকের একটি দৃশ্য হিসেবে চিহ্নিত করেন। এটি এমন একজন উদার হৃদয় রাজকুমারের গল্প যিনি তাঁর সবকিছু একজন ব্রাহ্মণকে দান করে তাঁর স্ত্রী ও সন্তানকে নিয়ে বনে বসবাস করতে চলে যান। এই উদাহরণ থেকে স্পষ্ট বোঝা যায় যে, ইতিহাসবিদ্‌রা প্রায়শই লিখিত তথ্যের উপর ভিত্তি করেই কোনো ভাস্কর্যের অর্থ বোঝার চেষ্টা করেন।

চিত্র 4.14 (নীচে একেবারে ডানদিকে)
বোধিবৃক্ষের উপাসনা
চিত্রে গাছ, আসন এবং গাছের চারপাশের মানুষজনদের লক্ষ করো।
চিত্র 4.15 (মাঝখানে)
স্তূপের উপাসনা
চিত্র 4.16 (বাঁদিকে)
ধর্মচক্র প্রবর্তন

9.2 উপাসনার প্রতীক

বৌদ্ধ ভাস্কর্য বোঝার জন্য শিল্প ইতিহাসবিদ্‌দের বৌদ্ধ চরিত সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করতে হয়েছিল। বৌদ্ধচরিত অনুসারে একটি বৃক্ষের নীচে ধ্যান মগ্ন অবস্থায় বুদ্ধ বুদ্ধত্ব (আলোক প্রাপ্ত হন) লাভ করেছিলেন। প্রথমদিকের ভাস্কর্যশিল্পীদের অনেকেই বুদ্ধকে মানুষরূপে দেখায়নি, তারা প্রতীকের মাধ্যমে তাঁর উপস্থিতি বোঝানোর চেষ্টা করেছিল। শূন্য আসনটি (4.14 নং চিত্র) বুদ্ধের ধ্যানমগ্ন অবস্থার ইঙ্গিত দেয় এবং স্তূপ (4.15 নং চিত্র) মহাপরিনির্বাণের বর্ণনা করে। চক্রকেও প্রায়শই প্রতীক হিসেবে

চিত্র 4.17
তোরণদ্বারে এক নারীর মূর্তি

ব্যবহার করা হত। (4.16 নং চিত্র)। এটি ছিল সারনাথে গৌতম বুদ্ধের দেওয়া প্রথম উপদেশের প্রতীক। এটা সত্য যে, সুস্পষ্টভাবে মূর্তিগুলোর আক্ষরিক অর্থ বোঝা যায় না। উদাহরণস্বরূপ একটি বৃক্ষ শুধু বৃক্ষ হিসাবে নয় বরং এটি বুদ্ধের জীবনের একটি ঘটনার প্রতীক হিসাবে কাজ করেছে। এইসব প্রতীকগুলোর অর্থ হৃদয়ঙ্গম করার জন্য ঐতিহাসিকদের এইসব ভাস্কর্যের স্রষ্টাদের ঐতিহ্য সম্পর্কে পরিচিত হতে হয়েছিল।

9.3 জনপ্রিয় ঐতিহ্য

সাঁচীর অন্যান্য ভাস্কর্য সম্ভবত বৌদ্ধ ধারণার দ্বারা সরাসরি অনুপ্রাণিত ছিল না। এর মধ্যে তোরণদ্বারের প্রান্তে একটি গাছ ধরে ঝুলতে থাকা সুন্দর নারীর মূর্তিও আছে। (চিত্র 4.17) প্রথমদিকে, পণ্ডিতরা এর সম্পর্কে কিছুটা কৌতূহলী ছিলেন যদিও ত্যাগ ধর্মের ধারণাগুলোর সাথে এটি খাপ খায় না। তবে, অন্যান্য সাহিত্যিক ঐতিহ্য পরীক্ষা করার পর, তারা বুঝতে পেরেছিলেন যে এটি সংস্কৃত ভাষায় বর্ণিত একটি শালভঞ্জিকা মূর্তি। প্রচলিত বিশ্বাস অনুযায়ী এই নারীর স্পর্শে গাছে ফুল ফুটত এবং ফল ধরত। সম্ভবত এটিকে একটি শুভ প্রতীক হিসেবে গণ্য করা হত এবং এটি স্তূপের অলঙ্করণে ব্যবহৃত হয়। শালভঞ্জিকা মূর্তি থেকে জানা যায় যারা বৌদ্ধ ধর্ম গ্রহণ করেছিল, তারা প্রাক্-বৌদ্ধ এবং অ-বৌদ্ধ বিশ্বাস, অনুশীলন ও ধারণা দিয়ে বৌদ্ধ ধর্মকে সমৃদ্ধ করেছিল। সাঁচীতে প্রাপ্ত মূর্তিগুলোর মধ্যে কিছু কিছু স্পষ্টতই এই ঐতিহ্যের ফসল।

চিত্র 4.18
সাঁচীতে একটি হাতির মূর্তি

এর পাশাপাশি অন্যান্য মূর্তিও রয়েছে উদাহরণস্বরূপ প্রাণীদের কিছু উৎকৃষ্ট চিত্রাবলি এখানে পাওয়া গেছে। এইসব প্রাণীদের মধ্যে হাতি, ঘোড়া, বানর এবং গবাদি পশুও অন্তর্ভুক্ত ছিল। ‘জাতকে অনেক জীবজন্তুর কাহিনি আছে যা সাঁচীতে চিত্রিত হয়েছে। সম্ভবত দর্শকদের আকর্ষিত করার জন্য জীব জন্তুকে প্রাণবন্ত করে উৎকীর্ণ করা হয়। এছাড়াও প্রাণীগুলোকে মানব গুণের প্রতীক হিসাবে ব্যবহার করা হত। উদাহরণস্বরূপ, হাতি ছিল শক্তি এবং জ্ঞানের প্রতীক।

চিত্র 4.19
গজলক্ষ্মী

অতীতের একটি চিত্র

পাথরের ভাস্কর্য দীর্ঘদিন সুরক্ষিত থাকে, ফলে ইতিহাসবিদ্‌রা খুব সহজেই এর থেকে তথ্য সংগ্রহ করতে পারে, অন্যান্য দৃশ্যমান বিষয় যেমন অঙ্কিত চিত্র যা অতীতে ব্যবহৃত হয়েছে তা থেকেও তথ্য সংগ্রহ করা যেত। এর মধ্যে সবচেয়ে ভালো অবস্থায় রয়েছে গুহা চিত্র। এর মধ্যে অজন্তার (মহারাষ্ট্র) গুহাচিত্র সবচেয়ে বিখ্যাত।

অজন্তার গুহাচিত্রে জাতকের কাহিনি বর্ণিত রয়েছে। এতে রাজদরবার, শোভাযাত্রা, কর্মরত নারী পুরুষ এবং উৎসবের দৃশ্য চিত্রিত হয়েছে। শিল্পীরা ত্রিমাত্রিক ছবি আঁকার জন্য ছায়াবৃত করার কৌশল প্রয়োগ করেছেন। কিছু কিছু চিত্র খুবই স্বাভাবিক এবং প্রাণবন্ত বলে মনে হয়।

চিত্র 4.20
অজন্তার একটি চিত্র
আসনে উপবিষ্ট ব্যক্তি এবং তার সেবকদের লক্ষ করো।

চিত্র 4.21
সাঁচীর একটি সর্প মূর্তি

আরেকটি মূর্তি রয়েছে এক নারীর (চিত্র 4.19) যার চারপাশে পদ্মফুল ও হাতি রয়েছে এবং হাতি তার উপর এমনভাবে জল ছিটিয়ে দিচ্ছে যাতে মনে হয় তাঁর অভিষেক হচ্ছে। কোনো কোনো ঐতিহাসিক এই মূর্তিটিকে গৌতম বুদ্ধের মা মায়া হিসাবে চিহ্নিত করেছেন। আবার কোনো কোনো ঐতিহাসিক এটিকে সৌভাগ্যের দেবী 'গজলক্ষ্মী' হিসেবে

চিহ্নিত করেছেন যিনি হাতির সাথে সম্পর্কিত। এটিও সম্ভবপর যে এই মূর্তিগুলোকে যেসব ভক্তরা দেখেছিল তারা এগুলোকে মায়া ও গজলক্ষ্মী হিসাবে চিহ্নিত করেছিল।

বিভিন্ন স্তম্ভে দেখানো সাপের ছবিও দেখো, (চিত্র 4.21)। এইসব প্রতীক এমন জনপ্রিয় ঐতিহ্য থেকে উদ্ভূত হয় বলে মনে করা হয় যা সবসময় গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করা হয়নি। মজার ব্যাপার হল, প্রাচীনতম আধুনিক শিল্প ইতিহাসবিদ্‌দের মধ্যে জেমস ফার্গুসন নামক একজন ইতিহাসবিদ্‌ সাঁচীকে বৃক্ষ এবং সর্প পূজার কেন্দ্র হিসেবে অভিহিত করেছেন। তিনি বৌদ্ধ সাহিত্যের সাথে পরিচিত ছিলেন না — তখনও অধিকাংশ বৌদ্ধ গ্রন্থই অনুদিত হয়নি। তিনি শুধু খোদাই করা মূর্তিগুলোকে পরীক্ষা করেই এইসব নিজস্ব সিদ্ধান্তে পৌঁছেছিলেন।

➲ আলোচনা করো...

ভাস্কর্যে তৈরির জন্য হাড়, পোড়ামাটি এবং ধাতু ব্যবহার করা যেতে পারে। এই সম্পর্কে আরো তথ্য সংগ্রহ করো।

10. নতুন ধর্মীয় ঐতিহ্য

10.1 মহাযান বৌদ্ধধর্মের বিকাশ

প্রথম শতাব্দীর পর বৌদ্ধ মত এবং ধর্ম অনুশীলনে পরিবর্তন চলে আসে, প্রারম্ভিক বৌদ্ধ শিক্ষায় নির্বাণ লাভের আত্ম প্রচেষ্টাকে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়। পাশাপাশি গৌতম বুদ্ধকেও নিজের প্রচেষ্টায় বুদ্ধত্ব ও নির্বাণ লাভকারী একজন মনুষ্য হিসেবে গণ্য করা হয়। তবে, ধীরে ধীরে একজন মুক্তিদাতার ধারণার উদ্ভব হয়। মানুষ বিশ্বাস করতে শুরু করে যে তিনি মানুষকে পরিত্রাণ লাভ করাতে পারেন। সাথে সাথে, বোধিসত্ত্বের ধারণাও বিকশিত হতে শুরু করে। বোধিসত্ত্বগণ পরম করুণাময় ব্যক্তি হিসেবে বিবেচিত হতেন। যাঁরা নিজেদের প্রচেষ্টার দ্বারা সদ্‌গুণ অর্জন করেন কিন্তু এগুলো নির্বাণ প্রাপ্তির জন্য নয়, বরং অন্যদের সহায়তা করার জন্য, বুদ্ধ এবং বোধিসত্ত্বের পূজা এই ঐতিহ্যের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ হয়ে ওঠে।

এই নতুন ধরনের ভাবনাকে মহাযান আক্ষরিকভাবে 'মহান যান' বলা হয়। যারা এই বিশ্বাসকে গ্রহণ করেছিল তারা পুরোনো ঐতিহ্যকে 'হীনযান' নামে বর্ণনা করেন।

চিত্র 4.22
মথুরায় প্রাপ্ত আনুমানিক প্রথম শতাব্দীর বৌদ্ধ মূর্তি।

হীনযান বা থেরাবাদ ?

মহাযানরা বৌদ্ধধর্মের অন্য অনুগামীদের হীনযান বলে মনে করতেন। কিন্তু পুরোনো ঐতিহ্যের অনুগামীরা নিজেদের থেরাবাদী হিসেবে বর্ণনা করতো অর্থাৎ যারা পুরোনো এবং সম্মানিত শিক্ষকদের, থেরাদের পথ অনুসরণ করেন।

10.2 পৌরাণিক হিন্দু ধর্মের বিকাশ

মুক্তিদানের ধারণা শুধু বৌদ্ধধর্মেই সীমাবদ্ধ ছিল না। আমরা দেখতে পেয়েছি যে এই ধরনের বিশ্বাস অন্য একটি রূপে আরেকটি ঐতিহ্যে ও বিকশিত হয়েছিল যাদের আজ আমরা হিন্দুধর্ম হিসেবে জানি। এতে বৈষ্ণববাদ (সেই হিন্দু পরম্পরা যেখানে বিষ্ণুকে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দেবতা হিসেবে মানা হয়) এবং শৈববাদ (একটি পরম্পরা যেখানে শিবকে পরমেশ্বর মানা হত) অন্তর্ভুক্ত ছিল, যেখানে এই দুই দেবতার উপাসনাকে প্রাধান্য দেওয়া হত। এই ধরনের উপাসনায় ভক্ত এবং ঈশ্বরের মধ্যে বন্ধনটি প্রেম ও নিষ্ঠার বা ভক্তির দৃষ্টিতে দেখা হত।

চিত্র 4.23
বিষ্ণুর বরাহ বা বন্যশূকর অবতার যিনি পৃথিবী দেবীর উদ্ধার করছেন (ষষ্ঠ শতাব্দীতে কর্ণাটকের আইহোলে পাওয়া যায়)।

➲ মূর্তির আকৃতির অনুপাত থেকে কী ধারণা পাওয়া যায়?

বৈষ্ণববাদে বিভিন্ন অবতারের উপাসনার ধারণা বিকশিত হয়। এই পরম্পরায় দশটি অবতারের কল্পনা করা হয়েছে। এটি বিশ্বাস করা হত যে পাপীদের আধিপত্য বেড়ে যাওয়ার ফলে যখন পৃথিবী ধ্বংস হওয়ার উপক্রম হয় তখন বিশ্বকে রক্ষা করার জন্য ভগবান বিভিন্ন অবতার রূপে জন্মগ্রহণ করেন। সম্ভবত, দেশের বিভিন্ন প্রান্তে ভিন্ন ভিন্ন অবতার জনপ্রিয় হয়েছিল। এইসব স্থানীয় দেবতাদের বিষ্ণুরূপে মেনে নেওয়া ছিল ধর্মীয় সমন্বয় সাধনের একটি গুরুত্বপূর্ণ পন্থা।

অন্যান্য দেবদেবীদের মতো এই অবতারদের মধ্যে কিছু সংখ্যককে মূর্তি রূপে দেখানো হয়। উদাহরণস্বরূপ শিবকে লিঙ্গারূপে বর্ণনা করা হত, কিন্তু কখনো কখনো তাঁকে মানুষ রূপেও দেখানো হত। এইসব দেবদেবীর প্রতিরূপগুলোতে তাদের বৈশিষ্ট্যের সাথে সম্পর্কিত জটিল ধারণাগুলো বিভিন্ন প্রতীক বা চিহ্নের মাধ্যমে বর্ণিত হয়। যেমন- মাথায় জড়ানো কাপড়, অলঙ্কার এবং আয়ুধ (অস্ত্রশস্ত্র এবং হাতে ধারণকৃত অন্য পবিত্র বস্তু) এবং বসার ভঙ্গিমা ইত্যাদি।

ভাস্কর্যের অর্থ বোঝার জন্য ঐতিহাসিকদের এইসব মূর্তির সাথে যুক্ত কাহিনিগুলো সম্পর্কে পরিচিত হতে হয় — এর মধ্যে অনেকগুলো কাহিনি প্রথম সহস্রাব্দের মাঝামাঝি সময়ে ব্রাহ্মণদের দ্বারা সংকলিত পুরাণে রয়েছে। এগুলোর মধ্যে

চিত্র 4.24
মহাবলীপুরমে (তামিলনাড়ু) প্রাপ্ত আনুমানিক ষষ্ঠ শতাব্দীর একটি দুর্গামূর্তি

এমন অনেক কাহিনি আছে যা শত শত বছর পূর্বে দেবদেবীদের নিয়ে রচিত এবং প্রচারিত হতে থাকে। সাধারণত এগুলো সহজ সরল সংস্কৃত শ্লোকে লেখা হত, এগুলো খুব জোরে জোরে উচ্চারণ করে পড়া হত যাতে সবাই শুনতে পায়। নারী এবং শূদ্রজাতি যাদের বৈদিক সাহিত্য পড়া বা শোনার অধিকার ছিল না, তারাও পুরাণের গল্প শুনতে পারত।

পুরাণে বর্ণিত অধিকাংশ বিষয়ই মানুষের মধ্যে পারস্পরিক যোগাযোগের মাধ্যমে বিকশিত হয়েছিল — পুরোহিত, ব্যবসায়ী, সাধারণ স্ত্রী-পুরুষ একস্থান থেকে অন্যস্থানে যাতায়াতের মাধ্যমে নিজেদের বিশ্বাস ও ধারণার আদান প্রদান করতেন। উদাহরণস্বরূপ, আমরা জানি যে মথুরা অঞ্চলের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দেবতা ছিলেন বাসুদেব-কৃষ্ণ। কয়েক শতাব্দী জুড়ে তাঁর উপাসনা দেশের অন্যান্য প্রান্তে বিস্তার লাভ করে।

➲ শিল্পীরা তাদের চিত্র দ্বারা কী বর্ণনা করতে চেয়েছেন? এই ভাস্কর্যে বর্ণিত কাহিনি সম্পর্কে আরো তথ্য সংগ্রহ কর।

10.3 মন্দির নির্মাণ

যে সময়কালে সাঁচীর মতো স্তূপগুলো বিকশিত হয়ে বর্তমান রূপ পায় সেই সময় দেবদেবীদের মূর্তির জন্য মন্দির নির্মাণ করা হয়েছিল। প্রথমদিকের মন্দিরগুলো একটি বর্গক্ষেত্রের কক্ষ ছিল যা গর্ভগৃহ নামে পরিচিত। এতে একটি দরজা ছিল যার মাধ্যমে ভক্তরা মূর্তি পূজা করার জন্য ভিতরে প্রবেশ করতে পারত। ধীরে ধীরে গর্ভগৃহের উপর একটি লম্বা কাঠামো তৈরি করা শুরু হয়, যাকে শিখর বলা হয়। মন্দিরের দেওয়ালে প্রায়ই ভাস্কর্য চিত্র অঙ্কিত থাকত। পরবর্তী যুগে মন্দির স্থাপত্যে ব্যাপক

চিত্র 4.25
দেওঘরে (উত্তরপ্রদেশ) আনুমানিক পঞ্চম শতাব্দীর একটি মন্দির

➲ 'শিখর'-এর অবশিষ্টাংশ এবং 'গর্ভগৃহ'-এর প্রবেশদ্বারটি চিহ্নিত করো।

বিকাশ ঘটে - যেমন সমাবেশ হল, বিশাল প্রাচীর ও প্রবেশপথ এবং জল সরবরাহেরও ব্যবস্থা করা হয়। (সপ্তম অধ্যায় দেখো)।

প্রাচীন মন্দিরগুলোর একটি অন্যতম বৈশিষ্ট্য ছিল যে এদের মধ্যে কিছু মন্দির পাহাড় কেটে কৃত্রিম গুহার আকারে নির্মাণ করা হত। কৃত্রিম গুহা নির্মাণ অনেক পুরোনো পন্থা ছিল (চিত্র 4.27)। এগুলোর মধ্যে সবচেয়ে প্রাচীনতম কৃত্রিম গুহাগুলো খ্রিস্টপূর্ব তৃতীয় শতাব্দীতে সম্রাট অশোকের নির্দেশে আজীবিক সম্প্রদায়ের সন্ন্যাসীদের জন্য তৈরি করা হয়েছিল।

চিত্র 4.26
শেষনাগের উপর বিশ্রামরত বিষ্ণুমূর্তি, দেওঘর (উত্তর প্রদেশ), আনুমানিক পঞ্চম শতাব্দী।

এই ঐতিহ্যটি বিভিন্ন পর্যায়ে বিকশিত হয়েছিল --- এর সবচেয়ে বিকশিত রূপ আমরা অষ্টম শতাব্দীতে কৈলাশনাথ (শিব এর অপর নাম) এর মন্দিরে দেখতে পাই যেখানে পুরো পাহাড় কেটে মন্দিরের রূপ দেওয়া হয়েছিল। ইলোরার মন্দিরটির কাজ সম্পন্ন করার পর এর মুখ্য ভাস্কর একটি তাম্রপত্রে মন্দির নির্মাণের ব্যাপারে তাঁর বিস্ময়ের কথা প্রকাশ করেছেন "ওহ্ আমি কীভাবে এটি নির্মাণ করলাম!"

চিত্র 4.27
আনুমানিক খ্রিস্টপূর্ব তৃতীয় শতাব্দীতে বিহারের বারাবর-এ নির্মিত গুহা।

চিত্র 4.28
কৈলাশনাথ মন্দির, ইলোরা (মহারাষ্ট্র) এই সমগ্র মন্দিরটি একটি পাথর কেটে তৈরি করা হয়েছে।

11. আমরা কি সবকিছু দেখে উপলব্ধি করতে পারি?

এখন পর্যন্ত অতীতের দৃশ্যমান ঐতিহ্য সম্পর্কে তোমরা একটি ধারণা লাভ করতে পেরেছ — এই সব ঐতিহ্য ইট এবং পাথর দিয়ে নির্মিত স্থাপত্য, ভাস্কর্য এবং চিত্রকলা বিধৃত। আমরা দেখেছি শত শত বছর ধরে সময়ের সাথে সাথে অনেক কিছুই নষ্ট হয়ে গেছে। তবুও যা অবশিষ্ট রয়ে গেছে এবং সংরক্ষিত আছে সেগুলো শিল্পী, মূর্তিশিল্পী, রাজমিস্ত্রি এবং স্থপতিগণ যাঁরা এই কাজগুলো করেছিলেন তাঁদের দৃষ্টিভঙ্গির সঙ্গে আমাদের পরিচয় ঘটায়। কিন্তু, তারা তাদের শিল্পকর্মের মধ্য দিয়ে কী প্রকাশ করতে চেয়েছিল আমরা কি তা সবসময় সহজেই বুঝতে পারি? আমরা কি কখনো এটা পুরোপুরি বুঝতে পারব যে 2000 বছর আগে যারা এই মূর্তিগুলো দেখত এবং পূজা করত তাদের কাছে এগুলোর কী মহত্ত্ব ছিল?

11.1 অজানাকে জানার চেষ্টা

এই বিষয়টি স্মরণে রাখতে হবে যে, ঊনবিংশ শতাব্দীতে ইউরোপীয় পন্ডিতরা যখন প্রথমে দেবদেবীদের মূর্তি দেখেছিলেন তখন তাঁরা এর মহত্ব বুঝতে অক্ষম ছিলেন। একাধিক বাহু ও মাথাযুক্ত মানুষ এবং পশুর মিশ্রিত

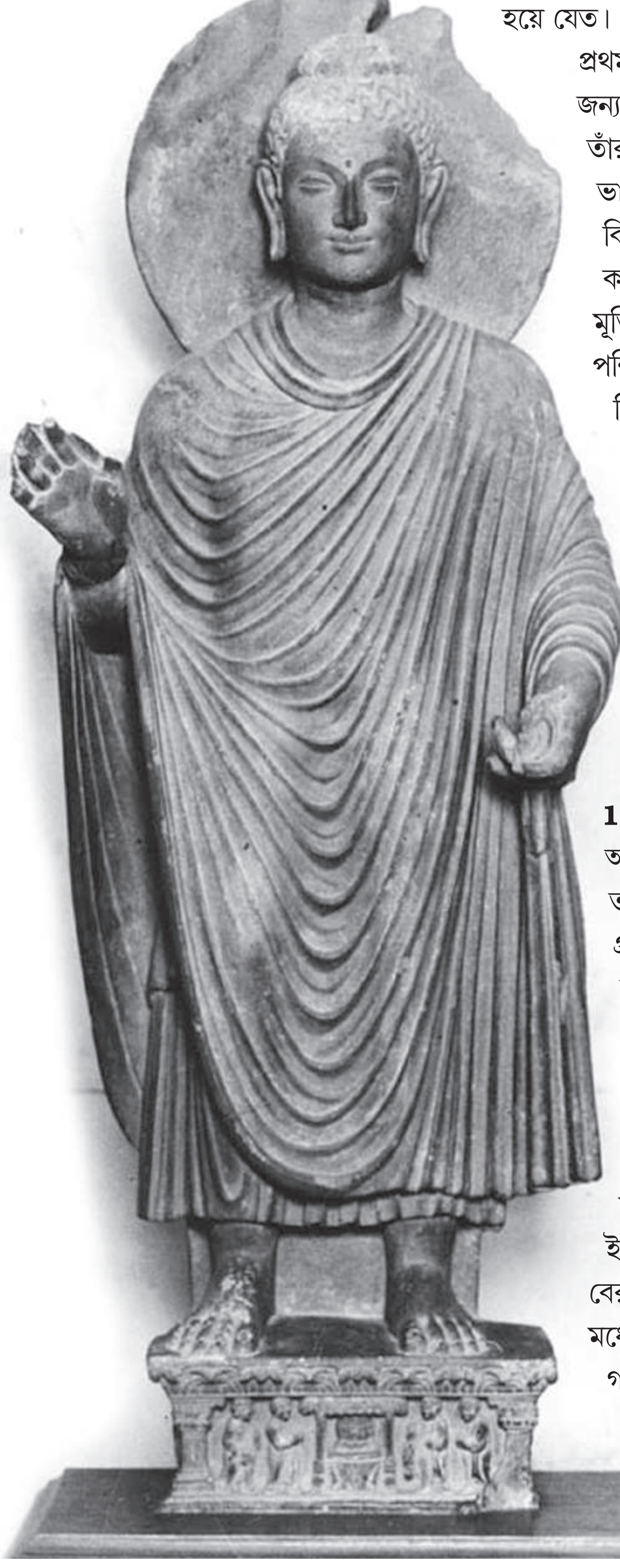

মূর্তিগুলোকে দেখে তাদের উদ্ভট মনে হত এবং কখনও কখনও তারা আতঙ্কিত হয়ে যেত।

প্রথমদিকের পণ্ডিতরা এই ধরনের অদ্ভুত মূর্তিগুলোর মাহাত্ম্য বোঝার জন্য এগুলো প্রাচীন গ্রীক ভাস্কর্যের সাথে তুলনা করেন যার সাথে তাঁরা পূর্বেই পরিচিত ছিলেন। যদিও তারা প্রথমদিকের ভারতীয় ভাস্কর্যকে গ্রিক শিল্পকলা থেকে নিম্নস্তরের বলে মনে করতেন, কিন্তু বুদ্ধ এবং বোধিসত্ত্বের মূর্তি দেখে তাঁরা খুব উৎসাহিত হন কারণ এই মূর্তিগুলোতে গ্রিক শিল্পকলার স্পষ্ট ছাপ ছিল। এই মূর্তিগুলোর বেশিরভাগই তক্ষশীলা এবং পেশোয়ারের মতো উত্তর পশ্চিম দিকের নগরগুলোতে পাওয়া গিয়েছিল যেখানে খ্রিস্টপূর্ব দ্বিতীয় শতাব্দীতে ইন্দো-গ্রিক শাসকরা রাজ্য স্থাপন করেছিলেন, এইসব মূর্ত্তিগুলোর সাথে গ্রিক মূর্তির খুব মিল ছিল। যেহেতু সেইসব পণ্ডিতরা গ্রিক ঐতিহ্যের সাথে পরিচিত ছিলেন এবং মূর্ত্তিগুলো গ্রিক আদলে তৈরি, তাই তারা বুদ্ধমূর্তিগুলোকে ভারতীয় শিল্পের সেরা উদাহরণ বলে মনে করেন। ফলস্বরূপ, এই পণ্ডিতগণ এই শিল্পকলাকে বোঝার জন্য একটি কৌশল অবলম্বন করেছিলেন যা আমরা প্রায়শই প্রয়োগ করি — তা হল পরিচিত বিষয়কে মানদণ্ড হিসেবে ধরে অপরিচিত বিষয় সম্পর্কে ধারণা লাভ করা।

11.2 যদি লিখিত তথ্যের সাথে দৃশ্যের মিল না থাকে ...

আরেকটি সমস্যা নিয়ে চিন্তা করো। আমরা জানি কোনো ভাস্কর্যের তাৎপর্য অনুধাবন করার জন্য শিল্প ঐতিহাসিকরা প্রায়শই লিখিত গ্রন্থ থেকে তথ্য সংগ্রহের চেস্টা করেন। যদিও গ্রিক মূর্তির সাথে ভারতীয় মূর্তির তুলনা করার চেয়ে এটি অনেক বেশি কার্যকরী কৌশল, তবে বিষয়টি এত সহজ নয়। এর সবচেয়ে কৌতুহলজনক উদাহরণ হল মহাবলীপুরমে (তামিলনাড়ু) একটি বিশাল শিলার উপর উৎকীর্ণ একটি ভাস্কর্য।

4.30 নং চিত্রে স্পষ্টভাবে একটি কাহিনি প্রাণবন্ত চিত্র ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। কিন্তু এটি কোন্ কাহিনি? শিল্প ইতিহাসবিদরা এটি বোঝার জন্য পৌরোণিক কাহিনিগুলো খুঁজে বের করার চেস্টা করেছেন এবং এই বিষয়টি নিয়ে ঐতিহাসিকদের মধ্যে তীব্র মতভেদ আছে। কেউ কেউ মনে করেন এটি স্বর্গ থেকে গঙ্গা নদীর অবতরণের চিত্র — শিলার কেন্দ্রস্থলে স্বাভাবিক

চিত্র 4.29
গান্ধারের একটি বোধিসত্ত্বের মূর্তি
মূর্তির পোষাক এবং কেশসজ্জার প্রতি লক্ষ কর।

ফাটলটি দ্বারা হয়তো নদীকে বোঝানো হয়েছে। এই কাহিনি পুরাণ ও মহাকাব্যে বর্ণিত রয়েছে। আবার কোনো কোনো ঐতিহাসিকের মতে এটি মহাভারতে বর্ণিত একটি কাহিনি যাতে দিব্যাস্ত্র লাভের জন্য অর্জুন নদীর তীরে বসে কৃচ্ছসাধন করছেন। এইসব মূর্তির কেন্দ্রে একজন তপস্বীকে দেখানো হয়েছে।

সবশেষে, মনে রাখতে হবে অনেক আচার অনুষ্ঠান, ধর্মীয় বিশ্বাস এবং ধর্মীয় রীতিনীতিসমূহকে — স্মৃতিসৌধ, ভাস্কর্য বা চিত্রের মাধ্যমে স্থায়ী দৃশ্যমান সাক্ষ্য হিসাবে সংরক্ষিত করে রাখা হয়নি। এগুলো দৈনন্দিন আচরণ এবং বিশেষ উপলক্ষ্যে আচরিত অভ্যাসসমূহ অন্তর্ভূক্ত করে। অনেক মানুষ এবং সম্প্রদায় তাদের চিরস্থায়ী বিবরণ রাখার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে নি, যদিও হয়তো বা তাদের ধর্মীয় ক্রিয়াকলাপ এবং দার্শনিক চিন্তাসূত্র ছিল। প্রকৃতপক্ষে, এই অধ্যায়ে আমরা যে আকর্ষক উদাহরণগুলোর উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করেছি, তা হচ্ছে এক হিমশৈলের দৃশ্যমান চূড়ামাত্র।

➲ আলোচনা করো...

তোমার দেখা কোনো ধর্মীয় অনুষ্ঠানের বিবরণ দাও। এটি কি কোনোরূপে স্থায়ীভাবে নথিবদ্ধ করা আছে?

চিত্র 4.30
মহাবলীপুরমের একটি ভাস্কর্য

সময়পঞ্জি 1
মুখ্য ধর্মীয় বিকাশ

আনুমানিক 1500-1000 খ্রিস্টপূর্ব	প্রারম্ভিক বৈদিক ঐতিহ্য
আনুমানিক 1000-500 খ্রিস্টপূর্ব	পরবর্তী বৈদিক ঐতিহ্য
আনুমানিক খ্রিস্টপূর্ব ষষ্ঠ শতক	প্রাচীন উপনিষদ, জৈনধর্ম, বৌদ্ধধর্ম
আনুমানিক খ্রিস্টপূর্ব তৃতীয় শতক	প্রথম স্তূপসমূহ
আনুমানিক খ্রিস্টপূর্ব দ্বিতীয় শতক থেকে	মহাযান বৌদ্ধমতের বিকাশ, বৈষ্ণববাদ, শৈববাদ এবং দেবীপূজার ঐতিহ্য
আনুমানিক তৃতীয় শতক	প্রাচীনতম মন্দির

সময়পঞ্জি 2
প্রাচীন স্মৃতিসৌধ এবং ভাস্কর্যের আবিষ্কার এবং এগুলো সংরক্ষণে গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ

ঊনবিংশ শতাব্দী	
1814	কলকাতায় ভারতীয় যাদুঘর স্থাপন
1834	রামরাজা রচিত 'এসে অন দ্যা আর্কিটেকচার অফ দ্য হিন্দুস্' নামক বইয়ের প্রকাশ, কানিংহাম কর্তৃক সারনাথে স্তূপের অনুসন্ধান
1835-1842	জেমস ফার্গুসন গুরুত্বপূর্ণ প্রত্নতাত্ত্বিক স্থানের জরিপ করেন
1851	মাদ্রাজে সরকারি যাদুঘর স্থাপন
1854	আলেকজাণ্ডার কানিংহাম 'ভিল্‌সা টোপস্' নামক বই প্রকাশ করেন, যা সাঁচী সম্পর্কে লেখা প্রথমদিকের বইগুলোর মধ্যে একটি
1878	রাজেন্দ্রলাল মিত্র কর্তৃক 'বুদ্ধগয়া : দ্য হেরিটেজ অব শাক্যমুনি' নামক বইয়ের প্রকাশ।
1880	এইচ. এইচ. কোল প্রাচীন স্মৃতিসৌধের তত্ত্বাবধায়ক (কিউরেটর) নিযুক্ত হন।
1888	ট্রেজার-ট্রোভ আইন পাশ হয়। এই আইন অনুসারে সরকার প্রত্নতাত্ত্বিক যে-কোনো জিনিস দখলে নিতে পারত।
বিংশ শতাব্দী	
1914	জন মার্শাল এবং আলফ্রেড ফুচারের 'দ্য মনুমেন্টস অব সাঁচী' নামক বইয়ের প্রকাশ
1923	জন মার্শালের 'দ্য কনসারভেশন ম্যানুয়েল' নামক বইয়ের প্রকাশ
1955	প্রধানমন্ত্রী জহরলাল নেহেরু কর্তৃক দিল্লিতে ন্যাশনাল মিউজিয়াম-এর ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন
1989	সাঁচীকে বিশ্বের একটি ঐতিহ্যবাহী স্থান (World Heritage Site) হিসেবে ঘোষণা করা হয়।

উত্তর দাও (100-150 শব্দের মধ্যে)

1. উপনিষদের দার্শনিকদের ধারণা অদৃষ্টবাদী ও বস্তুবাদীদের থেকে কি ভিন্ন ছিল? তোমার উত্তরের স্বপক্ষে যুক্তি দাও।
2. জৈনধর্মের মুখ্য শিক্ষা বা উপদেশাবলী সম্পর্কে সংক্ষেপে লেখো।
3. সাঁচীর স্তূপ সংরক্ষণে ভোপালের বেগমদের ভূমিকা সম্পর্কে আলোচনা করো।
4. নিম্নলিখিত সংক্ষিপ্ত লিপি পড়ো এবং উত্তর দাও :

   মহারাজা হুবিষ্কের (একজন কুষাণ রাজা), 33 তম বছরে গ্রীষ্মকালের প্রথম মাসের অষ্টম দিনে ত্রিপিটক জানা ভিক্ষু বালা-এর শিষ্যা, ত্রিপিটক জানা বুদ্ধমিতার ভগিনীর কন্যা ভিক্ষুণি ধনবতী নিজ মাতা পিতার সঙ্গো মধুবনক-এ বোধিসত্ত্ব মূর্তি প্রতিষ্ঠা করেন।

   (a) ধনবতী কীভাবে তাঁর শিলালিপির সময়কাল স্থির করেন?
   (b) তিনি কেন বোধিসত্ত্বের মূর্তি স্থাপন করেন বলে তুমি মনে কর?
   (c) তিনি কোন্ কোন্ আত্মীয় স্বজনদের নাম উল্লেখ করেছেন?
   (d) তিনি কোন্ বৌদ্ধগ্রন্থ সম্পর্কে জানতেন?
   (e) তিনি এই গ্রন্থ সম্পর্কে কার কাছ থেকে শিক্ষা লাভ করেন?
5. তোমার মতে নারী এবং পুরুষরা কেন সংঘে যোগদান করত?

চিত্র 4.31
সাঁচীর একটি মূর্তি

নিম্নলিখিতগুলোর বিষয়গুলোর উপর সংক্ষেপে টীকা লেখো (500 শব্দের মধ্যে) :

6. সাঁচীর মূর্তিকলা সম্পর্কে জানার জন্য বৌদ্ধ সাহিত্যের জ্ঞান কতটুকু সহায়ক?
7. চিত্র 4.32 এবং 4.33 হল সাঁচীর দুটি দৃশ্য। প্রত্যেক চিত্রে স্থাপত্যকলা, উদ্ভিদ, প্রাণী এবং কাজকর্ম সম্পর্কে তুমি যা দেখতে পাও তা বর্ণনা করো। কোন্‌টি গ্রামের ও কোন্‌টি শহরের দৃশ্য শনাক্ত করো। তোমার উত্তরের স্বপক্ষে যুক্তি দাও।
8. বৈষ্ণববাদ ও শৈববাদ এর উত্থানের সাথে জড়িত স্থাপত্যকলা ও মূর্তিকলার বিকাশ সম্পর্কে আলোচনা করো।
9. স্তূপ কেন এবং কীভাবে নির্মিত হয়? আলোচনা করো।

চিত্র 4.33

চিত্র 4.32

মানচিত্রের কাজ

10. বিশ্বের রেখা মানচিত্রের উপর সেই অঞ্চলগুলো চিহ্নিত করো যেখানে বৌদ্ধধর্ম বিস্তার লাভ করে। যেসব জল ও স্থল পথের মাধ্যমে ওই অঞ্চলগুলো ভারত উপমহাদেশের সাথে যুক্ত ছিল সেগুলো চিহ্নিত করো।

প্রকল্প (যে-কোনো একটি)

11. এই অধ্যায়ে বর্ণিত ধর্মীয় প্রথাগুলোর মধ্যে কোনো একটি প্রথা তোমার পাড়া প্রতিবেশি অঞ্চলে মানা হয় কি? বর্তমানে কোন্ ধর্মীয় গ্রন্থগুলো ব্যবহৃত হয় এবং কীভাবে এগুলো সংরক্ষিত ও সঞ্চালিত হয়? উপাসনার সময় মূর্তি ব্যবহৃত হয় কি? যদি হয় তাহলে এই অধ্যায়ে বর্ণিত মূর্তিগুলোর সাথে এই স্মৃতিগুলোর কোনো সাদৃশ্য অথবা বৈসাদৃশ্য রয়েছে কি? প্রারম্ভিক স্তূপ এবং মন্দিরে সাথে তুলনা করে বর্তমান সময়ে ধর্মীয় ক্রিয়াকলাপে ব্যবহৃত ভবনগুলো বর্ণনা করো।

12. এই অধ্যায়ে বর্ণিত ধর্মীয় প্রথার সাথে জড়িত ভিন্ন ভিন্ন সময় ও অঞ্চলের কমপক্ষে পাঁচটি মূর্তি এবং চিত্রের ছবি সংগ্রহ করো। এদের শিরোনামগুলো সরিয়ে প্রতিটি ছবি দুইজন ব্যক্তিকে দেখাও এবং সেগুলো সম্পর্কে কিছু বলার জন্য অনুরোধ কর। তাদের বিবরণের তুলনা করে তোমার সিদ্ধান্তের উপর একটি প্রতিবেদন লেখো।

যদি তুমি আরও কিছু জানতে চাও তাহলে এগুলো পড়ো :

A.L. Basham. 1985.
The Wonder that was India.
Rupa, Calcutta.

N.N. Bhattacharyya. 1996.
Indian Religious Historiography.
Munshiram Manoharlal,
New Delhi.

M.K. Dhavalikar. 2003.
Monumental Legacy of Sanchi.
Oxford University Press,
New Delhi.

Paul Dundas. 1992.
The Jains.
Routledge, London.

Gavin Flood. 2004.
Introduction to Hinduism.
Cambridge University Press,
Cambridge.

Richard F. Gombrich. 1988.
Theravada Buddhism: A Social History from Ancient Benares to Modern Colombo. Routledge and Kegan Paul, London.

Benjamin Rowland. 1967.
The Art and Architecture of India: Buddhist/Hindu/Jain. Penguin Books, Harmondsworth.

আরও বেশি তথ্য জানার জন্য তুমি নিম্নলিখিত ওয়েবসাইট দেখো :

http://dsal.uchicago.edu/images/aiis/

Credits for Illustrations

Theme 1

Fig.1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.8, 1.11, 1.12, 1.13, 1.14, 1.15, 1.16, 1.20, 1.22, 1.23, 1.26, 1.28, 1.29, Fig 1.30 of exercises:
Archaeological Survey of India and National Museum, New Delhi
Fig. 1.7, 1.9, 1.10, 1.17, 1.18, 1.19, 1.21, 1.24:
Prof. Gregory L. Possehl
Fig. 1.27:
Centre for Cultural Resources and Training, New Delhi

Theme 2

Fig. 2.1: American Institute of Indian Studies, Gurgaon
Fig. 2.2, 2.6: Archaeological Survey of India
Fig. 2.3, 2.5, 2.10:
Centre for Cultural Resources and Training, New Delhi
Fig. 2.4, 2.7, 2.9, 2.12, 2.13: National Museum, New Delhi
Fig. 2.8: Wikipedia

Theme 3

Fig. 3.1, 3.10: Archaeological Survey of India
Fig. 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9: National Museum, New Delhi

Theme 4

Fig. 4.1, 4.5, 4.8, 4.9, 4.12, 4.13, 4.14, 4.15, 4.16, 4.17, 4.18, 4.19, 4.21, 4.22, 4.23, 4.24, 4.25, 4.26, 4.27, 4.29, 4.31, fig 4.32 and 33 in exercise:
American Institute of Indian Studies, Gurgaon
Fig. 4.2: Wikipedia
Fig. 4.3, 4.11, 4.28, 4.30:
Centre for Cultural Resources and Training, New Delhi
Fig. 4.4, 4.6, 4.7, 4.20: National Museum, New Delhi